শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
জীবন ও সাধনা
শ্রীবিনোদবিহারী
বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : জীবন ও সাধনা

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা।

নিউ বুক ষ্টল

৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা

প্রকাশক—শ্রীগোপাললাল পাল, বি. এ.
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রিণ্টার—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

পিতৃদেব ৺বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণে।

পিতঃ,

আমার প্রায় আট বৎসর বয়সের সময় আপনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :

যদ্দিনং হরিসংলাপকর্ণপীযূষবর্জ্জিতং
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনং।

[যেদিন ভগবানের কথালাপ মানুষ শ্রবণ করে না সেই দিনই মানুষের দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন তাহার দুর্দ্দিন নহে।]

তখন আমি বালক, আপনি বুঝাইয়া দিলেও, আপনার কথা আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই, কিন্তু আজ জীবনের সায়াহ্নে আপনার কথাগুলি আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছে। আপনার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সার্থক; আমি আপনার শ্রীচরণে ভিক্ষা করি আমার ব্যর্থজীবন যেন মৃত্যুর ভিতর দিয়া সার্থক হয়। ইতি

কলিকাতা
মহাষ্টমী, ১৩৫৬

আপনার সেবাবঞ্চিত পুত্র
বিনোদ

মুখবন্ধ
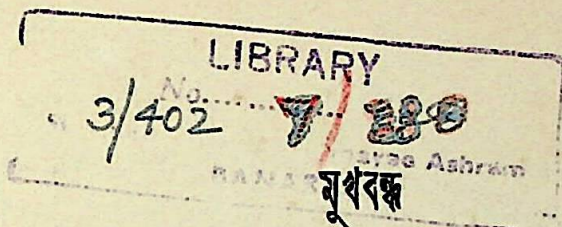
এই গ্রন্থের কয়েকটী প্রবন্ধ প্রায় ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমে "মাসিক বসুমতী" এবং তাহার পর "সংহতি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "মাসিক বসুমতী"র তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা আজ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্র যেমন গভীর তেমনই বিচিত্র। এই লোকোত্তর মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া স্বামী সারদানন্দ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরামচন্দ্র দত্ত যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন সেই অমর গ্রন্থগুলির নিকট বঙ্গদেশের সমগ্র সুধীসমাজ ঋণী। এই গ্রন্থ রচনায় প্রতি পদ-বিক্ষেপে আমাকে তাঁহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছে। অন্যান্য ভক্তের রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া আমি উপকৃত ও কৃতার্থ হইয়াছিলাম, তাঁহাদের নিকটও আমার কৃতজ্ঞ মস্তক অবনত করিতেছি।

বরাহনগর মঠের স্বামী সত্যানন্দ ও পুণ্যস্মৃতি কাশীপুর বাগানবাড়ির বর্ত্তমান অধ্যক্ষ স্বামী জিতাত্মানন্দ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কোন কোন সন্দেহ নিরসন করিয়াছিলেন, সাধুমুখনিঃসৃত বাক্য আমার মনে সাহস আনিয়াছিল। তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাইতেছি।

বঙ্গবাসী কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীহেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমার রচিত গ্রন্থের কতিপয় অধ্যায় পাঠ করিয়া আমাকে ভাষা ও ভাববিন্যাস সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, ইঁহার উন্মুক্ত পাণ্ডিত্যভাণ্ডার হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা সম্পূর্ণ উল্লেখ করা অসম্ভব। আমার সহিত ইঁহার যে প্রীতির সম্বন্ধ তাহাতে ধন্যবাদের প্রশ্ন উঠে না।

আমার সেজ জামাতা শ্রীমান স্তুকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং প্রায়ই বেলুড়ে যাইয়া সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে। স্তুকুমার আগ্রহ সহকারে আমার লেখাগুলি শুনিয়া, তাহার সাধুসঙ্গসমুজ্জল বুদ্ধির দ্বারা সমালোচনা করিয়া, আমাকে নানাবিধরূপে সাহায্য করিয়াছে। আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আরতি দেবীর উল্লেখ না করিলে ঋণ স্বীকারের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আরতি অনেক অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিল, বিশেষতঃ আমার লেখাগুলির আরতিই প্রথম পাঠিকা এবং জটিল ধর্ম্মতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রসূত স্বচ্ছ আলোচনা অনেক সময় আমার মনের অস্পষ্ট চিন্তাধারাকে স্তুস্পষ্টতা প্রদান করিয়াছে। নীরবে, আনন্দের সহিত, আরতি আমার গ্রন্থের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছে তাহা ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে।

সর্ব্বশেষে এই পুস্তক প্রকাশবিষয়ে প্রসিদ্ধ পুস্তকপ্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপাললাল পাল ও তদীয় সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল সাহা রায় মহাশয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গোপালবাবু ব্যবসায়ী লোক কিন্তু তিনি কেবলমাত্র ব্যবসায়ীরূপে আমার নিকট প্রকাশিত হন নাই; খাঁটি মানুষরূপেই তাঁহাকে বারংবার দেখিয়াছি। যোগেন্দ্রবাবু একজন শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত। এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার কার্য্যভার ভুলিয়া আমার নিকট বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরম আনন্দের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিয়া আমাকে উৎসাহিত ও চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এইরূপে বহুস্থান হইতে সংগৃহীত শ্রীরামকৃষ্ণ-ঘটনাবলী ও ভাবধারা বহুজনহৃদয়ের আলোকের ভিতর দিয়া আজ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ প্রসন্ন দৃষ্টি করিলে এই গ্রন্থরচনা সার্থক হইবে। ইতি

কলিকাতা
মহাষ্টমী, ১৩৫৬ } শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

নির্ঘণ্ট

(স্থান ও ব্যক্তিবর্গের নাম)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—জীবন ও সাধনা

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়কাল : উনবিংশ শতাব্দী

যে নিয়মে পার্থিব জগতে কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না, সেই অলঙ্ঘ্য নিয়মে ধর্ম্মজগতেও কোন মহাপুরুষের আগমন আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে। যাহা বুদ্ধিগম্য নহে তাহাই আমাদের নিকট আকস্মিক, কিন্তু বুদ্ধিগোচর না হইলেও একটা যুক্তিপূর্ণ কারণ ও যুগপ্রয়োজন ব্যতীত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন না। উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগমনও সেই একই বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক ইউরোপীয় মনীষী মনে করিতেন যে জগতের মানুষেরা আপনা আপনিই চেষ্টানিরপেক্ষভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন "the ultimate development of the ideal man is certain," অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ মনুষ্যজাতি অবশ্যই গঠিত হইবে। ক্রমশঃ প্রশ্ন উঠিল, তাহা হইলে কি মানুষের চেষ্টা, অধ্যবসায়, সাধনার প্রয়োজন নাই? যদি আপনা-আপনি কোন প্রাকৃতিক নিয়মের বলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় তাহা হইলে মানবজাতি উন্নত ও ধার্ম্মিক হইলেও তাহার যেমন প্রশংসা নাই, সেইরূপ যদি পশুশ্রেণীতে অধঃ-

পতিত হইয়া পড়ে তাহা হইলেও নিন্দা করা চলে না। কারণ উভয়ই মানুষের চেষ্টাকে বাদ দিয়া হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দী এই ভুলটী বুঝিতে পারিল। মনুষ্যত্ব-বিকাশের প্রধান উপাদান মানবজাতির সাধনা ও প্রচেষ্টা,—নতুবা উন্নতি হয় না, আর যদিও হয় তাহা মানব-জাতির গৌরবের বিষয় নহে ;—এই সত্য উনবিংশ শতাব্দী উপলব্ধি করিল। ধর্ম্মজগতে কতকগুলি বিধিনিয়ম মানিয়া চলিলেই, স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেই, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি হয় না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি মানুষের নিজের কঠোর পরিশ্রম-সাপেক্ষ ;—ইহা সত্যদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলাদেশে ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালীর গতানুগতিক ধর্ম্মজীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র জগতেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রবল পার্থক্য দাঁড়াইয়াছিল, ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বাতাসে শুনা যাইলেও কোথাও মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে নাই, ধর্ম্ম কতকগুলি বিধিনিষেধের সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল, ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণ বিলাসী ও ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুগপ্রসঙ্গে একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন : ' It was the lax, smiling, happy gentlemanly Church of England whose persons were merely slightly clericalised squires. All that was asked of them was that they should behave as decent gentlemen were expected to behave ; and there was nothing in the tradition of a gentleman to forbid dancing and flirting while they were young, hunting and hard drinking when they grew older." অর্থাৎ শিথিলনীতি, আমোদপ্রিয়, ধর্ম্মযাজকগণের জমিদার-শ্রেণীভুক্ত লোকসমূহ হইতে অতি সামান্যই

পার্থক্য ছিল। ধর্ম্মযাজকগণের নিকট হইতে সাধারণ ভদ্রলোকের ব্যবহারের অতিরিক্ত আর কিছুই আশা করা যাইত না। আর তদানীন্তন ভদ্রলোকের পক্ষে যৌবনে নাচ ও স্ত্রীলোকের সহিত হাল্‌কা প্রণয়, বার্দ্ধক্যে পশুশিকার ও অতিরিক্ত মদ খাওয়া মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। সামাজিক অবস্থাও তথৈবচ। জনৈক ইংরাজ লিখিয়াছেন, "Our aristocracy is materialised, middle class is vulgarised and lower class is brutalised." অর্থাৎ সমাজের বড়লোকশ্রেণী বিষয়ভোগপ্রয়াসী, মধ্যবিত্তশ্রেণী নীচমনা এবং দরিদ্রশ্রেণী পাশবপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই ছিল ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা। বাংলাদেশে ধর্ম্মের অবস্থা প্রকাশ্যভাবে এতটা শোচনীয় না হইলেও সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে যে ঘুণ ধরিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন বাংলাদেশ দরিদ্র এবং সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। বাংলার শিল্প তখন লুপ্ত, সাহিত্য প্রাণহীন, বণিকলক্ষ্মী বিদেশীর অঙ্কগত, জমিদারগণ ব্যসনাসক্ত, ধর্ম্ম কয়েকটা তুচ্ছ আচারের সমষ্টিমাত্র। বাঙ্গালী জাতিটাই তখন বিদেশীর অনুগ্রহপুষ্ট। কলিকাতার মত সহরে শৌণ্ডিকালয় ও বাণিজ্য-প্রাসাদের ছড়াছড়ি। জাতির দেহ ও মন তখন ইংরাজের সুদৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ। বাঙ্গালীজাতি কি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? এমনই যুগসন্ধির সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আসিলেন তাঁহার শঙ্খ লইয়া, বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতার উপকণ্ঠে বসিয়া পুনঃ পুনঃ ডাক দিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে জাতির নেশা কাটিতে লাগিল। বহির্জগতে বাঙ্গালীর মুক্তির কোন উপায় ছিল না—ইংরাজের শৃঙ্খল বড়ই কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ মনের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, জাতির মন সমস্ত জীর্ণতা ও অবসাদ হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইতে লাগিল। বাঙ্গালী জীবনের একটা বৃহৎ দিক্ বন্ধনমুক্ত হইল। ধর্ম্ম-বিষয়ে যখন বাঙ্গালী স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখিল, গোঁড়ামির বন্ধন যখন আল্‌গা

হইয়া আসিল তখন বাহিরের স্বাধীনতার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইল। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ জাতিকে মূঢ়তা ও আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন।

ইউরোপের অনুকরণে এদেশের মনীষিগণ প্রথমতঃ কর্ম্মের মধ্যেই মনের মুক্তির সন্ধান করিয়াছিলেন। 'জগতের উপকার করিব'—এই ধ্বনি বাঙ্গালী মনীষিগণের মধ্যে বারংবার শুনা যাইতেছিল। কিন্তু নির্ম্মলচরিত্র, সৎচিন্তা ও ভগবৎ-আরাধনার দ্বারা মানুষের ভিতরকার পশু সংযত হইলে তবে সেই পরিশুদ্ধ মন নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উপযোগী হয় তাহা অধিকাংশ লোকেই সে যুগে উপলব্ধি করেন নাই। অবশ্য কোন কোন ইউরোপীয় মনীষী ইহা দূরদৃষ্টি-বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সুইস্ পণ্ডিত Amiel লিখিয়াছিলেন: "It is perhaps not a bad thing that in the midst of the devouring activities of the western world, there should be a few Brahmanising souls." অর্থাৎ পশ্চিম জগতের সর্ব্বগ্রাসী কর্ম্মবাদের সম্মুখে সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ-জীবনের আদর্শ থাকারও প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ উনবিংশ শতাব্দীর এই Brahmanising soul-এর (ব্রাহ্মণ-আত্মার) চরম অভিব্যক্তি। চরিত্রগঠন না করিয়া একেবারে কর্ম্ম ধরিতে যাইলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন জাতির ভিতর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। বিংশ শতাব্দীতে বারংবার যুদ্ধের ভিতর দিয়া সাধনভজনহীন নিছক্ কর্ম্মের বিপদ এই জগতে ঘোষিত হইয়াছে। দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

এ কুৎসিৎ লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বিবেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

কামানের অপেক্ষাও দৃঢ়তর কণ্ঠে বহুপূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে ব্যবসায় অথবা রাজ্য-শাসন উপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। হিন্দুধর্ম্মের সনাতন রূপ তাঁহারা দেখিতে পান নাই। যে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসমুদ্র হইতে যুগে যুগে মহাপুরুষগণ উদিত হইয়াছেন, আজিও হইতেছেন, যে নব নব প্রাণসৃষ্টির সহিত তুলনা করিলে জগতের অন্য সমস্ত ধর্ম্মই শুষ্ক ও মলিন, সেই চিরন্তন হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইংরাজগণের পরিচয় ঘটে নাই। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বলিতে কয়েকটি পাষাণমূর্ত্তি বুঝিতেন, হিন্দুনিষ্ঠা বলিতে চড়কের শিকবিদ্ধ দোলন, সাগরে শিশুবিসর্জ্জন, সতীদাহ, পূজাপার্ব্বণে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা,—ইহাই জানিতেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম তখন ধর্ম্মজগতে সমাজচ্যুত হইয়া এককোণে পড়িয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম্মকে এই isolation (বিচ্ছিন্নতা) হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের পার্শ্বে তাহার আসন রচনা করিলেন। রাজা রামমোহন রায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্বে একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি

সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহার সেই মহতী প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। পরবর্ত্তী যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রাদেশিকতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে যে আসন প্রদান করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের দরবারে যে মর্য্যাদা দিয়া গিয়াছেন ঠিক সেই মর্য্যাদা ও উচ্চ আসন শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম্মকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থান মহাকালের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে কলিকাতার উপকণ্ঠে শ্রীরাম-কৃষ্ণের উদয় ও প্রকাশ হইয়াছিল। সেই বস্তুসর্ব্বস্ব আত্মবিস্মৃত যুগেও একদল যুবক সত্যের জ্যোতিতে দক্ষিণেশ্বরে আকৃষ্ট হইলেন। ইহাই যুগে যুগে হইয়া আসিতেছে। সত্যদ্রষ্টা আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে লীলাসহচর-গণও আসিয়া উপস্থিত হন। এই সম্বন্ধে একজন ইউরোপীয় মনীষী লিখিয়াছেন; "When men with a divine fervour proclaim a truth, which the world has forgotten, there is never any lack of enthusiasm in its acceptance." অর্থাৎ যখনই স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা লইয়া কোন লোক সত্য প্রচার করেন,—যে সত্য হয়ত জগৎ ভুলিয়া গিয়াছে,—তখন সেই সত্য গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহী লোকের অভাব হয় না। ভিক্ষুক যিশুখৃষ্টের পশ্চাতে সর্ব্বত্যাগী শিষ্যগণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, গৃহত্যাগী রাজপুত্র বুদ্ধদেবের সত্য গ্রহণ করিবার জন্য লোকের অভাব হয় নাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে দিবারাত্রি ভিড় হইয়াছিল,—তাঁহার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য শিক্ষিত যুবকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রপ্রচার হইয়া গেল, ফল কি হইল তাহা বিচার করিবার

সময় এখনও আসে নাই। সেই মহামন্ত্র শত শাখা-প্রশাখায় আজ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়াছে,—কোথায় বাংলাদেশ, কোথায় মাদ্রাজ, কোথায় আমেরিকা! উনবিংশ শতাব্দী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। এখন

Watch thou and pray.

(প্রার্থনা কর এবং প্রতীক্ষা করিয়া থাক।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিশিষ্টতা

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট দক্ষিণেশ্বরের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (ক্যাপ্টেন) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসন গ্রহন করিলে, ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্র তানপূরাসংযোগে গান আরম্ভ করিলেন। দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া মধুরকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল,—

আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইতিমধ্যে আপনাকে ভুলিয়া "প্রেমানন্দে মগন" হইয়াছেন। সমস্ত দেহ স্থির—"চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।" নরেন্দ্র গান শেষ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর চারিদিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—

তখনও সমাধি অবস্থার অন্তরের প্রসন্নতা বাহিরের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট। শ্রীবুদ্ধের ন্যায় ঠাকুরও তখন,—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ-মূরতি,
দৃষ্টি হ'তে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর'পরে
করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতিঃ।

আর একবার চারিদিকে তাকাইয়া কাহাকে যেন সন্ধান করিলেন, এক ঘর লোক, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইল না। নরেন্দ্র নাই, তানপূরাটি পড়িয়া আছে। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,—

"আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাক্‌লো আর গেল।"

নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সে দিন যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে পরমহংসদেবের সম্বন্ধেই সেই কথাগুলি আমাদের মনে উদিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারিরূপে রাণী রাসমণির ঘনবনাকীর্ণ দক্ষিণেশ্বরে দেবীর পূজারী হইয়া অখ্যাত ও অজ্ঞাত জীবন যাপন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহার সে দিনের সেই ক্ষীণ দীপরেখা সমগ্র ভারতবর্ষে কি আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে—তাহা অনুভব করিবার দিন আজ আমাদের উপস্থিত হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের এই দুর্দ্দিনে আজ তাঁহার বাণী স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে উদার ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহাকে কোন ধর্ম্ম কখনও নিন্দা করিতে দেয় নাই, যিনি ধর্ম্মমতকে কখনও ঈশ্বরের অধিক করিয়া দেখেন নাই, যিনি অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—যে কেহই হউক না কেন, আন্তরিক ভক্তি থাকিলে ভগবান্‌কে পাইবেই, সেই সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমের পুরোহিতকে ভাল করিয়া

চিনিবার ও জানিবার প্রয়োজন স্বধর্ম্মহীন, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষে আজিকার মত আর কোনও দিন হয় নাই। আমরা আগ্রহের সহিত নেপোলিয়নের জীবন-চরিত পাঠ করি—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক জগতে এই অতিমানুষের আবির্ভাব সত্য সত্যই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। অজ্ঞাত ও অখ্যাত আইন-ব্যবসায়ীর পুত্রের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শত সহস্র লোক আনন্দচিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, সমস্ত য়ুরোপ ত্রস্ত ও কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্রীড়নকের ন্যায় রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, ইহা পিনাকপাণির প্রলয়-নাচনের ন্যায় অদ্ভূত ও বিস্ময়কর। কিন্তু নিঃসম্বল, নিরক্ষর, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, স্বজনহীন ও সহায়হীন হইয়াও কিরূপে ধীরে ধীরে আত্মার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সমগ্র জগৎকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করিয়াছেন, তাহা নেপো-লিয়নের জীবন-কাহিনীর অপেক্ষাও শতগুণে আরও শিক্ষাপ্রদ ও বিস্ময়কর। ফরাসী-বিপ্লবের স্রোত নেপোলিয়নকে জোর করিয়া ভাসাইয়া লইয়া সিংহাসনের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে জগতে পরিচিত করিবার জন্য কোনও বাহিরের অবস্থাই অনুকূল ছিল না, কোনও অদ্ভুত ঘটনাও সংঘটিত হয় নাই। তাই দেখিতে পাই যে, তাঁহার দেহত্যাগের পর আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরেও সেই আত্মার জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া কোথাও দরিদ্র ছাত্রগণের সুশিক্ষার বিধান করিয়া প্রাণে ধর্ম্মের শান্তি আনিয়া দিতেছে, কোথাও বা মাতৃ-পিতৃহীন শিশু-সন্তানগুলিকে জননীর ন্যায় লালনপালন করিতেছে, কোথাও বা শুদ্ধচিত্ত যুবকগণকে আত্মোৎসর্গে নিয়োজিত করিয়া কাঙ্গালের দুঃখ দূর করিয়া দেশে নূতন প্রাণের সৃষ্টি করিতেছে। ঠাকুরের সম্বন্ধে আজ বারংবার সেই কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে—

"আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাক্‌লো আর গেল।"

ধর্ম্মজীবনে মহীয়ান্ ঋষিগণের জীবন-কাহিনী বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কর্ম্মজীবনে যাঁহারা মহান্, বাহিরে তাঁহাদের জীবনের একটা প্রকাশ আছে, যাহার দ্বারা তাঁহাদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, এব্রাহাম লিনকন্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণের জীবন কর্ম্মের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং জগতের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সকলের সম্মুখে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মজীবনে যাঁহারা গরীয়ান্, সেই মহাপুরুষগণের জীবন তাঁহাদের অন্তরের মধ্যেই প্রকাশিত এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে যে ভাগ্যবান্ ভক্তগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরের দীপ্তিতেই সেই জ্যোতির উৎসের সম্যক্ পরিস্ফুরণ, অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শান্তি ও ভাস্বরতায় তাহার অভিব্যক্তি। সুতরাং জীবন-চরিত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আজ পর্য্যন্ত কোনও ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের কেহই লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের কথাগুলি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে গেলে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই হয় না, নিজের জীবনে তাহাদের উপলব্ধি করিতে হয়। কর্ম্মজীবনের সত্য অনুভূতিগুলি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের অনুভূত সত্য কেবলমাত্র জীবন দিয়াই উপলব্ধি করিতে হয়, নতুবা তাহারা প্রাণহীন অক্ষরসমষ্টিই থাকিয়া যায়, জ্বলন্ত সত্যরূপে কখনও প্রতিভাত হয় না। এই দুঃখেই একদিন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে দেহত্যাগের ঠিক পাঁচ মাস পূর্ব্বে কঠিন রোগভোগের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,— "কারেই বা বোল্‌বো, কে-ই বা বুঝবে!" ঐহিক জীবনের সায়াহ্নে সেই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত এই সহজ কথাগুলির মধ্যে কি গভীর আত্মবেদনা ও জগতের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নিহিত ছিল, তাহা কোন ভাষাই সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। সেই দিন নরেন্দ্র, রাখাল

প্রভৃতি তাঁহার প্রাণকল্প শিষ্যগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তথাপি এই করুণ আক্ষেপ-প্রকাশ।

কিন্তু যে ভাগ্যবান্ ভক্তবৃন্দ সেই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট তিনি নিজের অনুভূতিগুলি যে ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই বিবৃতি অনুধাবন করিলে বিস্ময় ও আনন্দরসে মন আপ্লুত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ও তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তি ও উজ্জ্বলতার উৎস তাঁহার জগৎ-জননীর দর্শন ও সেই জগন্মাতার বাণী-শ্রবণ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল দেহত্যাগের প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে এক দিন কাশীপুরের বাগানে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন, নরেন্দ্র পদসেবা করিতেছেন, মণি পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন। স্থিরনেত্রে পাখাটির দিকে তাকাইয়া আছেন, যেন কিছু বলিবেন; ভক্তরা উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ঠাকুর কি বলেন। ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—

"এই পাখা যেমন দেখছি—সামনে, প্রত্যক্ষ—ঠিক অমনি আমি ঈশ্বরকে দেখেছি।"

আর এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কথা কয়েছে—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে।"

এরূপ বিস্ময়কর সত্যদর্শন এরূপ দৃঢ়ভাবে আর একবার এই ভারতের কোন্ তপোবনে মেঘমন্দ্রস্বরে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

জগতের আর কোথাও কোনও মহাপুরুষ এই অমৃতময় বাণী এত সুস্পষ্ট ও হৃদয়স্পর্শীরূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। উপনিষদ্‌কার যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

এবং ইংরাজপণ্ডিত যাঁহাকে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পাইতে যাইয়া তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) বলিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত কথা কহিবার সৌভাগ্য জগতে আজ পর্য্যন্ত অধিক-সংখ্যক মহাপুরুষের হয় নাই। সেই কথাই এক দিন শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা
ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং
দৃষ্টবানসি মাং যথা॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত শক্তি ও জ্ঞানের উৎস এই ভগবদ্দর্শনের পর হইতে আরম্ভ। এই ঈশ্বরদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং তাঁহার সমস্ত বাণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘ ও অমৃতময়ী বাণী—

"এই পাখা যেমন দেখছি—সাম্‌নে, প্রত্যক্ষ—ঠিক অম্‌নি আমি ঈশ্বরকে দেখেছি।"

তৃতীয় অধ্যায়

আবির্ভাব, দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও রাণী রাসমণি

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফাল্গুন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলার কামারপুকুর নামে একটি গণ্ডগ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কুলদেবতা রঘুবীরের পূজার জন্য ফুল তুলিতে যত উৎসাহ দেখা যাইত, পড়াশুনায় তাহার কিছুই পরিদৃষ্ট হইত না। ঠাকুর বলিতেন, বাল্যকালে শুভঙ্করী তাঁহার ধাঁধাঁ লাগিত, কিন্তু পাঠশালার পড়াশুনার ভিতর কোন্ বিষয় যে তাঁহার ধাঁধাঁ লাগিত না, তাহা বলা বড় কঠিন। ইংরাজী শিখেন নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যও জানিতেন না, অঙ্ক দেখিলে ভয় পাইতেন। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। মহাপ্রভু শাস্ত্রাম্বুধি পার হইয়া পণ্ডিতের চূড়ামণি বলিয়া জগতে পরিগণিত হইয়াছিলেন, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের দর্প তাঁহার নিজ অস্ত্র অধীতশাস্ত্রবিদ্যার দ্বারাই চূর্ণ করিয়াছিলেন, ন্যায়ের টীকা লিখিয়া মহামহিম পণ্ডিতাগ্রগণ্যকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব প্রায়ই বলিতেন, "আমি মুখ্যু", কখনও কখনও কৌতুক করিয়া শাস্ত্রাধ্যায়ী বিদ্বান্ শিষ্যমণ্ডলীকে বলিতেন, "আমি মূর্খোত্তম"। কিন্তু উপনিষদের মৈত্রেয়ী যেমন শাস্ত্রজ্ঞান পরিহার করিয়াও একটি সরল কষ্টিপাথরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অসার বস্তু ত্যাগ করিয়া অমৃতকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরমহংসদেবও তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" উপলব্ধি করিয়া, শাস্ত্রের অমীমাংসিত, বহু জল্পনা-কল্পনাধূমায়িত, বক্র ও দীর্ঘ পথ ত্যাগ করিয়া জীবনের প্রভাতেই সহজ ও সরল ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বয়স যখন

প্রায় ১৭ বৎসর, সেই সময় তিনি কলিকাতায় আসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার তাঁহার পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া একটি চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন। ঠাকুর কলিকাতায় ঝামাপুকুরে থাকিয়া দেবসেবা করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। এদিকে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মে পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামকুমার এই মন্দিরের প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এ দিকে কলিকাতার মরুভূমির মধ্যে ঠাকুর কোথাও প্রাণ দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী জননীকে তখনও খুঁজিয়া পান নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার দক্ষিণেশ্বর আসার কয়েক দিনের পর হইতেই ঠাকুরকেও সেখানে আসিয়া বাস করিতে হইল। পুরোহিত রামকুমার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ঠাকুর মথুরবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশবিন্যাস করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ রাধাগোবিন্দজীর এবং তৎপরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি মধ্যে মধ্যে আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে নারীর স্থান যত উচ্চে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের এই 'অশিক্ষিতা' মাতৃজাতি লোকচক্ষুর অন্তরালে ধর্ম্মপ্রাণতার স্তন্যরস দিয়া কত মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবন গঠন ও পরিপোষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আমাদের দেশে আজিও অজ্ঞাত। রাণী রাসমণি মন্দির-স্থাপনের পর মাত্র ৬ বৎসরকাল জীবিতা ছিলেন—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। রাণী রাসমণি তখন কয়েক দিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এক দিন তিনি শুদ্ধাচারে আসনে উপবেশন
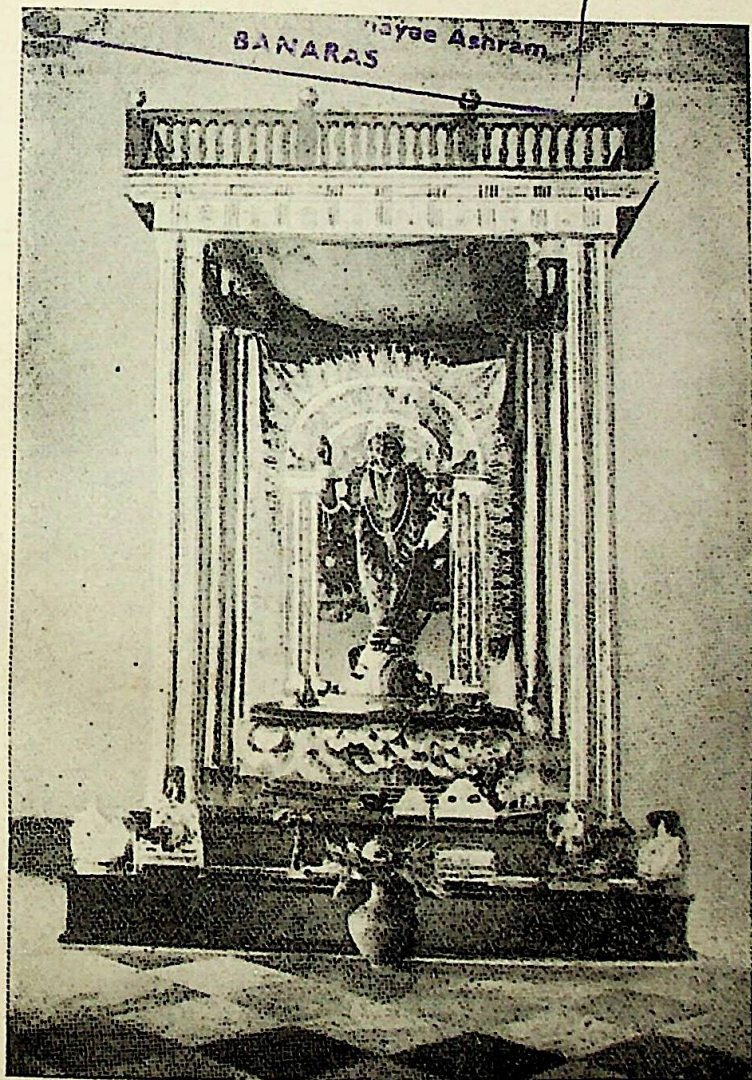
শ্রীশ্রীভবতারিণী

করিয়া দেবীর চিন্তা করিতে করিতে ঠাকুরকে শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনেকেই তখন চারিদিকে উপস্থিত। ঠাকুর গান গাহিতে গাহিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাঁহাকে মৃদু আঘাত করিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর দেখিলেন, রাণী ধ্যানে বসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত, পার্থিব বস্তুর চিন্তায় নিরত। ঠাকুরের অন্তদৃষ্টি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রভুস্থানীয়া, সর্ব্বজনমান্যা রাণী রাসমণিকে সকলের সম্মুখেই আঘাত ও তিরস্কার করিলেন। উপস্থিত সকলেই যুবক পুরোহিতের ধৃষ্টতা দেখিয়া যুগপৎ বিরক্ত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু সেই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী তিরস্কৃতা হইয়া কিশোরী বালিকার ন্যায় লজ্জিতা হইলেন, স্থির ও নম্রভাবে সেই আঘাত ও তিরস্কার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং বুঝিলেন, জননী ভবতারিণীই ঠাকুরের মুখ দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কত বিশাল হৃদয় হইলে তবে নিজ-বেতনভোগী পুরোহিতের নিকট হইতে এই তাচ্ছীল্য ও সর্ব্বজনসমক্ষে অপমান অবিকৃতচিত্তে সহ্য করা যায়। যেমন পুরোহিত—তেমনই তাঁহার নিয়োগকারিণী রাণী রাসমণি! পূজারী ও মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার ভিতর এরূপ মধুর সম্বন্ধ বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

এ দিকে মন্দিরময় মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল, কর্ম্মচারিবৃন্দ প্রভুভক্তিপ্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা করিয়া তুলিল। কিন্তু যিনি এই কোলাহলের স্বষ্টিকর্ত্তা, সেই ঠাকুরের প্রশান্ত মূর্ত্তি—অধরে মৃদু মৃদু হাসি। কত লোক ত কতবার বিষয়চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু তিনি "যাও মন্দির দেখ গে, এখানে ব'সে থেকে কি হবে" ইহার অধিক আর কিছুই বলেন নাই। কিন্তু রাণী রাসমণির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অন্যরূপ ছিল, সংসারচিন্তানিমগ্না এই মহীয়সী রমণীকে জাগ্রত করিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি ভাব

হইতে তিনি সর্ব্বজনসমাদৃতা বর্ষীয়সী এই রমণীর অঙ্গে আঘাত ও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বহুবর্ষ পরের একটি কথা হইতে উপলব্ধি করা যায়। সে দিন তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তাঁহার চিকিৎসার জন্য তখন উপস্থিত। কথায় কথায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ কর্‌তে হয়। শুধু শুন্‌লে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা করতে হবে।

"বৈদ্য তিনপ্রকার;—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা ব'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়, মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে, ঔষধ না খেলে কেমন ক'রে ভাল হবে, লক্ষীটি, খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও', সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনমতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

"বৈদ্যের মত আচার্য্য তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লন না, তিনি অধম আচার্য্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা কর্‌তে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান, তিনি মধ্যম আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনমতে শুনছে না দেখে কোন আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁকে বলি উত্তম আচার্য্য।"

ধর্ম্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে ঠাকুরের এই অভিমত হইতে রাণী রাসমণির প্রতি তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ব্যবহার আমরা বিশদভাবে বুঝিতে পারি।

ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার।

এ আঘাত ও তিরস্কার কয় জনের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে!

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মথুরানাথ

রাণী রাসমণি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস মন্দিরের কার্য্য পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার লইয়াছিলেন। ইনিই ঠাকুরের প্রথম ভক্ত ও সেবক। যখন দক্ষিণেশ্বর নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ প্রভৃতি কাহাকেও চিনিত না, সেই সময় এই ভক্ত চূড়ামণি স্বীয় অদ্ভূত দৃষ্টিশক্তি-সহায়ে তাঁহার বেতনভোগী পুরোহিতের বাহিরের দীনতা ভেদ করিয়া তাঁহার মহান্ আত্মার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দের অগ্রে ইঁহারই নাম উল্লেখযোগ্য। মথুরানাথ প্রথমে রাণী রাসমণির তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্ত্রী পরলোকগতা হইলে রাণীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মথুরানাথকে সাধারণতঃ "সেজ বাবু" বলিতেন। মথুরানাথ শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রথম সেবাইৎ। এই ভক্ত-চূড়ামণির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পরমহংসদেবের কথা ভাবিবার সময় আমরা এই ভক্তের কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ-কৌশল বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে কোন এক বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি লিখিয়াছেন যে,

সেই ফরাসীবীরের জীবন রচিত পাঠ করিবার সময় আমরা তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি নে, সোল্ট, মুরা প্রভৃতি বীরগণের কথা বারংবার লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, কিন্তু যে এঞ্জিনীয়রগণ সমস্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, সৈন্যদিগের যাতায়াতের পথ তৈয়ার করিয়া, ঘন-বনানী পরিষ্কার করিয়া, কামান রাখিবার স্থান প্রস্তুত করিয়া নেপোলিয়ানকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিয়াছিল, সেই অদ্ভুত পূর্ত্তকর্ম্ম-কৌশলী নীরব সহকর্ম্মী-দিগের কথা নেপোলিয়ানের কোন জীবন-কাহিনীতেই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। মথুরাবাবুর সম্বন্ধেও আমাদের ঠিক সেই কথাই মনে পড়ে।

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া হৃদয়ের অন্তস্থলে গোপনে একটি সাধ পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধনার সময় মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, ভক্তের রাজা হব।" দেবী ভবতারিণী তাঁহার সে সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই। কিন্তু এই ভক্তসম্রাটকে সর্ব্বপ্রথমে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রথম অর্ঘ্য ও রাজকর মথুরাবাবুই প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভক্ত ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই ইহলোক পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রায় চৌদ্দ বৎসরকাল তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে, দাস যেমন প্রভুকে সেবা করে, ভক্ত যেমন ইষ্টদেবকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, পুত্র যেমন পিতাকে ভক্তি করে এবং পিতা যেমন শিশুপুত্রের স্নেহের দাবী পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপে মথুরাবাবু নানাভাবে এই মহাপুরুষের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্থিব সম্বন্ধে একজন ছিলেন মন্দিরের বিভবশালী অধিকারী, অপরজন বেতনভোগী পুরোহিত মাত্র। তথাপি এই ভক্তের সহানুভূতি, ধৈর্য্য ও অন্তর্দৃষ্টির তুলনা ছিল না। দেবীর পূজা করিতে করিতে যখন ঠাকুর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দেখিতে পাইলেন, তখন পূজার প্রসাদী লুচি হইতে মন্দিরদ্বারে উপবিষ্ট বিড়ালও

বঞ্চিত হইল না। এই প্রসাদী লুচি মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ প্রত্যহ পাইতেন এবং মহাসমাদরে গ্রহণ করিতেন। লুচি বিড়ালকে খাওয়াইয়া পুরোহিত অপব্যয় করিতেছেন, ইহা হিসাবী খাতাঞ্চী সহ্য করিতে না পারিয়া মথুরাবাবুর নিকট. অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজান্দারের প্রতিনিধি তাঁহার মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আলেকজান্দারের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা যেমন আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ মথুরাবাবু খাতাঞ্চীকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও ঠাকুরের জীবনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন, "সেজোবাবু আমাকে বুঝতো, উত্তর দিয়েছিল, তিনি যা করেন, কিছুতে বাধা দিও না।" এই ঘটনার উপর কিছুই লিখিবার নাই, কিন্তু পরমহংসদেবের বিড়ালকে লুচি খাওয়ান যত বিস্ময়কর, তদপেক্ষা আরও বিস্ময়কর এই সাংসারিক বিভবশালী, বদ্ধজীবের পত্র যিনি যুবক পুরোহিতের বিড়ালকে লুচি খাওয়াইবার ভিতরের বস্তুটি যথাযথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মন্দিরের পূজা করিতে করিতে যখন ভাবান্তর হইতে লাগিল, যখন সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই আরতি চলে, কোথাও পূর্ণচ্ছেদ হয় না, যখন দেবীর চরণে পুষ্প না পড়িয়া মন্দিরের চারিদিকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল, যখন চন্দনচর্চ্চিত জবা একবার দেবী ভবতারিণীর শ্রীপাদপদ্মে, একবার পূজারীর মস্তকে স্থান পাইতে লাগিল, তখন এই মথুরাবাবু অন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া ঠাকুরকে ভগবৎচিন্তা করিবার পূর্ণ অবসর প্রদান করিলেন।

মথুরাবাবু পরমহংসদেবকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এই বিনা প্রয়োজনের মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিবার শক্তি ও পবিত্রতা এই ভক্তচূড়ামণির হৃদয়ে ছিল। কিন্তু পিতা যেমন শিশু পুত্রের সহিত ব্যবহার করেন, তাহার আদর ও আবদার সহ্য করেন, ঠিক সেই ভাবেই মথুরাবাবু ঠাকুরের সহিত চিরদিন ব্যবহার করিয়া

গিয়াছেন। জানবাজারে যখন মথুরাবাবু সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন স্বামিস্ত্রীর সহিত একই শয়নকক্ষে পরমহংসদেবের শয্যা রচিত হইত। এই আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাসের তুলনা কোথায়? মথুরাবাবু এক দিন কৌতূহলপরবশ হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাও?" দ্বিধাশূন্যভাবে ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, পাই," কিন্তু তথাপি একই শয়নকক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। একবার কোন এক বালককে জরির পোষাক পরিতে দেখিয়া এই বালক-পরমহংসের জরির পোষাক পরিবার সাধ হইয়াছিল। মথুরাবাবুর উপর আবদার হইল—"আমি জরির পোষাক পরব।" ধনী পিতা যেমন শিশু পুত্রের কোন সাধই অপূর্ণ রাখেন না, সেইরূপ মথুরাবাবুও ঠাকুরের সকল সাধই পূর্ণ করিয়াছিলেন। জরির পোষাক আসিল, ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া জরির পোষাক পরিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়্‌গুড়িতে তামাক খাইতে লাগিলেন। সে চিত্র কে বর্ণনা করিবে? এ যেন শিশু পৌত্র চশ্‌মা চোখে দিয়া সকলের অগোচরে—ঠাকুরদাদা সাজিয়া বসিয়াছে! মথুরাবাবু দাঁড়াইয়া কৌতূহলে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আর গম্ভীরমূর্ত্তি শিশু পরমহংস কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একবার তাকিয়ার এদিক্ একবার অন্যদিক ফিরিয়া গুড়্‌গুড়ির নল একবার মুখের এক পার্শ্বে পুনরায় অপর পার্শ্বে দিয়া মনের সাধ নিবৃত্ত করিতেছেন। হঠাৎ সাধ মিটিয়া গেল, গায়ে আগুন লাগিলে মানুষ যেমন ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি পরিধেয় জামাগুলি খুলিয়া ফেলে, সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া ঠাকুর যখন জরির পোষাকগুলি খুলিয়া চারিদিকে ফেলিয়া দিলেন, তখনও পার্শ্বে দণ্ডায়মান মথুরাবাবুর মুখে পূর্ব্বের ন্যায় সেই প্রশান্ত ও মধুর হাসি। আবার বালক যেমন পিতার নিকট শিক্ষা করে, তেমনই মথুরাবাবুর নিকট ঠাকুর শিক্ষা

করিতেন। জনৈক পণ্ডিত নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে, নিজের দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "ইনি খেয়েছেন," "ইনি করেছেন" বলিতেন, দেহে যাহাতে আত্মবোধ না হয়, তাহারই জন্য এইরূপ অভ্যাস করিতেন। ঠাকুরও পণ্ডিতের দেখাদেখি সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, নিজের দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "ইনি করিয়াছেন," "ইনি বলিলেন" বলিতে লাগিলেন। মথুরাবাবু এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি কেন ও রকম বল। ওদের অহঙ্কার আছে, ওরা ঐ রকম বলুক। তোমার ত অহঙ্কার নেই, তুমি কেন ওরকম বলবে?" সেই দিন হইতে ঠাকুরের আপনাকে "ইনি" বলা বন্ধ হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মথুরাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সহিত ঠাকুর তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণ। ঠাকুর পূর্ব্বে একবার ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নিজ জননীকে লইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মথুরাবাবুর কোন কোন পুত্র-কন্যাও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে তিনি কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথধাম প্রভৃতি নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে যমুনা-পুলিনে রাখালেরা গোচারণ করিতেছে দেখিয়া ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া বেলাভূমিতে "কোথায় কৃষ্ণ" "কোথায় কৃষ্ণ" বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরীয় বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইলে কি প্রবল অনুভূতি তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিত, দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন, তাহা সাধারণ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সুকঠিন। তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াও সাধারণ মানুষের হৃদয় দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদাই সংসারের দিকে ফিরিয়া থাকে, দেহ ঘুরিয়া বেড়ায়, মন পুত্র-কলত্র-সংলগ্ন হইয়া থাকে। তাই তীর্থপর্য্যটন-প্রত্যাগত

মানুষের পেটিকা নানা তীর্থের নানাবিধ খেলানা, বস্ত্র ও সাংসারিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদিতে প্রায়ই পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর তীর্থপর্য্যটন শেষ করিয়া বৃন্দাবন হইতে রজঃ আনিয়া তাঁহার সাধনার স্থল পঞ্চবটীতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন ও একটি মাধবীলতা আনিয়া পঞ্চবটীতে রোপণ করিয়াছিলেন। সমস্ত তীর্থসিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি একমুষ্টি—"ধূলি" ও একটি ফলবিহীন লতা সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলেন!

বৈদ্যনাথধামে যাইয়া ঠাকুর এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এত দিন কেবল "মা ও ছেলে" ইহাই দেখিয়া আসিতেছিলেন, আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া "মা" "মা" বলিয়া হাসিয়া, কাঁদিয়া, আদর আবদার করিয়া মায়ের ক্রোড়ের নিকট ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দিন কাটাইয়াছিলেন। তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়া যখন মাতৃক্রোড় হইতে একটু দূরে যাইয়া পড়িলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার জননীর আরও সন্তান আছে, তাহারা কাছে নয়, মার নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বিমাতার অনাদৃত সন্তানের ন্যায় অন্নবস্ত্রবিহীন, তাহারা 'মা' বলিয়া ডাকিতে শিখে নাই বলিয়া মা-ও যেন তাহাদের ভুলিয়া রহিয়াছেন। মথুরাবাবু ঠাকুরকে লইয়া যখন বৈদ্যনাথধাম পৌছিলেন, তখন দুর্ভিক্ষের করাল প্রতিমূর্ত্তি সমস্ত স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া অনশনক্লিষ্ট সাঁওতাল অধিবাসীদের শীর্ণ ও মলিন দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছিল। দুঃখে মৌন ও মূক এই হতভাগ্যদের নীরব বেদনায় ঠাকুর যেন অবশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মথুরাবাবুর নিকট আবদার করিয়া বসিলেন যে, এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হইবে।

মহাপুরুষগণের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদাই বিচিত্র। ঠাকুর পূর্ব্বে কিছু দিন তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়ীতে শিওড়ে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় হৃদয় একবার আনন্দ করিয়া বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া-

ছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ সংসারী লোক। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই যদি এই সব লোক ফের্ খাওয়াবি, তা হ'লে তোর বাড়ী থেকে তক্ষুনি চ'লে যাব।" আর একবার বহু বর্ষ পরে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি শিষ্যগণকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইবার জন্য কোনও এক ভক্তকে ঠাকুর আদেশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, শুদ্ধ-সত্ত্ব-সম্পন্ন মানুষকে ভোজন করাইলে মানবদেহে অগ্নিরূপে অবস্থিত ভগবান্‌কে আহুতি দেওয়া হয়। ঠাকুর এই নিরক্ষর, গভীর বেদনায় মূক ও নীরব সাঁওতালদের সহিত শিওড়ের ভদ্রবংশসম্ভূত শিক্ষাভিমানী লোকদের কি প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইবার জন্য মথুরাবাবুকে ধরিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন। মথুরাবাবু কিন্তু ঠাকুরের অনুরোধে মহা বিপদ্ গণনা করিলেন। এই বালক-পরমহংস অসীম ধৈর্য্যশালী এই ভক্তপ্রবরকে যত প্রকার বিপদে ফেলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুই বারের কথাই আমাদের সর্ব্বদা মনে পড়ে। এইবার মথুরাবাবু কাতরকণ্ঠে ঠাকুরকে বলিলেন যে, এতগুলি বুভুক্ষু-মুখে অন্ন প্রদান করা তাঁহার আর্থিক অবস্থার অতীত। ঠাকুর কিন্তু সে কথায় ভুলিলেন না, প্রাণ তখন কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সাধ্য অথবা অসাধ্য হিসাব করিয়া দেখিবার অবসর নাই। তিনি সেই দরিদ্র সাঁওতালদেরই মধ্যে গিয়া বসিলেন, নয়নধারায় বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল, তিনি তাহাদেরই এক জন হইয়া সেইখানেই থাকিবেন আর উঠিবেন না, এই কথা বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের অশ্রুধারা তাহার সৌন্দর্য্য কত শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, তাহা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণ মহাসমারোহে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মানবজাতির দুঃখতাপক্লিষ্ট মহাপুরুষ-হৃদয়ের সহানুভূতি-প্রসূত এই যে আঁখিধারা, তাহার সৌন্দর্য্য কোন ভাষাই প্রকাশ করিতে পারে না। মথুরাবাবু "বাবাকে" কত

বুঝাইলেন, কিন্তু "বাবা" নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা ভুলাইয়া দিবার শক্তি মথুরাবাবুর ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাঁওতালদের তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হইল।

কিন্তু মথুরাবাবুর ইহাতেও চৈতন্য হয় নাই। আর একবার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি এই ধনী সেবাইৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদাই এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গসুখলিপ্সায় উৎসুক হইয়া থাকিতেন। জমিদারীতে যাইয়া মথুরাবাবু খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দুই বৎসর ভালরূপ ধান্য উৎপন্ন না হওয়ায়, প্রজাগণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ঠাকুর ধরিয়া বসিলেন, তাহাদের খাজনা মাপ করিয়া দিতে হইবে এবং এক দিন তাহাদিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হইবে। মথুরাবাবু চোখে অন্ধকার দেখিলেন। কোথায় জমিদারীতে টাকা আদায় করিতে আসিয়াছেন, তাহা দূরে থাকুক, তাঁহাকে অর্থব্যয় করিয়া প্রজাদের খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু নির্ভীক, স্বাধীনচেতা এই পুরোহিত অশেষ স্নেহভক্তিসম্পন্ন তাঁহার নিয়োগকর্ত্তাকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ত নায়েব, এরা মার খাস তালুকের প্রজা;—মার টাকা মার প্রজাদের জন্য খরচ করবে, এ তোমাকে করতেই হবে।" আর একবার ঠিক এইরূপ কথাই ছত্রপতি শিবাজীকে তাঁহার দরিদ্রগুরু রামদাস শুনাইয়াছিলেন—

"তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

ঠাকুরের সত্য কথাগুলি তীক্ষ্ণ সূচির ন্যায় মথুরাবাবুর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তিনি খাজনাও পাইলেন না, প্রজাদের খাওয়াইতেও হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতা হইতে যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুর সাধনার প্রারম্ভেই কাল, স্থান, এমন কি, নিজ দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিলেন, তখন ঠাকুরের দেহের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। আহার, নিদ্রা, কিছুই মনে থাকে না; পঞ্চবটীতে গিয়া গভীর রাত্রিতে "মা" "মা" করিয়া ডাকিয়া বেড়ান,—এই অবস্থায় তাঁহাকে ডাকিয়া খাওয়ান, নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা, শরীরের পরিচর্য্যা, এই সমস্ত ভার অন্য কেহ না লইলে তখন দেহরক্ষা হইত না। ঠাকুর এই সময়কার অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মাকে বল্লাম্, এ দেহরক্ষা কেমন ক'রে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? তাই সেজবাবু চৌদ্দ বৎসর সেবা ক'ল্লে।" মথুরাবাবুর ভক্তি ও সতর্কতাই এই সাধনার সময় তাঁহার দেহকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এইরূপে ঠাকুরের প্রেমোন্মাদনার সময় শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী মথুরাবাবুকে দিয়াই তাঁহার যোগক্ষেম বহন করিয়াছিলেন। পদগৌরব, আত্মমর্য্যাদা সমস্ত ভুলিয়া, বিষয়ের লাভক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া যখন এই ভক্তশ্রেষ্ঠ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের সেবা করিতেছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়ের সমস্ত কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র পুরোহিত কি শক্তিবলে এই ধনী রাজজামাতাকে বশীভূত করিতে পারে? সকলে বলিতে লাগিল—"ছোট ভট্‌চায্যি তুক্ করেছে।" তাহাদের নিকট "তুক্ করা" ব্যতীত মানুষকে বশীভূত করিবার আর কোন উপায় পরিজ্ঞাত ছিল না।

কিন্তু এই অশেষ-ধৈর্য্যশালী, ভক্তিমান্, ধনী সেবাইৎকেও সময় সময় ঠাকুরের নিকট কঠোর সত্যকথা শুনিতে হইত। মানুষের চরিত্র ও মন উভয়ই বিচিত্র। সেবা করিয়াও মানুষের অহঙ্কার হয়। বড় বড়

সাহেবদের খান্‌সামা অথবা বাবুর্চ্চি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অন্যান্য লোকের সংস্পর্শে আসিলে এই দাসগণ "সাহেবের খানসামা" বলিয়া কত অহঙ্কারের সহিত আচরণ করিয়া থাকে। সাধারণ শক্তি-মদমত্ত মানুষের সেবা করিয়াই যদি এত অহঙ্কার হয়, তাহা হইলে শুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষের পরিচর্য্যা করিয়া দুর্ব্বলচিত্ত মানব গৌরব অনুভব করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। মথুরাবাবুর হৃদয়ের কোন্ গোপন অন্তস্থলে কোথায় এই মহাপুরুষকে সেবা ও ভক্তি করিবার অহঙ্কারের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু ঠাকুরের দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইত না। এক দিন তিনি মথুরাবাবুর এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি মনে ক'র না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মান্‌ছো ব'লে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম। তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটা কথা আছে, মানুষ কি কর্‌বে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো।" সেই যন্ত্রীর হাতে মথুরাবাবু যে কেবল যন্ত্রস্বরূপ—কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়—সেই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইয়াছিল।

"ভক্তের রাজা" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম রাজভক্ত প্রজা মথুরানাথ বিশ্বাস ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

দাম্পত্যজীবনের রহস্য

ঠাকুরের সাধকজীবনের ইতিহাস বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তাঁহার অন্তরের কোন্ নিভৃতস্থলে কোথায় কোন্ সময়ে তাঁহার প্রকৃত সাধকজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজিও অজ্ঞাত, তাঁহার কোনও জীবনচরিতই তাহা লিপিবদ্ধ করে না, তাঁহার অভিন্নহৃদয় শিষ্যগণও তাহা জানিতেন না। কিন্তু মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে বাহিরের ক্রিয়াকলাপে তাঁহার যে অন্তরের সাধনার প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার আরম্ভ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণীর' আগমনের পর হইতে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্ব্বে ঠাকুরের পার্থিব জীবনে যে মহারহস্যময় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা এখন উল্লেখ করিব। ঠাকুরকে সর্ব্বদাই বিমনা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁহার বিবাহ দেন। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীসারদামণি দেবীর সহিত ঠাকুরের বিবাহ হয়। ঠাকুরের বয়স তখন ২৩ বৎসর, শ্রীসারদামণির বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র। এই বিবাহসম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে। ঠাকুরের সহিত শ্রীশ্রীমার কোনও দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, তাহা আজ সকলেরই পরিজ্ঞাত। জগতের অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী লক্ষ্য করিলে আমরা এই ঘটনার দ্বারাই শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিতে পারি। যীশুখৃষ্ট বিবাহ করেন নাই, তাঁহার অকলঙ্ক ব্রহ্মচারী জীবন আমাদের বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করে। বিবাহ না করিয়া চিরকুমারব্রত গ্রহণ

করিয়া নিষ্পাপ পবিত্র জীবন যীশুখৃষ্ট ব্যতীত আরও অনেক মহাপুরুষ যাপন করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং যীশুখৃষ্টের অবিবাহিত ব্রহ্মচারিজীবন প্রশংসনীয় হইলেও বিচিত্র নহে। যে মহাপুরুষ সাধকজীবনে স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেন না, যাঁহার কামিনীকাঞ্চনত্যাগের আদর্শ যেমন কঠোর, তেমনই বিস্ময়প্রদ, যে ধর্ম্মোপদেষ্টা স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহার জন্য প্রাণপ্রিয় ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া নিজ আদর্শের উজ্জ্বলতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকেও যৌবনে দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়া সাধারণ গৃহীর ন্যায় আচরণ করিতে হইয়াছিল। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম", এই মহামন্ত্র প্রচার করিতে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও বিবাহ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকেও সাধারণ সংসারীর ন্যায় আচার-ব্যবহারে আবদ্ধ হইয়া পিতার দায়িত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াও চির-ব্রহ্মচারী, সংসারী হইয়াও চির সন্ন্যাসী। ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি কখনও স্বপ্নেও স্ত্রীলোকের সহিত দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন অথবা তাহার কল্পনাও করেন নাই। যে মহাপুরুষ সর্ব্বদাই বলিতেন যে, "সত্য কথা কলির তপস্যা", যাঁহার সত্যনিষ্ঠা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সেই মহাপুরুষের এই কথাগুলি একবার ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ে দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাঁহার এই কথাগুলিই তাঁহাকে যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ভিতর হইতে পৃথক করিয়া দেয়। এই বিবাহের কয়েক বর্ষ পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের বয়ঃক্রম তখন ৩৬ বৎসর ও শ্রীশ্রীমার বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। এই সময়ে একাদিক্রমে একই ঘরে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা দিনের পর দিন প্রায় ছয় মাসকাল দিবারাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এই

সময়কার এক দিনের কথা আমরা উল্লেখ করিব। সে দিন রাত্রি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, ঠাকুরের ঘরে শয্যার চতুষ্পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড জ্যোৎস্না পড়িয়া ঘরটিকে আলোকে ও আঁধারে সুন্দর করিয়াছিল। শ্রীশ্রীমা শয্যার উপর নিদ্রিতা। ঠাকুর আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া সেই দিন বলিয়াছিলেন যে, ভাবের ঘরে চুরি করিয়া কোন লাভ নাই, পার্থিব সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা যদি অন্তরের কোনও নিভৃতস্থলে কোথাও লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মপ্রবঞ্চনা করা বৃথা, কিন্তু এই পার্থিব সুখভোগের দ্বারা পরমার্থলাভ হয় না, ইহাও সুনিশ্চিত। কি কঠোর আত্মপরীক্ষা! যে মন আপনাকে আপনি এমন করিয়া কঠিন পরীক্ষার ভিতর লইয়া যাইতে পারে, সে মনের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার শক্তিও পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাই ঠাকুর বলিতে পারিয়াছিলেন, ছয় মাস একত্র একই কক্ষে নিজ সহধর্ম্মিণীর সহিত বাস করিয়াও তিনি এক দিনের জন্য স্বপ্নেও কখন স্ত্রীসংসর্গ করেন নাই। বিবাহিত জীবনে এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের আর দ্বিতীয় উদাহরণ কি কাহারও জানা আছে? ঠাকুর যদি জীবনে আর কোন কথাই না বলিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার এই অপরূপ কৌমার্য্যজীবনের আদর্শই শতসহস্র কণ্ঠে জগতে ঘোষিত হইয়া ভারতের অপূর্ব্ব চিত্তসংযমের জ্যোতিঃ চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ন রাখিত।

কেহ কেহ মনে করেন, ঠাকুর তাঁহার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করেন নাই; তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিবলে ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচারিজীবন যাপন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর না হইতেও পারে। সুতরাং স্বামীর কর্ত্তব্য করিতে পরাঙ্মুখ মনকে বিবাহে প্রণোদিত করা তাঁহার উচিত হয় নাই। ঠাকুরের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অনেক ধীমান্ ব্যক্তিকেও এইরূপ অসঙ্গত অভিমত প্রকাশ করিতে দেখা যায়। স্বামী ও স্ত্রীর

আদর্শ সম্বন্ধ কি, সে বিষয়ে দুই একটি কথা এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনক্ষেত্রের তিনটি বিভিন্ন স্তর আছে—এই মিলনক্ষেত্র স্বামীস্ত্রীর পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য, সাধারণ মানুষের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। দৈহিক সম্বন্ধই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সর্ব্বনিম্ন স্তরের সম্বন্ধ। মানুষ কখনও কখনও পশু-প্রবৃত্তির তাড়নায় এই দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করে, দেশ, কাল, সমাজ সমস্ত ভুলিয়া, আত্মমর্য্যাদা, সমাজের বিধান, ধর্ম্মের আদেশ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া অবৈধ দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। সমাজবন্ধনের ভিতর স্বামিস্ত্রীর মধ্যেও যখন নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখনও, এই পশুপ্রবৃত্তিই যৌবনে প্রথম প্রকাশিত হইয়া বৈধ গণ্ডীর ভিতর মানুষের জীবনের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামীস্ত্রীর এই দৈহিক সম্বন্ধ দাম্পত্য-জীবনের আরম্ভ মাত্র, শেষ নহে। প্রস্ফুটিত কমলের অধোদেশে যে পঙ্কিল সলিল, তাহার শেষ পরিণতি প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধে। এই দৈহিক সম্বন্ধের ঠিক্ উচ্চস্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাহচর্য্য। তাই আমরা দেখতে পাই, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্বন্ধ স্বভাবতঃই সংস্থাপিত হইয়া থাকে। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক সহজেই আপনার একটি গোষ্ঠী নির্ম্মাণ করিয়া লয়, অনেকেই সেখানে যাতায়াত করিয়া থাকে, বিনা প্রয়োজনেও সেখানে লোকসঙ্ঘ দেখা যায়। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এই সম্বন্ধ দৈহিক সম্বন্ধ হইতে অনেক উচ্চে, অধিক মধুর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। তাই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধিবৃত্তিসর্ব্বস্ব বর্ত্তমান যুগে বিদ্বান্ যুবকগণ শুধু সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সৌন্দর্য্যের উপর আর কিছু অধিকতর স্থায়ী জিনিষ সন্ধান করিয়া থাকে। শুধু দৈহিক সম্বন্ধস্থাপন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে অপূর্ব্ব রূপবতী বিদ্যাহীনা

যুবতীই বিবাহে একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইত। কিন্তু মানুষ শুধু সুন্দরী স্ত্রী হইলেই সুখী হইবে মনে করে না, তাই বিদুষী কি না, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়; রূপ ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত চিরস্থায়ী ও তাহার পরিচালনা সমধিক আনন্দপ্রদ। দৈহিক আনন্দ স্থূল, সুতরাং সেই পরিমাণে কম সুখপ্রদ, বুদ্ধিবৃত্তির আদান প্রদানজনিত যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, সুতরাং সেই পরিমাণে অধিককাল স্থায়ী ও সমধিক সুখপ্রদ। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ সম্বন্ধের অনেক উচ্চে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত। ক্ষুদ্র প্রদীপের সহিত দীপ্তিমান মধ্যাহ্নসূর্য্যের যে প্রভেদ, সুখদুঃখপ্রপীড়িত পার্থিব জীবনের সহিত অপার্থিব আনন্দময় অনন্ত জীবনের যে পার্থক্য, দৈহিক অথবা মানসিক সম্বন্ধের সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধেরও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের যে মিলন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের মিলন। তাই আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্মগুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা জগতের কোনও সম্বন্ধের সহিতই তুলনীয় নহে।

দরিদ্র স্বামীকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে আভিজাত্যাভিমানিনী স্ত্রীকে মনের সহিত অনেক সংগ্রাম করিতে হয়, দরিদ্র শিক্ষককে ধনী ছাত্র প্রায়ই করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বস্বত্যাগী ধর্ম্মগুরুর নিকট লক্ষাধিপতি মন্ত্রশিষ্যকেও অবনতমস্তকে ভক্তিবিনীত ব্যবহার করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষগণের জীবনে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকেন, কিন্তু পার্থিব সম্বন্ধ বিহীন শিষ্যগণই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের গুরুর সহিত মিলিত হইয়া আত্মীয় অপেক্ষাও পরমাত্মীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এক

দিন যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যীশুখৃষ্ট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—'Who is my mother? and who are my brethren?' (কে আমার মা? আমার ভাই কে?) "And he streched forth his hand toward his disciples and said, Behold my mother and my brethren." (এবং তিনি শিষ্যগণের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহারাই আমার মা ও ভাই')। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা ঠিক অনুরূপ কথাই শুনিতে পাই। একবার কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখো, যারা আপনার তারা হ'ল পর—রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর, তারা হ'ল আপনার।.......এখন ভক্তরাই আত্মীয়।" যীশুখৃষ্ট ও ঠাকুরের এই কথাগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই বোঝা যায় যে, মহাপুরুষরা রক্তমাংসের সম্বন্ধকে অথবা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সাহচর্য্যের সম্বন্ধকে কখনও অধিক করিয়া দেখেন না, একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের মিলনকেই প্রকৃত সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানবজীবনে এই আধ্যাত্মিক মিলনকে যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঠাকুরের শ্রীমার প্রতি ব্যবহারে কোনও বৈষম্যই পরিলক্ষিত হয় না। দৈহিক সুখের অপেক্ষা মানসিক তৃপ্তি অধিকতর প্রীতিপ্রদ, এবং মানসিক তৃপ্তি হইতেও আধ্যাত্মিক শান্তি অশেষ পরিমাণে বাঞ্ছনীয় ও আনন্দপ্রদ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সেই আধ্যাত্মিক সাহচর্য্যের আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুরকে আদর্শ স্বামী ও শ্রীমাকে আদর্শ সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ মানুষকে দৈহিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া

শ্রীশ্রীমাতা সারদা দেবী

মানসিক সাহচর্য্যের স্তরে অগ্রসর হইতে হয় এবং মানসিক সাহচর্য্যের ক্ষেত্র হইতেই মানবদম্পতি এক দিন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাইবার আশা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেই স্বামিস্ত্রীর মিলনের শেষ হইয়া যায়, অতি অল্পসংখ্যক দম্পতিই সেই স্তর ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাঙ্গালার মহাকবির যে প্রচলিত সঙ্গীত বিবাহের সময় অর্থহীন অক্ষরসমষ্টিরূপে আরম্ভ হইয়া সাধারণতঃ চিরদিন অর্থহীন থাকিয়াই যায়, তাহা ঠাকুরের দাম্পত্য জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলেছে যদি
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছ তার তুমি প্রেম-পারাবার
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিশিতে চায়।

ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীমার অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিকী শক্তি দৈহিক অথবা মানসিক বৃত্তি-সমূহের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত, সুতরাং তিনি আত্মীয়া হইয়াও অন্যান্য স্বজনবর্গের ন্যায় ঠাকুরের পর হইয়া যান নাই, চিরদিন নিকটতম আত্মীয়া থাকিয়াই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহধর্ম্মিণীর অধ্যাত্ম-জীবনে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, কোনও স্বামীই নিজ কর্ত্তব্যপালনে তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দপ্রদ, চিরস্থায়ী শান্তি নিজ সহধর্ম্মিণীর জীবনে প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। তাই একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, ঠাকুর হিন্দু স্বামীর আদর্শের মর্য্যাদা চিরদিন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ করিয়া দেশ হইতে ফিরিবার পর ঠাকুরের জীবন আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সংসারের প্রতি মন আকৃষ্ট করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজনরা বিবাহ দিয়াছিলেন, বিবাহ হইল, কিন্তু ফল বিপরীত

হইল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবীর পূজায় তন্ময় হইয়া পড়িলেন, সর্ব্বদাই 'মা' 'মা' করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করেন, পূজার সময় শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি পরিহার করিয়া প্রাণের আবেগে বিশৃঙ্খলার মধ্যেই দেবীর পূজা হয়, বিষয়ি-সংস্পর্শ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। দক্ষিণেশ্বর পূজামন্দিরের কর্ম্মচারিবৃন্দ মহাকৌতূহলী হইয়া সর্ব্বদাই ছোট ভট্‌চায্যির এই আমূল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। রাণীর বুদ্ধিমান্ বিষয়ী জামাতা মথুরনাথও ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং মনে মনে এই ধর্ম্মোন্মাদকতার এক প্রতীকার উপায়ও স্থির করিয়া ফেলিলেন।

সাধক-জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত মহাপুরুষই চিত্তশুদ্ধি ও সংযমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন স্বচ্ছ দর্পণ ব্যতীত প্রকৃত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ শুদ্ধ আধার না হইলে অরূপের রূপ তাহাতে প্রকাশিত হয় না। তাই মহাপুরুষগণের জীবনে দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবনে কত প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে চিত্তের সংযম ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। এই প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম অখণ্ড ধর্ম্মজীবনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও প্রলোভন-ত্যাগের দ্বারাই মানুষের মন স্বচ্ছ, শুভ্র ও পবিত্র হইয়া চিৎস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উপযুক্ত আধারে পরিণত হইয়া থাকে। যীশুখৃষ্টের সাধকজীবনের প্রারম্ভেই সয়তান তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অসীম ঐশ্বর্য্য, যশোগৌরব, একাধিপত্য সমস্তই তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সয়তানকে সেই স্থান হইতে দূরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বারবনিতা কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন এবং বোধিগয়ায় তিনি যখন ধ্যানে নিমগ্ন, তখন "মার" নামক পাপপুরুষ তাঁহাকে নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু শাক্যসিংহ ইন্দ্রিয়সংস্পর্শজাত ভোগসুখ তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভক্ত হরিদাস যখন ইষ্টদেবতার নামজপ করিয়া তন্ময়, সেই

সময় বিষয়ী লোকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার নিভৃত কুটিরে সুরূপা এক বারবনিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। লৌহ পরশমণির সংস্পর্শে আসিলে পরশমণিকে লৌহত্বে পরিণত করিতে পারে না, আপনিই সোণা হইয়া যায়। সেই ভাগ্যবতী রমণী ভক্ত হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া আপনিই ভগবানে ভক্তিমতী হইয়া শেষজীবন আনন্দে যাপন করিয়াছিল। ঠাকুরকেও বড় কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। মথুরাবাবু তাঁহাকে তখনও হয়ত ঠিক চিনিতে পারেন নাই, সুতরাং পরীক্ষা করিবার মানসে, অথবা তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদকতা আরোগ্য করিয়া বিষয়রসে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তিনি ঠাকুরের কক্ষে এক সুরূপা বারবনিতা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব্ব মধুরভাবে এই ঘটনা নিজেই কতবার ব্যক্ত করিয়াছেন।—“সুন্দর চোখ ভাল।” ভক্ত হরিদাসকে যখন এই ভাবে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল, তখন হরিদাস সাধকশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, দিবারাত্রিতে তিন লক্ষ ইষ্টনাম জপ করিতেন, ইন্দ্রিয়-প্রলোভন তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইতেও অধিক তুচ্ছ! কিন্তু ঠাকুরের সাধকজীবনের প্রারম্ভেই প্রায় ২৩ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই কঠিন পরীক্ষা হইয়াছিল। সাধারণতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম এই সময়ে বলবান্ থাকে, কিন্তু চিত্তসংযম ঠাকুরকে সাধনার দ্বারা লাভ করিতে হয় নাই, তিনি আজন্ম সংযমী ছিলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, সেই “সুন্দরস্বরূপের” রূপ হৃদয়ে একবার দর্শন করিলে রম্ভাতিলোত্তমার সৌন্দর্য্য তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়—‘তুচ্ছং ব্রহ্মপদং কুতঃ পরবধূসঙ্গঃ ?’ যে কবিদৃষ্টি তাঁহাকে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎসের নিকট লইয়া গিয়াছিল, সে দৃষ্টিকে কি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও সসীম দেহের সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট করিতে পারে? বিখ্যাত মনীষী প্লেটো সেই চিৎস্বরূপকে ‘The Fountain of all Beauty’ (সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎস) বলিয়াছেন। জগতে যত কিছু সুন্দর বলিয়া

প্রতিভাত হয়,—পুষ্পের কোমলতা, শিশুর হাসি, রমণীর সৌন্দর্য্য, সবই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্রের ঈষৎ পরিস্ফুরণ! কণামাত্রই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু যে ভাগ্যবান্ সেই অনন্ত আধারের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার কি "লোভের" সীমা আছে, না, তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য-পারাবার ত্যাগ করিয়া কণিকায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণ সহজেই সেই অনন্ত-সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং রমণীর "সুন্দর চোখ ভাল" তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তিনি শুদ্ধ, শান্ত ও পবিত্র মন লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তন্ত্রসাধনা ও ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী

সমস্ত জাতির মধ্যেই মনুষ্যকুলপ্রদীপগণ সময়ের মূল্য উপলব্ধি করিয়া জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কায়মনোবাক্যে সমগ্র প্রাণ নিয়োজিত করিয়া থাকেন; কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় সময়ের মূল্য সম্বন্ধেও তুলাদণ্ডের বিভিন্নতা মানব-জীবনে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মহৎ লোকের জীবনেও সময়ের মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে না,—লোকবিশেষে জীবনের সার্থকতার বিভিন্ন আদর্শের জন্য সময়ের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া যায়। পরোপকারই যাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য, তাঁহার নিকট সময়ের মূল্য একরূপ, আবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেশকে নির্ব্বিঘ্ন ও আপনাকে কর্ত্তব্যসাধনের গৌরবে মণ্ডিত করা যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, তাঁহার নিকট সেই সময়ের মূল্য অন্যরূপ। কিন্তু যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টার দর্শনলাভ, তাঁহার সময়ের মূল্য আর কাহারও সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। সময়ের ব্যবহার করিয়া যে বস্তু লাভ করা যায়, সেই বস্তুর মূল্য দিয়াই সময়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। কিন্তু যে সময় দিয়া আত্মজ্ঞান অথবা ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে, সে সময়ের মূল্য নাই; সে সময় অমূল্য। কবি রামপ্রসাদ তাঁহার জীবনে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

> 'এমন্ মানব-জনম রইল পতিত
> আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা'

এই "সোণা" সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ম্মিগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সাধক রামপ্রসাদের ধারণা এই

বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। তাই যৌবনের প্রারম্ভেই সাধক-জীবনের সময়, সন্ধ্যা হইলেই সমস্ত দিনের ব্যর্থতা তাঁহার ব্যাকুল মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিত, তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া বলিতেন—

'একটা দিন বৃথা গেল, দেবীর দর্শন হ'ল না!'

ইহার অপেক্ষা সময়ের মূল্যজ্ঞান আর অধিক সম্ভবপর নহে। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে ধারণাই হৃদয়ে থাকুক্ না কেন, মানব-জীবনের সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এমন ব্যাকুলতা আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় নাই। আমরা মনে করি, সময়ের প্রকৃত ব্যবহার অথবা মূল্য-নির্দ্দেশ পাশ্চাত্য জগতের বিশেষত্ব, কিন্তু সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা মানব-জীবন ফলবান্ করিয়া তুলিবার আদর্শ প্রাচীর চিরন্তন ও নিজস্ব বস্তু।

ঠাকুরের জীবনে কিন্তু কোন দিনই ব্যর্থ হয় নাই, তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার সমস্ত দিনগুলিকে সাধনার উপ্তবীজের দ্বারা ঠাকুরের অজ্ঞাতেই সফল ও সার্থক করিয়া যাইতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি ঠাকুরের জীবনে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্ম্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।
নষ্ট হয় নাই; প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্য্যামী দেব!

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অপরাহ্নকালে একখানি নৌকা মন্দিরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। এক গৌরবর্ণা আলুলায়িতকুন্তলা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী নৌকা হইতে ঘাটে অবতরণ করিলেন। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সন্ন্যাসিনী বলিলেন—

"বাবা, তোমায় খুঁজছি,—তুমি এখানে রয়েছ—এত দিনে তোমার দেখা পেলাম।"

কোথায় এ সন্ন্যাসিনী ঠাকুরকে খুঁজিয়াছিলেন, কি উদ্দেশ্যে সেই দিন অপরাহ্নসময়ে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, ঠাকুরকে খুঁজিবার কি কারণ এই সন্ন্যাসিনীর জীবনে ছিল, কোন্ শক্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া সেদিন সেই পথে আনিয়াছিল, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক হইলেও আজ তাহা চিরদিনের জন্য অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে।

সন্ন্যাসিনীর পূর্ব্বনাম যোগেশ্বরী, জাতিতে ব্রাহ্মণী এবং ভদ্রবংশসম্ভূতা। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অপূর্ব্ব রূপবতী এই সন্ন্যাসিনীর অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্টতা ছিল যে, সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও ভঙ্গিমাই তাঁহাকে ভদ্রবংশসম্ভূতা বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিতে পারিত। কোন কোন লোকের আকৃতির মধ্যেই এমন একটা লাবণ্য ও বিশিষ্টতার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ লক্ষ মানবমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেও তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠবই তাঁহাকে ভদ্রবংশ-সম্ভূতা বলিয়া পরিচিত করিয়া দেয়। এই ব্রাহ্মণীর শরীরেও সেই বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় ব্রাহ্মণীর বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর। যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার সন্ধিক্ষণে এই যে বয়স, ইহা বড়ই গম্ভীর, বড়ই মনোরম। এই বয়সে যৌবনের সুগঠিত পরিপূর্ণতা বিদ্যমান থাকে অথচ তরল চাঞ্চল্য প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়া যায়। অপরাহ্নের তরঙ্গহীন প্রশান্ত সাগরের ন্যায় এই বয়ঃক্রম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। রূপের মাদকতা তখন থাকে না, অথচ দেবীপ্রতিমার সৌন্দর্য্যের মত সমস্ত মনকে মুগ্ধ করে। এই সময়ে নারী ব্রহ্মচারিণী হইলেও মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দেয়, সন্ন্যাসিনী হইয়াও যেন মানুষকে নিজ স্নিগ্ধ ক্রোড়ের দিকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বোপরি সত্ত্বপ্রধানা এই নারীর

মুখে যে স্নিগ্ধশান্তি ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, তাহাতে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের ও অঙ্গসৌষ্ঠবের কমনীয়তা শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইত। বিষয়ভোগপ্রয়াসী মথুরানাথ একদিন এই মাতৃমূর্ত্তির নিকট নিজ বিষয়-বাসনা-লোলুপ মন লইয়া বিদ্রূপ করিতে গিয়াছিলেন। "ভৈরবি, তোমার ভৈরব কোথায়?" বলিয়া মথুরানাথ মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন। ভৈরবী দেবীর পদতলে শায়িত শবাকার মহাদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। চতুর মথুরানাথ বলিলেন, "ও যে নড়ে না।" শাণিত তরবারির ন্যায় একটা দৃষ্টি একবার মথুরানাথের উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবীর বাণী আসিল—"ঐ শবকেই যদি না জাগাইতে পারি, তবে আমার সাধনা বৃথা।" মথুরানাথ যোগেশ্বরীর কথাটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন কি না, অথবা সেই শাণিত তরবারির ন্যায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, তাহা আজ ঠিক করিয়া অনুমান করা কঠিন; কিন্তু সেদিন মথুরানাথ নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিষয়রস-প্রলুব্ধ মন ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহাকে ভৈরবীর সহিত প্রচলিত বিদ্রূপ করিতে প্রণোদিত করে নাই।

সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিলেন না, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে একাদিক্রমে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরকাল ঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করিয়া প্রথম দুই বৎসর তাঁহাকে নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়াকল্পে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঠাকুর এই সন্ন্যাসিনীর কথা বলিবার সময় 'ব্রাহ্মণী' বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিতেন। ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর দেবায়তনে ৬।৭ দিন বাস করিবার পর ঠাকুর নিকটবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তাঁহার বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সর্ব্বত্যাগী সাধকপ্রবর নিজে সমাজের সহিত কোন সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট না হইয়াও সমাজ এবং হিতকর লোকমতকে কি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণীর বাসস্থানের এই ব্যবস্থা হইতেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

এই ব্রহ্মচারিণীর দেবায়তনমধ্যে ঠাকুরের নিকটে বাস করা সমাজের চক্ষুতে দৃষ্টিকটু হইতে পারে, ইহাই চিন্তা করিয়া শুদ্ধচিত্ত, ইন্দ্রিয়জয়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বর গ্রামে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ধর্ম্মজীবনে প্রথম গুরু এই সর্ব্বত্যাগিনী ব্রাহ্মণী রমণী। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতেই তন্ত্রশাস্ত্রমতে সমস্ত পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণী প্রায় দুই বৎসরকাল ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত নানাবিধ সাধন করাইয়াছিলেন। বিল্ববৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন রচনা করিয়া নরকপাল, মহামাংস প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত বিধিমতে এই ব্রহ্মচারিণী ঠাকুরকে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকল্পে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সাধনের সময় ঠাকুরের দীর্ঘ কেশরাশি ধূলাকাদা ও জল লাগিয়া জটায় পরিণত হইয়াছিল, দেহের প্রতি তখন কোন লক্ষ্যই ছিল না। কিন্তু ঠাকুর নিজে তন্ত্রোক্ত সাধন করিলেও এবং কোনও সাধন-প্রণালী নিন্দা না করিলেও ভবিষ্যতে শিষ্যমণ্ডলীকে কখনও তন্ত্রসাধন করিতে উৎসাহিত করেন নাই।

এই তন্ত্র-সাধনার সময়ে ঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করিব। তন্ত্রসাধনায় নারীকে বিশ্বপ্রসবিত্রী জগৎ-জননীর প্রতীক-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহায্যে সাধনার প্রথা বহুদিন হইতে তান্ত্রিক-সাধকদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঠাকুরের তন্ত্র-সাধনার সময় এক দিন ব্রাহ্মণী নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে রূপ-যৌবন-সম্পন্না একটি যুবতীকে সঙ্গে করিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রথায় পূজা করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করেন। কামিনী-কাঞ্চনবিরাগী এই সাধকের মন নারীর সান্নিধ্য ও সাহায্যে সাধনার কল্পনায় স্বভাবতঃই একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তির সহায়ে ও সমগ্র নারীজাতির মধ্যে বিশ্বজননীর অন্তর্নিহিতা সত্তা অনুভব করিয়া চিত্তের সেই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা পরিহার-পূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই নারীর মধ্যেই

বিশ্বজননীর পূজা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সাধকজীবনে এই তন্ত্রসাধনার অন্য কোনও সার্থকতা হইয়াছিল কি না, তাহা তিনি ব্যতীত কেহই বলিতে পারে না; কিন্তু এই সাধনার ফলে মনুষ্যদৃষ্টির গোচরীভূত এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনে চিরদিনের জন্য সংঘটিত হইয়াছিল,—তিনি সমগ্র নারীজাতির মধ্যে তাঁহার বিশ্বজননীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে, ঠাকুর কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শ প্রচার করিয়া সমগ্র নারীজাতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কামিনী ও কাঞ্চন এই দুইটি কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে সমাসবদ্ধভাবে প্রায়ই একত্র ব্যবহৃত হইয়া মানুষের মনে এই ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে যে, কামিনী ও কাঞ্চনকে তিনি সমভাবে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইধারণা ভ্রান্তিমূলক। ঠাকুর কাঞ্চনকে ঘৃণা করিতেন, অশেষ অনিষ্টের আকর বলিয়া ইহাকে জীবন হইতে দূরে—অতিদূরে—সর্ব্বদাই নিজচক্ষুর অন্তরালে রাখিতেন। কাঞ্চনত্যাগ তাঁহার নিজ ও অপর সকলের জীবনেরই আদর্শ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নারীকে তিনি সমাদর করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন, কেবলমাত্র সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত মানবের পক্ষে ইহার বাহ্য আকর্ষণ মোহকর বলিয়া, ঈশ্বরলাভের অন্তরায় স্বরূপ জানিয়া অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজে কাঞ্চনের সহিত কামিনীত্যাগেরও আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মধ্যযুগের এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নারীকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের সঙ্গ মানবজীবনে বিষবৎ অশেষ অনিষ্টের আকর বলিয়া ত্যাগ করিবার শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহাদের মতে নারী সয়তানের প্রতীকস্বরূপ, সুতরাং তাহার সঙ্গ পরিত্যাজ্য। কিন্তু ঠাকুর নারীকে বিশ্বজননীর প্রতীকস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টি নারীর বাহিরের সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের কমনীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া সেইখানেই প্রতিহত হইয়া যায়, এই সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের মধুরতার অন্তরালে যে ঐশী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তথায় প্রবেশলাভ করিতে পারে না। হীনবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নারীর দেহ অধিকার করিতে পারিলেই তাহার সর্ব্বস্ব পাইল মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ লোক নারীর হৃদয়ে স্থান পাইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ নারীর নারীত্বের অন্তরালে সর্ব্বগুণাধার ঐশীশক্তিপ্রসূত উৎসের সন্ধান না পাইলে তাঁহাদের নারীজীবনের সহিত পরিচয় মিথ্যা ও নিষ্ফল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাই সাধারণ মনুষ্যের সহিত নারীর সম্বন্ধ দেহ ও মনের ভিতর দিয়াই শেষ হইয়া যায়, মানুষ আত্মার পবিত্রতা ও জ্যোতির সন্ধান করিতে পারে না। সেই জন্যই ঠাকুরের বাণী, কামিনীসঙ্গ-ত্যাগের আদর্শ বারংবার প্রচার করিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার জীবনে নিজ অপূর্ব্ব-ব্যবহারের দ্বারা নারীর যে মর্য্যাদারক্ষা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। তাঁহার সাধনজীবনে তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ত্যাগী সন্ন্যাসীগণকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক লোক দেখিলেই তাঁহাদের সাহচর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম গুরু যে নারী, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। নারীকে প্রথম গুরুরূপে বরণ করিয়া তিনি ধর্ম্মজীবনে নারীর মহিমা জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতে মানুষের সহিত নারীর সম্বন্ধ এতই জটিল ও বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঠাকুরের নারীসম্বন্ধে অভিমত একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। "শক্তিমদমত্ত ঐ বণিক বিলাসী ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে" সঙ্কুচিত হইয়া যখন

সকল বিষয়েই আমরা হীন বলিয়া জগতের নিকট প্রতিপন্ন হইতেছিলাম, তখন আমরা মনে করিতাম যে, পাশ্চাত্য জগতের যাহা কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাই শ্রেয়ঃ, তাহাই সুন্দর। এই মোহের বশবর্ত্তী হইয়া এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, নারীর প্রতি পাশ্চাত্য জগতের যে ব্যবহার তাহাই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ, প্রাচী নারীজাতির প্রতি অনাদর ও অবিচার যুগ-যুগান্তর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। যখন ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার সহধর্ম্মিণীর হস্তধারণ করিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বযান অথবা বাষ্পযান হইতে তাঁহাকে অবতরণ করান, তখন মনে হয়, তাঁহাদের এই সপ্রেম ব্যবহারের ন্যায় আদর্শ স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ জগতে দুর্ল্লভ। এই বাহ্য সম্মান-প্রদর্শনের কোনও মূল্য নাই, তাহা মূর্খ ব্যতীত অপর কেহ বলিবে না, কিন্তু এই বাহিরের সম্মানের পশ্চাতে যদি হৃদয়ের শ্রদ্ধা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে ইহার ন্যায় অলীক ও মূল্যহীন আর কিছুই কল্পনীয় নহে। ভারতবর্ষে নারীর সম্মান বাহিরের জগতে প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধায় তাহার মূল্য আদর্শের দিক হইতে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতের এই আদর্শ যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রচলিত হইয়া সমাজের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই অনুমিত হইতে পারে। নারী মাতৃরূপে মহীয়সী। সহধর্ম্মিণী, কন্যা অথবা ভগিনীরূপেও নারীর গৌরব কম নহে, কিন্তু মাতৃত্বে নারীর অখণ্ড মঙ্গলময়ী মূর্ত্তির প্রকাশ। এই মূর্ত্তিতে ভারত নারীকে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া আসিতেছে। এই দেশে সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী যখন গৃহকর্ত্রীর নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসে, তখন "মা" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করে, এই দেশে ভিখারী "মা ভিক্ষা দাও" বলিয়া হস্তপ্রসারণ করে, এই দেশেই নারী নিজ সখীকে "অমুকের মা" বলিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া থাকে, এ দেশের দাসদাসীরা

প্রভুস্থানীয়া গৃহস্বামিনীকে "মা" বলিয়া তাঁহার নিকট আদেশ গ্রহণ করে, এ দেশে "রামের মা" "শ্যামের মা" বলিয়া নারী সমাজে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত হয়। নারীর এই মাতৃমূর্ত্তিই ভারতের সমাজে চিরপরিচিত। নারীর প্রতি এই যে অন্তরের শ্রদ্ধা প্রতি পদবিক্ষেপে সমাজে নিবেদিত হইতেছে, ইহার তুলনা জগতের আর কোনও দেশে নাই। এই কথাই এক দিন মেঘমন্দ্রস্বরে ভারতের কোন্ প্রান্তরে অসুরনিপীড়িত দেবগণ কর্ত্তৃক উদ্গীত হইয়াছিল, তাহা আজ আমরা জানি না।

> বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
> স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
> ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
> কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

ভারতের এই অনাদিকাল-প্রচলিত-সত্যদৃষ্টি ঠাকুরের ভিতর দিয়া আর একবার প্রকাশিত হইয়াছে। সত্য অনাদি ও অনন্ত, ইহাকে নূতন করিয়া কেহ সৃষ্টি করে না। কিন্তু যখন কোনও মহাপুরুষ নিজ জীবনে সে সত্য অনুভব করিয়া তাহাকে প্রচার করেন, তখন সেই পুরাতন সত্য যেন আবার নবীন হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই অনাদি সত্য এইরূপে মহাপুরুষগণের জীবনে নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। নারীর প্রতি জগতের অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ঠাকুরের জীবনে নূতন করিয়া পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে। নর ও নারীর সমান অধিকার, ইহা শুধু মুখের কথা মাত্র, হৃদয়ে যত দিন নারীকে বিশ্বজননীর অংশরূপে অনুভব না করা যায়, তত দিন নারীর পূজা বাহিরের একটা নিষ্ফল আচারমাত্র, হৃদয়ের প্রকৃত শ্রদ্ধা-নিবেদন হইতে পারে না। ঠাকুর নারীর মধ্যে বিশ্বজননীকে দেখিয়াছিলেন, তাই

সমগ্র নারীজাতিকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করা তাঁহার পক্ষে সহজ ও সম্ভবপর হইয়াছিল। এই কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর বাহিরের কঠিন আবরণের নিম্নে রমণীর প্রতি কি কোমল শ্রদ্ধাধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইত, তাহা কল্পনা করা এই বস্তুসর্ব্বস্ব ও দেহসর্ব্বস্ব পৃথিবীতে আজ সহজ নহে। দক্ষিণেশ্বরে রমণী নামে এক পতিতা নারী বাস করিত। এক দিন ঠাকুর পুজার সময় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরমধ্যে দেবী ভবতারিণীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া ধ্যান করিতে গিয়া দেখেন যে, সেই পতিতা রমণীর মূর্ত্তিতে জগৎজননী তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হইয়াছেন। ঠাকুর এক দিন নিজ সহধর্ম্মিণীকে বলিয়াছিলেন যে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার গর্ভধারিণী জননী ও নিজ সহধর্ম্মিণী, ইহারা সকলেই তাঁহার একই বিশ্বজননীর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ। নিজ সহধর্ম্মিণীকেও যিনি বিশ্বজননীর অংশসম্ভূতা বলিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহার এই অপ্রতিহত সত্যদৃষ্টির দ্বারা তিনি সমগ্র নারীজাতিকে কত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কল্পনা-শক্তির দ্বারা অনুমেয়, ভাষার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নহে। কলিকাতায় অভিনয় দেখিয়া ফিরিবার সময় রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা পতিতা রমণীকে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, সবই জগদম্বার অংশ।" নারীসম্বন্ধে তাঁহার একটি তুলনা হইতেই সমগ্র নারীজাতির প্রতি তাঁহার অখণ্ড শ্রদ্ধার কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। বালিশের খোল নানাবিধ বর্ণের, নানাবিধ ছিটের, বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। সেইরূপ নারীজাতি সামাজিক সম্বন্ধ ও নৈতিক জীবনের দিক্ হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সকলের ভিতর সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান আছেন, ইহাই ঠাকুর ইঙ্গিত করিতেন। এই সর্ব্বতত্ত্ব-ভেদিনী দৃষ্টির নিকট যে সত্য প্রকাশিত হইত, সেই দৃষ্টি অনেক সাধনার ফলে লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং সেই সত্য অনুভূতিপ্রসূত যে

শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিনি নারীজাতিকে নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কাহারও পক্ষে সহজ অথবা সম্ভবপর নহে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজ ঐশীশক্তিপ্রসূতা কল্পনাশক্তির প্রভাবে জীবনের এক শুভমুহূর্ত্তে এই অনুভূতি লাভ করিয়া রামায়ণের তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের ভিতর দিয়া নারীজাতির প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। পতিতা নারী সে দিন সমগ্র নারীজাতির হইয়া সেই এক কথাই নিবেদন করিয়াছিল।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি
নিয়ে গেল সবে মাটীর ঢেলা,
দূর দুর্গম মনো-বনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।

আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

দেবতারে তুমি দেখেছো, তোমার
সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।

মানুষ নারীর নিকট হইতে মাটীর ঢেলা লইয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার দেবতাকে আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু যে দিব্যদৃষ্টি সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের মত পতিতা নারীর ভিতর হইতে দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি যে আরও

সহজে ধর্ম্মপ্রাণা সংসারী নারীর মধ্যেও দেবীর অধিষ্ঠান দেখিতে পাইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গৃহস্থজীবন-যাপিনী সাধ্বী রমণীগণ যখন তাঁহার নিকট আসিতেন, তখন তাঁহাদের ঠাকুর সেই এক কথাই বলিতেন :—

"মেয়েরা আমার মার এক একটি রূপ।"

এক দিন উপবাসিনী ব্রতচারিণী রমণীর শুষ্ক মুখ দেখিয়া বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন :—

"আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না।"

বাঙ্গালা দেশের যে অর্দ্ধাশনক্লিষ্টা কুললক্ষ্মীগণ হাসিমুখে নিজ অন্নগ্রাস অপরের জন্য পরিত্যাগ করিয়া নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরল জীবন বহন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সেই শুষ্কমুখ দেখিয়া যাঁহার কোমল হৃদয় বেদনায় পরিম্লান হইয়া উঠিত, সেই ঠাকুর রমণীর প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহার ন্যায় অসম্ভব আর কিছুই হইতে পারে না। নিজ উপাস্যা বিশ্বজননীর সহিত একই আসনে যে নারীর স্থান তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই নারীকে জগতের কোন্ মানব বা জাতি তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর আসন আজ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে?

কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সকলের নাই, তাঁহার শুদ্ধ পবিত্রতা সাধারণ মানবের আয়ত্তাধীন নহে। মানুষ কত দুর্ব্বল, তাহা তাঁহার অপ্রতিহত দৃষ্টির অগোচর ছিল না। বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম যে বিদ্বান্‌কেও আকর্ষণ করে, অভিভূত করে, অন্ধ করে, তাহা তিনি জানিতেন বলিয়াই লোক-শিক্ষার জন্য সাধারণ মানবকে কামিনীকাঞ্চন হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন—"সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু,—তাকে দেখে লোকে শিখবে।" এই কথার মধ্যেই ঠাকুরের কামিনীসঙ্গ-বর্জনের

উপদেশের বীজ নিহিত রহিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ এক দিন এই কথাই অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন :—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

তাই ঠাকুর দিব্যদৃষ্টি সহায়ে নারীর ভিতর দেবীকে দেখিয়াও সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কামিনীসঙ্গ পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণী ছয় বৎসরকাল দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়া কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে আর কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

সপ্তম অধ্যায়

বাৎসল্যরস-সাধনা ও ভক্ত জটাধারী

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতিকালের মধ্যেই জটাধারী নামে এক পশ্চিম-ভারতীয় ভক্ত পরিব্রাজক তথায় আগমন করেন। এই সন্ন্যাসীর নিকট বালক শ্রীরামচন্দ্রের এক বিগ্রহ ছিল। বিগ্রহটি অষ্টধাতুনির্ম্মিত, নাম রামলালা। এই বিগ্রহই জটাধারীর নিত্য উপাস্য ইষ্টদেবতা,—স্নেহ ও বাৎসল্যপূর্ণ ব্যবহারে ইহার সেবা করাই এই সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। দক্ষিণেশ্বরে আসিতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত জটাধারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং সর্ব্বদাই ভগবৎসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া উভয়ের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। জটাধারীর সংস্পর্শে আসিয়া ঠাকুর যেন ধর্ম্মজীবনের একটা নূতন দিক্ সহসা দেখিতে পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—ঠাকুর অনন্ত-শক্তিশালী বিশ্বস্রষ্টাকে মাতৃরূপে পূজা করিতেছিলেন। জটাধারীর ইষ্টদেবতা রামলালা কিন্তু অনন্ত-শক্তিমান্ হইয়াও বালকরূপে বাৎসল্য-প্রেমের সেবা লইবার জন্য যেন বিগ্রহ-মূর্ত্তিতে জটাধারীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। জটাধারী সেই বিগ্রহকে নিজ পুত্রের মত সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া স্নেহরস-সেচনে সেবা করিতেন। বাৎসল্য-প্রেমের দ্বারা অনন্ত-শক্তিমানের এই আরাধনা ঠাকুরের নিকট এক অভিনব অভিজ্ঞতা আনিয়া দিল। জটাধারী কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াই দেখিলেন যে, বাৎসল্যপ্রেমের সাধনায় ঠাকুর তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর উপযুক্ত সাধক। সাধারণ মানুষের জীবনে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে মানুষ নিকটে

রাখিয়া নিজস্ব প্রেম ও সেবার দ্বারা আপনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে চাহে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর প্রেম ও সেবাদান করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকেও নিজ প্রেমাস্পদের সেবা করিতে দিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রেমাধার ভগবানের সেবার সময় সাধকদের ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃত ভক্ত আপনার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত সাধককে নিকটে পাইলে, তাহার পথ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া নিজ প্রেমাস্পদের সম্পূর্ণ পূজা দেখিয়াই নিজ জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকে। জটাধারীর জীবনেও সাধক-জীবনের এই অপূর্ব্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। জটাধারী 'রামলালা' বিগ্রহটি ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করিয়া, সেই বালক নারায়ণের সেবার সম্পূর্ণ ভার ঠাকুরের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এ যেন 'প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা'—গচ্ছিত ধন দাতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হওয়া। ঠাকুর জটাধারীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন এবং সেই বিগ্রহকে নিজ সান্নিধ্যে রাখিয়া বাৎসল্য-রসের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রামলালার আহার, স্নান, শয়ন প্রভৃতি সমস্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলী নিজহস্তে সম্পাদন করিয়া ঠাকুরের দিন কাটিতে লাগিল। রামলালা স্নানের সময় গঙ্গার শীতল বারিতে বালকসুলভ চপলতা-বশতঃ পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিতে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিব্রত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করেন। আহারের সময় রামলালা অনেক আবদার করে, শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহা স্নেহশীলা জননীর ন্যায় সহ্য করিতে হয়। রাত্রিকালে ঠাকুরের বক্ষের নিকট শিশু-দেবতা শয়ন করিয়া থাকে। একদিন রামলালা খই খাইবার জন্য আবদার আরম্ভ করিল। ঠাকুর তাহার পুনঃ পুনঃ আবদারে বিরক্ত হইয়া কিছু খই রামলালার সম্মুখে ছড়াইয়া দিলেন, তাহার ভিতর যে দুই একটি খই ধান্য-মিশ্রিত ছিল, তাহা বাছিয়া

দিবার ধৈর্য্য অথবা অবসর রহিল না। সেই খই খাইবার সময় একটি ধান্যের তীক্ষ্ণ কণায় রামলালার কোমল জিহ্বা চিরিয়া গেল, সে কাতরবদনে ঠাকুরকে তাহা দেখাইল। তখন অশ্রুধারায় ঠাকুরের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। ঠাকুর লক্ষ্য করিয়া ধান্যগুলি খই হইতে পৃথক্ করিয়া দেন নাই কেন, ইহা মনে করিয়া বারংবার অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। যে কোমল অধরে কৌশল্যাদেবী কত ক্ষীর সর নবনীত স্নেহ-সহকারে প্রদান করিয়াছেন, সেই নবীন বদনে ঠাকুর তীক্ষ্ণ-ধান্যকণামিশ্রিত খই দিয়াছেন, এই কথা চিন্তা করিয়া, ঠাকুর আপনাকে সংবরণ করিতে না পারিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজীবনে বাৎসল্য-রসের এই যে সাধনা, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার বিশ্বাস অথবা ভক্তি আমাদের নাই। সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ মন কিছুই বিশ্বাস করিতে চায় না, নিজের জীবনে ধর্ম্মের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, অপরের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনিলেও সন্দেহ-কলুষিত মন সহজে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না।

ঠাকুরের জীবনে এই অপূর্ব্ব সাধনার কথা চিন্তা করিতে গেলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যময় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি রসের আলোচনা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-কল্পনার দ্বারা চিন্তা করিতে গেলে সাধক এবং সাধনার বস্তুর মধ্যে অনেক দূরত্ব আসিয়া পড়ে। যে অসীম অনন্ত শক্তি এই সীমাহীন বন্ধনহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কল্পনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, সেই ঐশ্বর্য্য ধারণা করিতে করিতেই মানবহৃদয়ের ক্ষুদ্রশক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়, বিশ্বস্রষ্টার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। সুদূর অতীতে যখন বিশ্বের চিত্র অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ ছিল, তখনই মানবের পক্ষে সেই অশেষ ঐশ্বর্য্যের সম্যক্ অনুধাবন করা কঠিন হইত। কিন্তু

বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের দৃষ্টিশক্তির প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডও এখন সমস্ত সীমার বন্ধন অতিক্রম করিয়া তাহার স্রষ্টার মতই অসীম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের জগতে যে সূর্য্য তাপ প্রদান করে, সেই সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর ন্যায় এইরূপ আরও বিশ লক্ষ পৃথিবীকে সমভাবে উত্তাপ প্রদান করিতে সমর্থ। অসংখ্য সৌরমণ্ডল আছে, সেই সৌরমণ্ডলে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা আরও বৃহত্তর লক্ষ লক্ষ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র অবিরত ঘুরিতেছে। ইহা কি সহজে কল্পনীয় অথবা অনুমেয় হইতে পারে? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রতম বিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নহে। জগতের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

"The mind of man is utterly unable to conceive the grandeur and wonder of creation." (বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকৌশল মানুষের পক্ষে ধারণাতীত।)

ঠাকুর একবার এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুনিয়া তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রী—মকে (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাঁহাকে কিছু বুঝাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণমাত্র এই সম্বন্ধে আলোচনার পরই শ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "আর থাক্, মাথা টন্ টন্ কর্‌ছে।" বৈজ্ঞানিক এই সমস্ত অদ্ভুত গবেষণা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে মাথা টন্ টন্ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং সেই অসীম অনন্ত-শক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টার ঐশ্বর্য্য-পরিকল্পনার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবার চেষ্টা করিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয়, নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও বিশ্বপতির অসীমত্ব উভয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান আসিয়া পড়ে, মানুষকে তাঁহার নিকটে না আনিয়া যেন আরও দূরে লইয়া যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভগবানের সমস্ত বিভূতি জানিবার জন্য অর্জ্জুনের মনে একবার কৌতূহল হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীভগবান্ নিজমুখেও আপনার সমস্ত বিভূতি বর্ণনা করিতে অক্ষম বলিয়া, 'নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে' (আমার বিভূতির অন্ত নাই) বলিয়া 'প্রাধান্যতঃ' বলিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন !
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

(হে অর্জ্জুন, ইহার অধিক জানিয়া তোমার কি ফল হইবে? তুমি সার জানিয়া রাখ যে আমি আমার একাংশের দ্বারাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছি।)

স্বয়ং নারায়ণের যে শ্রীমুখ নিজ বিভূতি-বর্ণন করিতে অক্ষম হইয়াছিল, সেই বিভূতি বর্ণনা অথবা ধারণা করিবার প্রয়াস ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য-পরিকল্পনার দ্বারা তাঁহার প্রতি আস্থাবান্ হইবার চেষ্টা খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থের জোব (Job) নামক পুস্তকেও আমরা দেখিতে পাই। জোব নামক জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তি হঠাৎ ভাগ্যবিপর্য্যয় হওয়ায় ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস অবিচলিত রাখিতে পারেন নাই, সন্দেহের গাঢ় ছায়া মনকে ক্রমশঃ অধিকার করিতেছিল, দোদুল্যমান চিত্তবৃত্তি তাঁহার মনে শান্তিপ্রদান করিতেছিল না। এমন সময়ে এক দিন ভগবান্ তাঁহার নিকট ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রনিকর ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টজীবের প্রতি জোবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন—এই অসীম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অনন্তপুরুষের শক্তি অথবা জ্ঞানসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করাই বাতুলতা। আমাদের মনে রাখিতে

হইবে যে, জোবের সময়ের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও আমাদের সময়ের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনেক পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। জোব পুস্তকখানি দ্বিসহস্র বৎসরের উর্দ্ধকাল হইল রচিত হইয়াছিল, সুতরাং বিজ্ঞান বর্ত্তমানকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহা জোবের সময়ে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। তথাপি এই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের কথা কল্পনা করিয়াই জোব বিহ্বল হইলেন এবং বিশ্বপিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া নতশিরে নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও ভগবানের মহিমা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ভীত হইয়া তাঁহার মহিমা স্বীকার করা এক কথা, আর তাঁহাকে আপনার হৃদয়মধ্যে অনুভব করা অন্য কথা। ঐশ্বর্য্যের চিন্তা আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার নিকটে যাইতে কোনও সাহায্যই করে না, বরং অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই ঐশ্বর্য্য-পরিকল্পনা অপেক্ষা তাঁহাকে নিকটে পাইবার সহজ ও সরল পথ বৈষ্ণব ভক্তগণ অনেক দিন হইল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ ভক্তদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-পরিকল্পনার পথকে বন্ধুর ও দুর্গম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লাইট্ (H. F. Lyte) নামক জনৈক ভক্ত ধর্ম্মযাজক বহুবর্ষ যাবৎ নিজ ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া যে দিন বৃদ্ধবয়সে সেই ধর্ম্মমন্দির হইতে বিদায় লইতেছিলেন, সেই দিন নিজ সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতাস্বরূপ একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার যাজকমণ্ডলীকে শুনাইয়া চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। সেই কবিতাটিতে ভক্ত বলিতেছেন :—

Come not in terrors, as the king of kings,
But kind and good, with healing in the wings;
Tears for all woes, a heart for every plea,
Come, Friend of sinners, and thus 'bide
with me!

(হে প্রভু, রাজাধিরাজরূপে আমার নিকট আসিও না, আমি ভীত হইব। শান্ত ও মধুররূপে আমার নিকট আবির্ভূত হও, আমার দুঃখতাপক্লিষ্ট হৃদয়ে তোমার শ্রীহস্ত বুলাও। হে পাপি-তাপীর একমাত্র শরণ, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।)

এখানে "রাজার উপরে রাজা রাজরাজেশ্বর"রূপে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মহাসমারোহে না আসিতে ভক্ত ভগবানকে মিনতি করিতেছেন, সখারূপে (Friend of sinners) ভক্তের হৃদয়ের সব দুঃখতাপ অপহরণ করিবার জন্য সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' ইহাই ভক্তের প্রার্থনা। তাই আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণবগণ কখনও দাসরূপে প্রভুকে, সখারূপে সখাকে, মাতারূপে পুত্রকে এবং প্রকৃতিরূপে পুরুষকে সেবা করিয়া তাঁহারই সেবা করিয়াছেন। এই যে চারিটি সম্বন্ধ, ইহাদের তুলনায় ঐশ্বর্য্য-পরিচিন্তনের সম্বন্ধ অনেক দূর ও অধিকতর কঠিন। এই চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধের যে কোনটির ভিতর দিয়া আমরা বিশ্বপিতার যত নিকটে যাইয়া পড়ি এবং আত্মীয়রূপে নিবিড়ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হই, এমন আর কোনও সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই সম্ভবপর নহে। ভক্তমালগ্রন্থে বিবৃত ভক্তশ্রেষ্ঠা মীরাবাই-এর জীবনের একটি ঘটনায় ভগবান্‌কে সহজ ও নিবিড়ভাবে পাইবার এইরূপ উপায়ই নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মীরাবাই বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরমভক্ত বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী সন্ন্যাসীদিগের নারীদর্শন নিষেধ বলিয়া মীরাবাই-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন মীরাবাই তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার ব্যঞ্জনা যত গভীর, তত সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক অনূদিত বাঙ্গালা "ভক্তমাল" গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে—

গোস্বামী কহেন মুই বনে করি বাস,
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ।
এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে,
পুনঃ কহি পাঠাইল গোস্বামীর স্থানে।
এত দিন শুনি নাই শ্রীধাম বৃন্দাবনে,
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে।

সেই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে প্রকৃতিরূপে মধুর-রসের দ্বারা সেবা করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজা, ইহাই মীরাবাই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী মীরাবাই-এর এই ভক্তিপূর্ণ মধুর-রসের শিক্ষা উপলব্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া সেই ভক্তশ্রেষ্ঠার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, এইরূপে নানাবিধ রসের ভিতর দিয়া বিশ্বস্রষ্টাকে আস্বাদন করাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। কোনও একটা সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর মত সকল শ্রেণীর অথবা ধর্ম্মজীবনের সকল স্তরের লোকের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম সকল মতকে আশ্রয় করিয়া এবং বিভিন্ন পথকে সমন্বয় করিয়া সার্থক হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের চিরপিপাসিত আধ্যাত্মিক জীবনকে তৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছে। ঐ চতুর্ব্বিধ রসের দ্বারা ভগবান্‌কে নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া হৃদয়মধ্যে অনুভব করা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সাংসারিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই অনন্ত বিরাট্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সমস্ত মানব-সম্বন্ধকে রন্ধ্র করিয়া অনুক্ষণ আপনার অপরূপ মহিমাকে সীমার বেষ্টনীর মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, এ কথা হিন্দুধর্ম্মের সার সত্য বলিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ চিরদিন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। হিন্দু-স্ত্রী তাই আপনাকে ভুলিয়া নিজের দেহ, মন ও প্রাণ দিয়া আপনার স্বামীকে দেবতা বলিয়া সেবা করিয়া

আসিতেছে, এবং হিন্দুস্বামী নিজ সহধর্ম্মিণীর মধ্যে অনন্তের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের প্রকাশ স্বীকার করিয়া তাহাকে নিজের প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে লক্ষ্মীর আসন প্রদান করিয়াছে। গোপালরূপী নারায়ণ পুত্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া পিতামাতাকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইয়া তাহাদের জীবন সার্থক করিতেছেন। এই সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের অনাদি অনন্তকাল-প্রচলিত প্রথা ও বিশ্বাস। কোনও সম্বন্ধই দু'দিনের পুতুল-খেলার সম্বন্ধ নহে, কোনও সম্বন্ধই ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। ইহা জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই ভগবান্ মানবজীবনে লীলা করিয়া থাকেন। হিন্দু-স্ত্রী বিপথগামী হওয়ায় সামাজিক সম্বন্ধ লুপ্ত হইলেও ধর্ম্মের চক্ষুতে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ চিরদিনই থাকিয়া যায়, হয় ত জন্ম-জন্মান্তরেও বিচ্ছিন্ন হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজ-সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি সহায়ে এই সত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনেক রচনার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমার বিশ্বাস, আমাদের সব স্নেহ, আমাদের সব ভালবাসাই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি—ভালবাসা-মাত্রেই আমাদের ভিতর দিয়া বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।"

এই অচেতন ভাব এবং সজ্ঞান পূজা লইয়াই সাধারণ মানুষ ও ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। এ কথা কবিবর আরও বিশদভাবে অন্যস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবধর্ম্মে পৃথিবীর প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে

ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত, লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"

তাই তাঁহার কবিতার মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই—

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে স্মরিব জীবননাথ।

* * * *

পিতামাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,

সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি তুমি আছ মোর সাথ
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে স্মরিব জীবননাথ॥

সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাঙ্গালীজাতির মধ্যেই এই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবচতুষ্টয়ের সম্যক্ পরিস্ফুরণ ও অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধের সমস্ত পরিকল্পনা বাঙ্গালীর জীবনের সহজ ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে, অবান্তর অথচ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট আর একটি বিষয়ের অবতারণা আমাদের এইখানে করিতে হইবে। যখন ইংরাজগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া ধীরে ধীরে এ দেশে তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তখন সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আপনাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এ দেশে প্রচার করিবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের উপর ইংরাজের আধিপত্য ও শিক্ষাপ্রচার সমভাবে বিস্তৃত হইলেও বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি যত সহজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এমন আর কোনও প্রদেশেই হয় নাই। বাঙ্গালীজাতির পক্ষে এই ইংরাজী শিক্ষা এত সহজে গ্রহণ করিবার একটি নিগূঢ় কারণ ছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকেরা অনেকে মনে করেন যে, বাঙ্গালীজাতি অনুকরণ-প্রিয় বলিয়াই তাহারা নূতন ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এই অনুকরণ-প্রিয়তার কথা এক দিন জাপানীজাতির সম্বন্ধেও বলা হইত, এবং তাহারা য়ুরোপীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করার জন্যই য়ুরোপীয় জাতিগণের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে, ইহাই সচরাচর নির্দ্দেশ করা হইত। কিন্তু কোনও জাতি অন্তরে বস্তু না থাকিলে কেবলমাত্র অনুকরণপ্রিয়তার দ্বারা জগতে বড় হইতে পারিয়াছে, ইহা এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। জাপান যেমন তাহার শক্তি ও প্রতিভার অনুরূপ জিনিসগুলিই য়ুরোপ হইতে গ্রহণ করিয়া নিজের ভিতরকার বস্তুকেই জাগ্রত ও সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি যে সব বিষয়ে য়ুরোপের সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই, সেখানে সে য়ুরোপকে বর্জ্জন করিয়াছে, সেইরূপ বাঙ্গালী জাতিও শুধু অনুকরণপ্রিয়তার জন্যই ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে নাই, যাহা তাহার যুগযুগান্তর-প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষার সহিত সমীভূত, তাহাই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজ ভারতবর্ষ জয় করিয়া যে সংস্কৃতি তাহাদের সহিত আনয়ন করিল, তাহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রসূত তিনটি ভাবের আলোকমণ্ডিত সভ্যতাবিশেষ মাত্র। এই তিনটি ভাব—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—Equality, Fraternity, Freedom। য়ুরোপে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ইহাদের ব্যঞ্জনা

বিভিন্ন হইলেও বঙ্গদেশে ইহারা চির-পুরাতন, কেবলমাত্র নূতন নামে ও নূতন পরিচ্ছদে ইহারা আমাদের নিকট দেখা দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের সময় হইতেই যে ভাবস্রোত বঙ্গদেশের তটভূমিকে অবিরত আঘাত করিয়াছে, তাহার মূলমন্ত্রই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। অবশ্য যে ভাবগুলি কেবলমাত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, ইংরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, কলেজসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া সেই ভাবগুলি সাধারণ মনুষ্যের জীবনে প্রবেশলাভ করিয়া তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক সামাজিক জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিল। সুতরাং বাঙ্গালাদেশ এই শিক্ষার জন্য য়ুরোপের নিকট যায় নাই, তাহার পুরাতন জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া, সে নিজের জিনিসকেই ভাল করিয়া ফিরিয়া পাইয়াছিল। এই জন্যই বাঙ্গালাদেশে ইংরাজীশিক্ষা যত সহজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, এমন আর কোনও প্রদেশেই হয় নাই।

আমরা দেখিতে পাই, শ্রীপরমহংসদেব নানাবিধ সাধনার দ্বারা বিশ্বস্রষ্টাকে আরাধনা করিয়াছিলেন। যে বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ইহার মাটীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের মাটীর সহিত রস-চতুষ্টয়ের সাধনা নিবিড়ভাবে চিরদিনই সংশ্লিষ্ট। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যুগ হইতেই ভাবপ্রবণতা যে জাতির দোষ ও গুণ উভয়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আপনার ভাবপ্রবণতার দ্বারাই তিনি সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরাকার ব্রহ্মেরও উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। এইরূপে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'কে বহুরূপে দর্শন ও আস্বাদন করিয়া তিনি ধর্ম্মের বিভিন্ন বিভিন্ন পথকে সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার নিকট তন্ত্রবিদ্যাপারদর্শিনী ভৈরবী, বাৎসল্য-রসাস্বাদী জটাধারী এবং নিরাকারবাদী তোতাপুরী

সকলেই সমভাবে আদৃত ও গুরুপদে বৃত হইয়াছিলেন। একই সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর উপায়ে ভগবানের আরাধনা তিনি কখনই অনুমোদন করিতেন না। ঠাকুর বলিতেন, 'কেন একঘেয়ে হব?' এই সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনি সানাই বাঁশীর উপমা দিতেন। এক জন সানাই বাজাইয়া একই সুর ধরিয়া আছে, আবার কেহ তাহারই মধ্য হইতে নানাবিধ সুর ও তান উত্থিত করিয়া তাহাদিগকে শ্রুতিমধুর করিয়া তুলিয়াছে। একটি সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর পন্থা অবলম্বন ও ভগবান্‌কে নানাভাবে উপাসনা করার মধ্যে ইহাই প্রভেদ। জগতে বিশ্বনিয়ন্তার কোনও কার্য্যই যদি নিরর্থক না হয়, তাহা হইলে ঠাকুরের শিক্ষা ও ধর্ম্মমতের বিষয় চিন্তা করিলে, তাঁহার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ যে অর্থহীন এবং একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

সন্ন্যাসী জটাধারী চলিয়া যাইবার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তোতাপুরী নামে এক নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

নিরাকার ব্রহ্ম-সাধনা ও সন্ন্যাসী তোতাপুরী

জটাধারী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তোতাপুরী নামে এক ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী মধ্যভারত হইতে তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। সুদূর মধ্য-ভারত হইতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কি আকর্ষণে তিনি বঙ্গদেশের অখ্যাত ও অজ্ঞাত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে রহস্যের এখনও মীমাংসা হয় নাই। হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলস্থিত যে অজ্ঞাত শক্তি মানবকে স্থান ও কালবিশেষে অচিন্তিত কার্য্যসমূহে হঠাৎ নিয়োজিত করিয়া থাকে, তাহার কারণ কোনও দর্শন অথবা বিজ্ঞান আজও নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। কোথায় সুদূর মধ্যভারত, কোথায় শস্যশ্যামল বঙ্গদেশের এক প্রান্তে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরের নব নির্ম্মিত ঠাকুরবাড়ী! কিন্তু এই নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী এক অচিন্তনীয় শক্তির আকর্ষণে দেশপরিভ্রমণচ্ছলে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ কিরণজাল সায়াহ্নের পশ্চিম-গগনকে রঞ্জিত করিতেছিল, গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গসমূহ গলিত স্বর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, সমস্ত দেবীমন্দিরে যেন কৈলাসের দিব্যভাব-মাধুর্য্য লীলায়িত হইতেছিল। দিবস ও রাত্রির সন্ধিস্থলে এই যে রহস্যময় সময়, ইহাকে ঠাকুর চিরদিন বিশ্বপিতাকে স্মরণ করিবার এক শুভমুহূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। শ্রীপরমহংসদেব শিবমন্দিরের নিকট তন্মনস্কচিত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দীর্ঘাকার, তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, উলঙ্গ সন্ন্যাসী সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। মহাপুরুষগণের জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী অনেক সময়ে কল্পনার চিত্রাবলী হইতেও বিস্ময়কর।

শ্রীপরমহংসদেবের অন্তর্দৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী শারীরিক সৌন্দর্য্যের আবরণ ভেদ করিয়া মানব-চরিত্রের নিগূঢ় চিরন্তন বিশিষ্টতা দেখিতে পাইত বলিয়া, ঠাকুর সচরাচর শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সাধক-জীবনে যে সমস্ত মহাপুরুষ তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেহ এবং চরিত্র—উভয়বিধ সৌন্দর্য্যেরই আধার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। দীর্ঘাকার তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী "আঁধারের পারে যিনি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ" তাঁহাকে জানিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় বপুই যেন ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহার জ্যোতিতে চন্দ্র-সূর্য্য দীপ্তি প্রদান করে, সেই জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিতে পারিলে মানবের শারীরিক যে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে না দেখিলে কল্পনার দ্বারা অনুমান করা যায় না। মহাকবির ভাষায় সে সৌন্দর্য্যের ঈষৎ আভাস আমরা পাই।

> "প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
> নবীন গৌরকান্তি,
> সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান
> করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান
> শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান
> ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি!"

সন্ন্যাসী তোতাপুরী ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং মধুর বচনে সম্ভাবিত করিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, তিনি ঠাকুরকে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণে সমর্থ উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে

করিতেছেন ; সুতরাং ঠাকুর আগ্রহ প্রকাশ করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে পারেন। যে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী ব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মবিদ্রূপে সমস্ত কর্ম্মপারাবারের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবার আগ্রহ বিচিত্র ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।

দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানব নিজ পুত্রের দেহের মধ্যে আপনার দোষ-গুণ-বিজড়িত দেহ সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে ; ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের শুদ্ধ ও পবিত্র আত্মার উৎকর্ষ উপযুক্ত আধারে রক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া থাকেন। সাধারণ মানব সন্তানে তাহার দোষ ও গুণ উভয়ই রক্ষা করিয়া থাকে, সন্ন্যাসী নিজ আত্মার উৎকর্ষকেই অমর করিতে চাহেন, দেহ হইতে দেহ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। অযোধ্যাধিপতি রঘুর পুত্র অজ তাঁহার পিতার গুণাবলীর অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বর্ণনা করিবার সময় মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

"রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥"

(পিতার ন্যায় রূপ, দেহ, বীর্য্য ও প্রাকৃতিক গঠন এই বালক প্রাপ্ত হইল। প্রদীপ হইতে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে যেরূপ উভয়ের কোনও পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ পিতা ও পুত্রের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইত না।)

৫

এরূপ সর্ব্বগুণের উত্তরাধিকারী, পিতার প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ পুত্র সংসারে অতীব বিরল। কিন্তু সন্ন্যাসীর মানসপুত্র গুরুর উৎকর্ষই নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া থাকেন, তাঁহার দেহ-বিজড়িত দোষ শিষ্যকে কখনও স্পর্শ করে না। গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে ইহাই প্রভেদ। সুতরাং যে সত্যের জ্যোতিঃ মহাপুরুষগণ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সত্য অপরের জীবনে সঞ্জীবিত রাখিবার প্রয়াস আমরা তাঁহাদের জীবনে দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নামমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, নীরবে নামজপ করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, উচ্চকণ্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পতিতগণের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। যে নামের শক্তিতে আত্মহারা হইয়া তিনি পার্থিব সম্পদ্, পাণ্ডিত্য, যশোগৌরব সমস্তই তৃণখণ্ডের ন্যায় পরিহার করিয়াছিলেন, সেই নাম যদি কখনও কোনও ব্যক্তির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ে 'ভক্তিলতাবীজ' সঞ্জীবিত করিতে পারে, এই আশায় নামসঙ্কীর্ত্তন মহাধর্ম্মের এই প্রচারক উচ্চকণ্ঠে বিশ্বপিতার গুণকীর্ত্তনের বিধান করিয়া গিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য নিজ শিষ্যগণকে দেশ-দেশান্তরে প্রেরণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন—

"What I tell you in darkness, that speak ye in light and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops."

(আমি যে কথা তোমাদিগকে নির্জ্জনে বলিতেছি, তাহা তোমরা সর্ব্বজনসমক্ষে প্রচার করিবে ; আমি তোমাদের কর্ণমূলে যে বাণী প্রদান করিতেছি, তাহা তোমরা উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বত্র ঘোষিত করিবে।)

তাই আমরা দেখিতে পাই, নিজ আত্মোৎকর্ষ জগতে সঞ্জীবিত রাখিবার ইচ্ছায় সংসারমুক্ত সাধকও উপযুক্ত শিষ্যকে নিজ বিদ্যা প্রদান করিবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন।

কিন্তু জগতে উপযুক্ত শিষ্য সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণ প্রচলিত একটি কথাই এই সত্যটিকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছে।—"গুরু মিলে লাখ তো চেলা মিলে এক।" এই ভাষার অত্যুক্তির মধ্যেই সত্য নিহিত রহিয়াছে। যে ভক্ত সৎস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার সেই ব্যাকুলতাই যে তাঁহার নিকট প্রকৃত গুরুকে আকৃষ্ট করিয়া আনিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আত্মার আকর্ষণী শক্তি জড় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। ক্ষত্রবিদ্যাশিক্ষার্থী একলব্যই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন গুরু দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন, তখন কৃতসঙ্কল্প এই যুবক মৃত্তিকার দ্রোণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারই নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে নিরত হইল। আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে এই শিক্ষার্থী মৃন্ময় দ্রোণের নিকট হইতেই যে বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল সে বিদ্যা জাত্যভিমানী কুরুপাণ্ডবদিগকেও লজ্জা দিয়াছিল, আজিও মহাভারত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উপযুক্ত আধার হইলে শিষ্য মৃত্তিকানির্ম্মিত গুরু হইতেও শিক্ষা আকর্ষণ করিয়া নিজে গ্রহণ করিতে পারে। গ্রীসদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত প্লেটো পার্থিব বিদ্যাসম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। আদর্শ শিক্ষক শিষ্যের মধ্যে কোনও নূতন জিনিস প্রদান করেন না, শিষ্যের অন্তর্নিহিত উৎকর্ষকে পরিস্ফুরিত করিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অশেষ-শক্তিমান্ গুরু যদি সহস্র সহস্র অমূল্য রত্ন শিষ্যকে প্রদান করেন, তথাপি উপযুক্ত আধার না হইলে শিষ্য তাহার কণামাত্রও নিজ জীবনে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তি গ্রহণ করিয়া সঞ্জীবিত রাখিবার উপযুক্ত শিষ্য সন্ধান করিয়াও অনেক সময়ে গুরুকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইয়াছে।

কোনও সদ্‌বস্তু জীবনে গ্রহণ করিবার আরও এক অন্তরায় আছে। মানবের ধর্ম্মজীবনে সন্দিগ্ধচিত্ততার ন্যায় দুর্ব্বলতা আর কিছুই পরিকল্পনীয় নহে। সরলবিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্মজীবনে কিছুই লাভ করা যায় না। সেই জন্য ধর্ম্মগুরুকে বিশ্বপিতার আসনে স্থান দিবার প্রথা এ দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু কোমল পুষ্পের মধ্যে কীটের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ততা মানব-জীবনে ভক্তিলতাবীজের অঙ্কুরকে সর্ব্বদাই ছেদন করিতেছে। যে মহাপুরুষ পার্থিব সমস্ত ঘটনাতেই বিশ্বপিতার অনন্তপ্রেমের আভাস দেখিতে পাইতেন, সেই শ্রীপরমহংসদেব এই আত্মঘাতী সন্দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি দয়া না কল্লে সন্দেহ যায় না।" গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"

(শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।)

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

"অজ্ঞাশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥"

(যে অজ্ঞানী, যাহার শ্রদ্ধা নাই, যাহার মন নিত্য সন্দিগ্ধ, তাহার বিনাশ হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত পুরুষের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই ধ্বংস হয়। সে কদাচ সুখ প্রাপ্ত হয় না।)

সন্দেহ-বিমুক্তমনা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভাগ্যবানকেই শ্রীভগবান্ জ্ঞানের উত্তম অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সন্দেহ-কলুষিত মন কলঙ্কদুষ্ট দর্পণের ন্যায় সহজে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই সত্য বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করা যায়। যে শিক্ষার্থী

নিজ শিক্ষকের উপর আস্থা-স্থাপন করিতে পারে না, সেই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই, সন্দেহ-কলুষিত মন লইয়া অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান। স্বয়ং নারায়ণ যাঁহার সারথি, তিনিও স্ব-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া মোহান্ধ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিতে উদ্যত। কিন্তু অর্জ্জুন এই মোহ-কলুষতার মধ্যেও আত্মবিস্মৃত হন নাই। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের নির্দ্দেশে স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া আপনার সন্দেহজাল ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"

(আমি তোমার শিষ্য; তোমার শরণ লইতেছি। আমায় পথ দেখাইয়া দাও।)

আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ বচন দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ বীরবরকে ক্ষাত্রধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যপালনে প্রণোদিত করিতে পারিলেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন অর্জ্জুনের মনে উত্থিত হইতে লাগিল, এবং স্বয়ং নারায়ণ সেই সন্দেহজাল ছিন্ন করিতে করিতেই আমরা একাদশ সর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই অর্জ্জুন আপনাকে শিষ্য বলিয়া শ্রীভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সন্দেহজাল ছিন্ন করিতে গুরুরূপী শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছেন। নিজ অনন্ত বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিলেন, তখন ধীরে ধীরে অর্জ্জুন আপনার বিনষ্ট সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন এবং গুরূপদিষ্ট নিজ পথ দেখিতে পাইয়া অবশেষে বলিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

(হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি স্মৃতিলাভ করিয়া সংশয়শূন্য হইয়াছি। আমি তোমার আদেশ পালন করিব।)

এইরূপ বিশ্বাস হইলে তবেই সন্দেহমুক্ত মন গুরূপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানিতেন যে, গুরূপদিষ্ট শিক্ষা জীবনে সফল করিবার শক্তি শিষ্যস্থানীয় সাধারণ ভক্তদিগের মধ্যে বিরল। উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং অবিচলিত বিশ্বাস—এই উভয়ের সংমিশ্রণ মানবজীবনে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, গুরু বলিয়া কেহ সম্বোধন করিলে শ্রীপরমহংসদেব প্রসন্ন হইতেন না, তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিতেন—"আমার চেলা-টেলা নেই।" যশ ও অর্থপিপাসা-প্রপীড়িত মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সাময়িক উচ্ছ্বাস কত ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চন, তাহা কোনও মহাপুরুষেরই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

তথাপি, প্রকৃত শিষ্য বিরল হইলেও দুর্ল্লভ নহে। নিজ আত্মার উৎকর্ষ জগতে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য গুরুও উপযুক্ত শিষ্যকে সন্ধান করিয়া বাহির করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, দয়াল ঠাকুর তাঁহার 'সকল ভক্তকে ব্রহ্মজ্ঞানের—কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের মন্ত্রে সমভাবে দীক্ষিত করিয়া যান নাই। শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তকে বিভিন্নরূপে আপনার প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। একই সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর শিক্ষা সকল আধারের পক্ষে উপযুক্ত হইবে না বলিয়াই একই কঠিন ছাঁচে সকল শিষ্যকেই গড়িয়া তুলিবার নিষ্ফল প্রয়াসে তিনি ব্যর্থ-মনোরথ হন নাই। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষার অধিকারিরূপে গণ্য করিয়া তাঁহাকে মুক্তি ও শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই শিষ্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কুচবিহার-বিবাহ লইয়া যখন ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও মনীষীর সহিত কেশবচন্দ্রের মতদ্বৈধ হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইয়াছিল, তখন কেশবচন্দ্রের শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর হইতে কেহ কেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পূর্ব্বক কেশবচন্দ্রের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার মনে অযথা বেদনা-প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্ত কেশবচন্দ্র এই সম্বন্ধে এক দিন ঠাকুরের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি না দেখে শিষ্য কর কেন? আমি লোক চিন্‌তে পারি।" শ্রীপরমহংসদেব যে মানবচরিত্রের নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তবৃত্তিসমূহ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিত্রের ন্যায় দেখিতে পাইতেন, তাহা তাঁহার শিষ্যনির্ব্বাচন দেখিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যে সমস্ত শিষ্য তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে ঠাকুরকে কখনও কোনও অনুযোগ করিতে হয় নাই। মানবের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে, তাহার অধিক কিছু তাহার নিকট আশা করিতে গেলে আমাদিগকে স্বভাবতঃই তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। যে লোকের এক মণ ভার উত্তোলন করিবার শক্তি আছে, তাহার নিকট দুই মণ ভার উত্তোলনের আশা করিতে গেলে আমাদিগের নিরাশ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা সহজেই আমাদের মনে উদিত হয়। যে সমস্ত ভক্ত শ্রীপরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন, মহেন্দ্রনাথ সেই ভাগ্যবান্ শিষ্যদিগের মধ্যে অন্যতম। ঠাকুর নিজ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাধারণ কোনও লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু ঠাকুরের নিকট

মহেন্দ্রনাথ এতই আত্মীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন যে, নিজ জামা, বস্ত্র অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় বস্তু ঠাকুর অসঙ্কোচে মহেন্দ্রনাথকে আনিয়া দিতে বলিতেন এবং দ্বিধাশূন্যচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেন। হৃদয়নাথ অথবা অন্য কাহাকেও কখনও অর্থসাহায্য করিতে হইলে ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে মহেন্দ্রনাথকেই স্মরণ করিতেন। যে শিষ্য এতই প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তাঁহারও নিকট হইতে শ্রীপরমহংসদেব কখনও তাঁহার শক্তির অতিরিক্ত কোনও কার্য্য প্রত্যাশা করেন নাই। কামিনীকাঞ্চনত্যাগ যে মহাপুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, সেই ত্যাগীর অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহেন্দ্রনাথকে সংসার ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কার্য্যের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিতে কখনও আহ্বান করেন নাই। কেহ কেহ হয় ত মনে করিবেন যে, ঠাকুরের সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই মহেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, পিতার দায়িত্বও তখন তাঁহার জীবনের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, সুতরাং সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার পক্ষে ইহাই মহেন্দ্রনাথের জীবনে প্রধান অন্তরায় ছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বিবাহিত জীবন হইলেও ঠাকুর কোনও কোনও শিষ্যকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাইয়া তাঁহার আপনার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং কোন্ ভক্তের নিকট হইতে কতদূর ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ আশা করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইত না বলিয়া, বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের জন্য বিভিন্নরূপ সেবা ও কর্ম্ম তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই শিষ্যগণের সম্বন্ধে শক্তির অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করিয়া ঠাকুরকে কখনও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনেও এই অধিকারি-নির্ব্বাচন শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। মহাপ্রভু ভোগবিলাস-রত গৃহীকে সর্ব্বদাই

করুণার দৃষ্টিতে দেখিতেন; কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের মহান্ আদর্শ নিজ জীবনে পালন করিয়া প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। কিন্তু শিষ্যদিগের মধ্যে শক্তির পার্থক্য বিবেচনা করিয়া তিনিও অধিকারিভেদে বিভিন্ন ভক্তের জন্য বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুরে আগমন করেন, সেই সময় রঘুনাথ দাস নামে জনৈক ভক্ত প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া, সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তিনি রঘুনাথ দাসকে গ্রহণ করিলেন না, মধুর বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহে লোকব্যবহার
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

ভক্ত স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করার জন্য ছোট হরিদাসকে এই মহাপ্রভুই বর্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার তিনিই রঘুনাথ দাসকে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। ভক্তের বিভিন্ন শক্তি পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই একই মহাপুরুষ অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

গুরু তোতাপুরী ও শিষ্য পরমহংসদেবের সম্মেলন মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় হইয়াছিল। মায়াবাদী সন্ন্যাসী দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জীবনের সায়াহ্নে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত শিষ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীপরমহংসদেবের অন্তর্নিহিত ভক্তি ও সাধনা ব্রহ্মবিদ

সন্ন্যাসীকে দক্ষিণেশ্বরে আকর্ষণ করিয়া আনিল। যখন তোতাপুরী পরমহংসদেবকে দীক্ষা প্রদান করিতে চাহিলেন, তখন বিশ্বজননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য ঠাকুর সন্ন্যাসীর নিকট সময় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীপরমহংসদেব ইতিপূর্ব্বেই দেবীর নিকট নিজ জীবনের শুভাশুভ সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং জীবনের কোনও কার্য্যেই তাঁহার স্বাধীনতা ছিল না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, শুভ এবং অশুভ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম সমস্তই দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তিনি জীবনের কর্ত্তৃত্বভার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীভবতারিণীর অনুমতি ভিন্ন ধর্ম্মেরও কোনও বিশেষ পথ অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী 'পাষাণময়ী' দেবীর নিকট অনুমতি গ্রহণের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং পরমহংসদেবকে তাহার জন্য সময় প্রদান করিলেন। ঠাকুর দেবীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীপরমহংসদেবের জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই কোনও বিশেষ কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে, অথবা যখনই কোনও সন্দেহজাল তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই তিনি বিশ্বজননীর নির্দ্দেশের জন্য তাঁহার শরণাগত হইয়াছেন। মানবী জননীকে যেমন শিশুসন্তানের সমস্ত কৌতূহলের নিবৃত্তি করিতে হয়—শ্রীশ্রীভবতারিণীকেও এই শিশুমনোবৃত্তিসম্পন্ন পরমহংসের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে হইত। বিশ্বজননীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা করিবার প্রচেষ্টা জগতের ইতিহাসে বিচিত্র নহে। ধর্ম্মজগতে অথবা কর্ম্মজীবনে আমরা অনেক মনীষীকেই এইরূপ দৈবী নির্দ্দেশের অনুসরণ করিতে দেখিতে পাই। বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াও যখন সন্দেহের অন্ধকার মন হইতে বিদূরিত হয় না, তখন

এই 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'কেই সাধকগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে কার্ডিনাল নিউম্যানের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ এক দিন চতুর্দ্দিক্ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া ভগবানের আলোকের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

Lead, kindly light, amid the encircling gloom,
Lead thou me on;
The night is dark, and I am far from home,
Lead thou me on.

(হে জ্যোতিঃস্বরূপ, সন্দেহের অন্ধকার চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাকে বেষ্টন করিতেছে, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। রাত্রি ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আমি তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছি। আজ তুমিই আমাকে পথ-প্রদর্শন কর।)

বঙ্গগৌরব রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন পথে এক দিন সেই বিশ্বজননীর নিকট পথ-নির্দ্দেশের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোন্ পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি॥"

শ্রীশ্রীভবতারিণী ঠাকুরকে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এক দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পঞ্চবটীতলে দীক্ষা গ্রহণের সমস্ত আয়োজন হইল। বৃক্ষতলে তখন একটি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৃক্ষলতাপরিবেষ্টিত সেই নিভৃত কুটীরমধ্যে গুরু তোতাপুরীর সহিত উপবিষ্ট হইলেন। গুরূপদিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,—

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ্, লোকমান্য সুন্দর শরীর লাভের বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

অনাদি অনন্তকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত এই যে ত্যাগের মহামন্ত্র, ইহা অর্থহীন বাক্যসমষ্টির মত শুধু মুখে উচ্চারিত হইল না, সমস্ত প্রাণ, মন ও শক্তির সঞ্চারে সঞ্জীবিত হইয়া সেই মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনে চিরদিনের জন্য সত্যস্বরূপ হইয়া দেখা দিল। আহুতি শেষ হইলে যখন নিরাকার ব্রহ্মে চিত্তকে বিলীন করিবার জন্য গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় চিৎস্বরূপকে ঠাকুর যতবার ধ্যান করিতে চেষ্টা করিলেন, ততবারই কেবল শ্রীশ্রীভবতারিণীর আনন্দময়ী চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি ঠাকুরের মানসপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বিশ্ব-জননীর সহিত ঠাকুরের কি বিচিত্র সম্বন্ধ! সর্ব্বদাই সেই মূর্ত্তি চিদাকাশে ভাসমান, সুতরাং জননীগতপ্রাণ সাধকের মনে জননীর স্নেহমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই সহজে উদিত হইল না। গুরু তোতাপুরী ব্রহ্মসাধনার এই অপূর্ব্ব অন্তরায়ের কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে কুটীর-মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এক খণ্ড কাচ দেখিতে পাইলেন। সেই কাচখণ্ড ঠাকুরের ভ্রূ-যুগলমধ্যে তীক্ষ্ণরূপে বিদ্ধ করিয়া গুরু শিষ্যকে সেই বিন্দুতে মনঃসংযোগ করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মসাধনায় ঠাকুর সমস্ত বাধাকেই অসীম শক্তিসহকারে অতিক্রম করিতেন। সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া, ঠাকুর যখন মনকে পুনর্ব্বার ব্রহ্মচিন্তনে নিয়োজিত করিলেন, তখন সেই আনন্দঘন ভবতারিণী-মূর্ত্তি চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইল। ঠাকুর দেখিলেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তখন মন সমাধিনিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া গেল।

এই যে সমাধি অবস্থা, ইহার ভাষা নাই, ইহার বর্ণনা হয় না; সমাধিনিমগ্ন লোকও এই পরমানন্দ অনুভূতির কথা কাহাকেও বুঝাইয়া

দিতে পারেন না। সেই ব্রহ্মস্বরূপের পরিকল্পনা কি বস্তু, চিত্তের কি অবস্থা হয়, তাহার কোনও তুলনা নাই, সুতরাং তাহা অব্যক্ত ও সাধারণ মানবের অগোচর। মহাকবি কালিদাস দেবাদিদেব মহেশ্বরের এই সমাধি অবস্থা বর্ণনা করিবার প্রয়াসে ইহার ঈষৎ আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন—

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্,
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥"

(মহাদেব শরীরমধ্যস্থ বায়ুসকলকে নিরুদ্ধ করিয়া আসীন ছিলেন বলিয়া বর্ষণাড়ম্বরশূন্য জলধর, বীচিবিহীন সরোবর ও বায়ুবিরহিত স্থলে নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।)

ঠাকুর এই সমাধিনিমগ্ন অবস্থায় তিন দিন অবস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী তোতাপুরী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিলেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহাকে যে সফলতা লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহাই এই যুবক শিষ্য কি ঐশী শক্তিপ্রভাবে এক দিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিল!

ব্রহ্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া, কাষায় কৌপীন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেহ ও মন উভয়ই উপাধিশূন্য না হইলে চিত্ত কখনও ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে না। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে পুরাতন সমস্ত পরিহার করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পিতৃপ্রদত্ত নামও মানুষের একটি উপাধি, সেই জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবজীবনের প্রারম্ভে পুরাতন নামরূপ উপাধিকেও পরিহার করিবার প্রথা সাধনজগতে প্রচলিত আছে। এই নূতন দীক্ষিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই গুরু তোতাপুরী তাঁহাকে "শ্রীরামকৃষ্ণ-

পরমহংস" নামে অভিহিত করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও যখন কাটোয়ার সন্নিধানে শিখাসূত্র পরিহার পূর্ব্বক শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও চিরপ্রথা অনুযায়ী পুরাতন নাম পরিত্যাগ করাইয়া গুরু তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নূতন নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

"পাইয়া উচিৎ নাম কেশব ভারতী
প্রভুবক্ষে হস্ত দিয়া বোলে শুদ্ধমতি।
যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিয়া।
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥"

গুরু তোতাপুরী-প্রদত্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" নাম আজ জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইয়া সংসারবিরাগী কত সন্ন্যাসীকে জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছে, সংসারনিমগ্ন কত বিষয়ীকে পাপতাপের দহনের মধ্যেও শান্তি প্রদান করিতেছে; এই নামই অনাথ বালক-বালিকাগণের আশ্রয়মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, এই নামের শক্তিই দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী-প্রপীড়িত ভারতবাসীর সেবা করিতেছে, নিরন্ন দেশে বুভুক্ষুমুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে। আবার এই নামের পুণ্যপ্রভাবেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতার মোহে আত্মবিস্মৃত, বিক্ষুব্ধ, পথিভ্রষ্ট ভারতবাসী যুগে যুগে স্বধর্ম্মগৌরবে সচেতন হইবে।

সন্ন্যাসী তোতাপুরী তিন দিবসের অধিক কোথাও থাকিতেন না, কিন্তু শ্রীপরমহংসদেবকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্যের আকর্ষণী শক্তিতে অবরুদ্ধ হইয়া, প্রায় একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে যাপন করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের জননী

নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরী আসিবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জননী গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য কামারপুকুর হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। ঠাকুরের জননীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা অনেক পরিমাণে সহজ হইবে। নারী-চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট করা সাধ্যাতীত। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রাণী রাসমণির ভক্তি-প্রবাহই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ঠাকুরের ধর্ম্মজীবনে যে প্রথম দীক্ষাগুরু ব্রহ্মচারিণী যোগেশ্বরী, ইহাও একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীপরমহংস-দেবের জননীর জীবনের দুই একটি ঘটনা অনুধাবন করিলে এই রত্নগর্ভা ভাগ্যবতী রমণীর প্রভাব ঠাকুরের চরিত্রের উপর কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমেয় হইবে। রাণী রাসমণির ন্যায় এই জননীও বঙ্গদেশের একজন “অশিক্ষিতা” রমণী। কিন্তু যে শ্রীপরমহংসদেব পাণ্ডিত্যাভিমানী মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে ভক্তিবিহীন বলিয়া তৃণখণ্ড অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সেই ঠাকুর নিজ “নিরক্ষরা” জননীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা চিরজীবন করিয়া গিয়াছেন। জননীর প্রতি আকর্ষণ ঠাকুরের জীবনে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

জননীদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া নহবৎখানার একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। সময়ে অসময়ে তুচ্ছ কোনও প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া অকস্মাৎ ঠাকুর নহবৎখানায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, জননীর ক্রোড়ের নিকট বসিয়া পুনরায় শিশু হইয়া যাইতেন, তখন ভক্তসম্রাট্ নিজ আধ্যাত্মিক সকল গৌরব বিস্মৃত হইয়া—মানবশিশু হইয়া জননীর স্নেহধারা আনন্দমুগ্ধমনে পান করিতেন। অশেষ প্রকারে ঠাকুর নিজহস্তে জননীর সেবা করিতেন, জননীর পদধূলি লইতে তাঁহার কোন দিন ভুল হইত না। জননীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহার নানাবিধ আচরণ ও কথাবার্ত্তা হইতে উপলব্ধি করা যায়। ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত নিরঞ্জন একবার কিছুদিন পরে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তখন নিরঞ্জন কলিকাতার কোনও আপিসে কর্ম্ম করিতেন। স্বাধীন চিন্তা ও চিত্তবৃত্তির মূর্ত্তিমান আবির্ভাবস্বরূপ শ্রীপরমহংসদেব দাসত্বজীবনকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সে দিন নিরঞ্জনকে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখে দাসত্বের এক কলঙ্কময় আবরণ পরিদৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু নিরঞ্জন নিজ জননীর ভরণ-পোষণের জন্য কর্ম্মচারীর পরাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, নতুবা দাসত্বজীবনের জন্য নিরঞ্জনকে শত ধিক্কার প্রদান করিতেন।—"তুই বুড়ো মার জন্যে চাক্‌রী কর্চ্ছিস্ তাই, নইলে তোর মুখ দেখ্‌তাম না!" জননীর সেবার জন্য তিনি দাসত্বশৃঙ্খলও উপেক্ষা করিতে পারিতেন। জননী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিদর্শন আর কিছুই হইতে পারে না। হাজরা মহাশয় নামে পরিচিত ঠাকুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী জনৈক সংসারবিরাগী সাধক দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রকলত্রাদি অর্থের অনটনে গ্রামে সময় সময় কষ্ট পাইত। ঠাকুর সে সম্বন্ধে বিশেষ দুঃখিত হইলেও সাধারণতঃ

কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু যে দিন হাজরা মহাশয়ের জননী অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিজ গভীর মনোবেদনা ঠাকুরকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সে দিন শ্রীপরমহংসদেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, হাজরা মহাশয়কে তাঁহার বৃথা সাধনার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জননীর সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না করিয়া সাধনার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে তাঁহাদের জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বলিয়া গিয়াছেন, কেবলমাত্র এক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম তিনি অনুমোদন করিয়াছিলেন। বিশ্বজননীর দর্শনলাভের জন্য মানবী জননীর আদেশলঙ্ঘন শ্রীপরমহংসদেব অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর যখন দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখন বৈষ্ণবধর্ম্ম-ভাবসমূহ তাঁহার মনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; কিন্তু জননীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এই সংসার-বন্ধন-বিরাগী সন্ন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জননীর প্রতি এই আকর্ষণ বাক্যের দ্বারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের অনেক উর্দ্ধের বস্তু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনেও জননীর প্রতি অসীম ভক্তি আমরা দেখিতে পাই। বাল্যকালে মহাপ্রভু বড়ই দুরন্ত ছিলেন, একবার কুপিত হইলে সহজে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইত না। ক্রোধবশে বালক নিমাই বস্ত্রসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত এবং তৈল, ঘৃত, লবণসমূহের ভাণ্ডগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিত। সম্মুখে যাহা উপস্থিত হইত, তাহারই উপর নিমাই-এর যষ্টিদণ্ড ঘন ঘন সঞ্চালিত হইত, জননী শচীদেবী শঙ্কিতা হইয়া একপার্শ্বে লুক্কায়িত হইতেন ; কিন্তু এরূপ ক্রোধোন্মত্ততার সময়েও জননীর সম্বন্ধে বালক নিমাই কখনও আত্মবিস্মৃত হইত না। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর

বালক মহাপ্রভুর এই ক্রোধাবস্থার এক সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কথন॥"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর 'চাঁচর চিকুর কেশ' মুণ্ডিত করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শচীদেবী মুণ্ডিত শিরে হস্ত প্রদান করিয়া দুঃখে বিহ্বল হইয়াছিলেন। জননীর এই স্নেহবিহ্বলতা সংসার-বন্ধন-বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসীর চক্ষুতেও জল আনিয়াছিল। এই চিত্র বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"প্রভু ত কান্দিয়া কহে শুন মোর আই
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাঁহা কহ আমি তাহাই রহিব
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিব।
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার।"

ইহার বহুবর্ষ পরে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখনও তিনি প্রিয়শিষ্য পণ্ডিত জগদানন্দকে প্রতি বৎসর নবদ্বীপে পাঠাইয়া জননীর পাদপদ্ম বন্দনা করিতেন।

"নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিয় নমস্কার
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার।"

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরও জননীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীপরমহংসদেবের মাতৃভক্তি ও সন্ন্যাস গ্রহণের পরও মাতৃসেবার মধ্যে অপরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আইন্‌ষ্টিনের (Einstein) জীবন-চরিত আলোচনা করিবার সময় কোনও লেখক বলিয়াছেন—

The parents and grand parents of a famous man sometimes give a clue to the origin of his genius, (পিতা-মাতা এবং পিতামহ-পিতামহীদিগের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা অনেক সময় বিখ্যাত মনীষিগণের প্রতিভার মূলসূত্র দেখিতে পাই।) বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে এই উক্তিটি যত সত্য, মানবের ধর্ম্মজীবনে ইহার সত্যতা আরও সহজে উপলব্ধি করা যায়। মহাপুরুষগণের জীবন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে তিনি কখনও দ্রাক্ষাফল উৎপন্ন করেন নাই। মহৎ আধারেই মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, বিরাট আধারেই বিরাট শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বঙ্গদেশের উজ্জ্বল জোতিষ্ক, আতুর ও দরিদ্রের বন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সকলেরই নিকট সুপরিচিত। এই কোমলহৃদয় পুরুষসিংহের বিধবা-বিবাহ সংস্কারের চেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মূলে বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতীদেবীর কোমল অন্তঃকরণের ভিত্তি ছিল, তাহা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। নিজ গ্রামের এক বালবিধবার দুঃখ দেখিয়া এই

বর্ষীয়সী বিধবার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর-জননী নিজে নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা ছিলেন এবং বাঙ্গালাদেশে হিন্দুবিধবা ধর্ম্মের জন্য কি কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন এবং অম্লানবদনে অপরকে সেই ত্যাগের আদর্শ পালন করিতে প্রণোদিত করিতে পারেন, তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণা বিধবার কোমল প্রাণ ব্যবহারিক শাস্ত্রের সমস্ত বন্ধন ও আদেশ অতিক্রম করিয়া রোদন করিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই রোদনের ধারাই এক দিন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের ভিতর দিয়া অপ্রতিহতগতিতে নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালাদেশের সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন সামাজিক প্রথাগুলিকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। জননীর এই কোমল অন্তঃকরণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের পরদুঃখকাতর হৃদয়ের জন্ম হইয়াছিল।

বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন ও বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত গ্রীকবীর আলেকজান্দারের জীবনেও তাঁহার মাতার প্রভাব অতি বিশদভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। পৃথিবী জয় করিবার উদ্দেশে আলেকজান্দার যখন সৈন্য পরিচালিত করিয়া দেশ হইতে দেশ পরিভ্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন বিজয়যাত্রার প্রারম্ভেই তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য আণ্টিপেটার নামে জনৈক কর্ম্মকুশলী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মাতা অত্যন্ত স্বাধীনচরিত্রা এবং অপরিসীম মানসিক-শক্তি-সম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি আণ্টিপেটারের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আণ্টিপেটার বিরক্ত হইয়া আলেকজান্দারের নিকট পত্র দ্বারা অভিযোগ করিয়াছিলেন। মহাবীর আলেকজান্দার তাঁহার পত্র পাইয়া বলিয়াছিলেন, "আণ্টিপেটার জানে না যে, আমার জননীর এক বিন্দু অশ্রু তাহার শত সহস্র পত্রকে ভাসাইয়া দিতে পারে।" আলেকজান্দার নিজ জননীর দোষ বুঝেন

নাই, তাহা নহে, কিন্তু জননীর অশ্রুজলের দৃশ্য সহ্য করা দুরের কথা, তাহা কল্পনা করিবার শক্তিও এই গ্রীক বিশ্ববিজয়ীর হৃদয়ে ছিল না। যে গর্ব্বান্ধ পশুশক্তি আলেকজান্দারকে পুষ্পলতা-পরিশোভিত ভারতের শস্যশ্যামলা প্রদেশগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত করে নাই, যে কঠোর হৃদয় মুমূর্ষু ও প্রপীড়িত বিজিত জাতির আর্ত্তনাদে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, সেই হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত স্থানে নারী-হৃদয়-প্রসূত এক বিন্দু কোমলতা সঞ্চিত ছিল, যাহার জন্য জননীর ম্লানমুখ আলেকজান্দার কল্পনা করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন। এই বিজয়-মহোৎ-সবের তাণ্ডব-নৃত্যের সম্মুখে পড়িয়া পারস্যাধিপতি দেরায়ুস রাজ্যচ্যুত হইয়া পলায়ন করিলে, তাঁহার অপূর্ব্বসুন্দরী কন্যাদ্বয়কে সৈন্যগণ আলেক-জান্দারের সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য যুবতী দুইটির শারীরিক সৌন্দর্য্যের অশেষবিধ প্রশংসা করিয়াছিল। এই প্রলোভন-বাক্যের উত্তরে আলেকজান্দার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজ জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মহাবীর বলিয়াছিলেন —"যদি নারীদ্বয়ের সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয় হয়, তাহা হইলে আমি দেখাইব যে, আমার আত্মসংযম তাহাদের শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা কোনও অংশে কম প্রশংসনীয় নহে।" এই কথা বলিয়া গ্রীক সম্রাট্ কন্যাদ্বয়কে সসম্মানে তাহাদের পিতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আলেক-জান্দারের মাতার নারীচরিত্রের কোমল-প্রভাব পুত্রের এই আদর্শ ব্যবহারের মধ্যে কি প্রকাশিত হয় নাই? তিনি কি সেই পিতৃক্রোড়-ভ্রষ্টা অসহায়া নারীদ্বয়ের বিষণ্নমুখে নিজ জননীর মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইতে দেখেন নাই? ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করা আজ বৃথা; কিন্তু আলেকজান্দারের বিশ্ববিজয় হয় ত একদিন ইতিহাসের মৃতপত্রখণ্ডের মধ্যে বিস্মৃতির অন্ধকারগর্ভে নিহিত হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বসম্রাটের অলিপিবদ্ধ অখণ্ড ইতিহাস-প্রবাহে আলেকজান্দারের ইন্দ্রিয়জয়ী বাণীর

প্রভাব চিরদিনের জন্য সঞ্জীবিত থাকিবে সন্দেহ নাই। তাই পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাপুরুষগণের জীবনে জননীর প্রভাব অপ্রতিহত ও অনির্ব্বচনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও তাঁহার জননীর প্রভাব সেইরূপ অপ্রতিহত ও অনির্ব্বচনীয়রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠাকুরের জীবনে তাঁহার কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শ ভারতে ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। ত্যাগই ভারতের ধর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্র, এবং এই মূলমন্ত্রই বিভিন্ন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিভিন্ন যুগাবতারের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীপরমহংসদেবের এই অপূর্ব্ব কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শের বীজ তাঁহার জননীর চরিত্রের ভিতর নিহিত ছিল। শ্রীপরমহংসদেবের জননীর জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সহজে উপলব্ধি করা যাইবে।

তখন ঠাকুরের জননী দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানার একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিতেছিলেন। মথুরানাথ এক দিন নহবৎখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এই মথুরানাথ সাধারণতঃ কৃপণস্বভাব ছিলেন এবং মন্দির-সংক্রান্ত ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত হিসাব ও সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু সুকৃপণ লোকেরও কোনও এক স্থানে দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়, যেখানে ব্যবহারের সময় তাহার প্রকৃতিগত কার্পণ্য-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া তিনি দাতা-রূপে স্বভাবের প্রতিকূল অজস্র ব্যয় করিয়া নিজ মানবধর্ম্ম চরিতার্থ করিয়া থাকেন। কৃপণ পিতামহকে অনেক সময়ে প্রিয় পৌত্রের বিবাহে অযথা অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়। মথুরানাথেরও এইরূপ মানসিক দুর্ব্বলতা ছিল। জমীদারীর চতুর্দ্দিক হইতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে কঠোর-শাসনে মথুরা-নাথ অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, কিন্তু শ্রীপরমহংসদেবের সেবায় তাঁহার প্রীতির জন্য অকুণ্ঠিতহস্তে তাহা ব্যয় করিতে না পারিলে তাঁহার মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। সঞ্চয় আমাদের জীবনে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া

দাঁড়ায়—যদি কোনও স্থানে গিয়া তাহা রাখিয়া নিজে রিক্ত না হইতে পারি।

কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহার সঞ্চয় মানুষকেই ঢালিয়া দিয়া মুক্ত হয়, ভক্ত তাহার সঞ্চয় ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া ধন্য হয়, ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। মথুরানাথও শ্রীপরমহংসদেবের সেবায় তাঁহার সমস্ত ধনসম্পদ্ নিয়োজিত করিয়া কৃতার্থ হইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সর্ব্বস্বত্যাগী ঠাকুর মথুরানাথকে সে মুক্তি ও আনন্দ হইতে সততই বঞ্চিত করিতেন। তাই বহু দিনের নিষ্ফলপ্রয়াসে ক্ষুব্ধ হইয়া মথুরানাথ এক দিন ঠাকুরের জননীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অনেক মিষ্ট আলাপনের পর মথুরানাথ ধীরে ধীরে নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। "ঠাকুমা" বহুদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াও মথুরানাথের হস্ত হইতে কোনও সেবা গ্রহণ করেন নাই, আজ মথুরানাথ "ঠাকুমা"র সমস্ত পার্থিব অভাব পূরণ করিয়া নিজ জীবন চরিতার্থ করিবেন। "ঠাকুমা" কিন্তু তাঁহার কোনও অভাবই খুঁজিয়া পাইলেন না। এ যেন যুগযুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত মৈত্রেয়ীর অমর বাণী—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্।

(যাহার দ্বারা আমি অমর হইব না, সে দান গ্রহণ করিয়া আমার কি লাভ হইবে ?)

মথুরানাথ আজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন, পুরুষসিংহ পুত্রের নিকট যে বাসনা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, কোমলহৃদয়া, সরলান্তঃকরণা জননীর নিকট সে বাসনা পূর্ণ হইবে, এ আশা মথুরানাথের হৃদয়ে তখন বলবতী। বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া মথুরানাথের "ঠাকুমা" বিব্রত হইয়া নিজ মুখে দিবার জন্য চারি পয়সার "গুল্" প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুরের জননীর এই একমুষ্টি ভস্মরাশির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিভবশালী

জমীদারের চক্ষুতে জল আসিল। এই তুচ্ছ প্রার্থনার মধ্যে কি গভীর ত্যাগ ও লোভহীনতার আদর্শ নিহিত ছিল, এই জননী নিজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই ত্যাগের মধ্যে বিচারশক্তিজনিত দম্ভ ও অহঙ্কার ছিল না, অথবা তাঁহার যুগাবতার পুত্রের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের দৃঢ়সঙ্কল্প-প্রসূত আত্মপ্রকাশও ইহার মধ্যে ছিল না। কিন্তু সর্ষপপ্রমাণ বীজের ভিতর যেমন বিশালকায় বনস্পতি লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ জননীর এই সহজ ও সরলভাবে প্রকাশিত ত্যাগ ও লোভ-হীনতার মধ্যেই শ্রীপরমহংসদেবের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের মহৎ আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। জননীর চরিত্রের বিশিষ্টতা পুত্রের চরিত্রে অজ্ঞাতভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে, আমরা অনেক সময়ে তাহা লক্ষ্য করি না বলিয়া মূলকে বিস্মৃত হইয়া বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের এক জন কৃতী সন্তানের কথা আমাদের মনে পড়ে। এই রত্নপ্রসূ বঙ্গদেশের আর এক জন "অশিক্ষিতা" জননীর চরিত্রের জ্যোতিঃ তাঁহার পুত্রের জীবনে কি অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ব্রাহ্ম ভক্ত ও কর্ম্মবীর আনন্দমোহন বসুর নাম শিক্ষিত-সমাজে আজ সুপরিচিত। আনন্দমোহনের জননী বঙ্গদেশের সাধারণ "অশিক্ষিতা" রমণীদের মধ্যে এক জন মাত্র। এই নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা অশেষ যত্নসহকারে নিজ পুত্র-গণকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিয়া কোনও এক স্থানে গমন করিতেছিলেন। পথে এক মুসলমান পীরের সমাধির নিকট নিজ পাল্কী থামাইয়া আনন্দমোহনের জননী তথায় অবতরণ করেন এবং সেই পীরের নিকট অবনতমস্তকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিজ গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করেন। নিষ্ঠাবতী হিন্দু-বিধবাকে মুসলমান পীরের সমাধির নিকট এই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দেখিয়া

উপস্থিত কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে আনন্দমোহনের জননী বলিয়াছিলেন,—

"ভক্তদের আবার জাত কি, তাঁরা সবাই এক জাত!"

শ্রীপরমহংসদেবের উক্তির সহিত এই উদার উক্তির কি বিস্ময়জনক সামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব। কিন্তু যে ধর্ম্ম ভারতবর্ষে মেঘমন্দ্রস্বরে নূতন করিয়া ঘোষিত করিয়াছিল—

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাইক জাত-বিচার।

সেই ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আনন্দমোহনের জীবনের মূলসূত্র তাঁহার মহীয়সী জননীর ভক্তদিগের জাতিবিচার সম্বন্ধে অপূর্ব্ব বিশ্বাসের মধ্যেই আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।

যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন"—কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা ও বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইয়াছিলেন, সেই যুগপ্রবর্ত্তক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন উপলব্ধি করিতে হইলে তদীয় জননীদেবীকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

দশম অধ্যায়

ধর্ম্মগুরুপদে শ্রীরামকৃষ্ণ

ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীপরমহংস-দেব ছয়মাসকাল ব্রহ্মবিদ্যাসাধন করেন। এই সময়ে তিনি নিজ শয়নগৃহ হইতে সমস্ত দেবদেবীর চিত্র অপসারিত করিয়া, গুরুর উপদেশমত তদ্‌গতচিত্তে পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমাহিত হন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ঠাকুরের সাধকজীবনে মনুষ্যগোচরীভূত শেষ উল্লেখযোগ্য সাধনা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কোনও সময়ে শ্রীপরমহংসদেব তাঁহার ইষ্টদেবীর নিকট লোকশিক্ষার জন্য আদেশ পাইয়া, ধর্ম্মগুরুপদে সমাসীন হইয়া, জগতে নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য প্রস্তুত হন। বিশ্বের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মপ্রচারের এই যে আদেশপ্রাপ্তি, ইহা শ্রীপরমহংসদেবের জীবনে একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

কোনও মহাপুরুষ ধর্ম্মগুরুর আসন গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য, বিশ্বপিতার আদেশ এবং তাঁহার নিজের সাধনা, উভয়ই প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান অবলম্বন করিয়া জগতে ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল। প্রাচী এই অমূল্য সত্য চিরদিন স্মরণ রাখিয়া ধর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে। আদেশ এবং সাধনা এই উভয়ের সংমিশ্রণে প্রাচীর মহাপুরুষগণের জীবন মহীয়ান্ হইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে আদর্শের সম্যক্ বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্ব-প্রেমের পুরোহিত যীশুখৃষ্ট দরিদ্র সূত্রধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ-

বিদেশে ত্যাগের মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এক দিন এই মহাপুরুষ গভীর মনোবেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"Foxes have their holes, and birds of the air have their nests; but the Son of man hath not where to lay his head."

(পশুপক্ষীরও আশ্রয় লইবার স্থান আছে, কিন্তু জগতে আমার কোথাও আশ্রয়ের স্থান নাই)

যে দরিদ্র সন্ন্যাসী এইরূপে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীনহীনবেশে জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্যাগীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও য়ুরোপীয় জাতিগণ হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। যীশুখৃষ্টের মহান্ ত্যাগের ধর্ম্ম য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সফল প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, য়ুরোপে খৃষ্টানধর্ম্ম শুধু বাক্যের দ্বারাই গৃহীত এবং প্রচারিত হইয়াছে, প্রাণের সাধনার দ্বারা হয় নাই বলিয়া বিশ্বপ্রেমের মহামন্ত্র য়ুরোপে আজ—

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

প্রাচী নিজের জীবনে ধর্ম্মগ্রহণ না করিয়া শুধু বাক্যের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে কখনও ব্রতী হয় নাই।

কিন্তু এই মহান্ আদর্শ প্রাচীও আজ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই যে, সকলেই ধর্ম্মশিক্ষকের পদে সমাসীন হইতে চায়। যে কার্য্যের দায়িত্ব জগতের সকল কার্য্য অপেক্ষা গরিষ্ঠ, সেই ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য আজ একটা তুচ্ছ আচারের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদেশ নাই, সাধনা নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই, অথচ ধর্ম্মসংস্কারই তাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিতেছেন।

ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য এত সহজ হইলে জগতে সাধনার প্রয়োজন হইত না; মহাপুরুষগণের অমূল্য উক্তিগুলি গানের কলের দ্বারা ধর্ম্মের বেদী হইতে তারস্বরে প্রচারিত হইতে পারিত। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার যে দিন হইতে আদেশ এবং সাধনার বস্তু না হইয়া কেবলমাত্র বাক্যসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের অবনতির সূত্রপাত।

একবার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, শ্রীপরমহংসদেব পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এক নূতন আগ্রহের সৃষ্টি করিতেছিলেন। বিশ্বপিতার আদেশ পাইয়া ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কি না, ইহা জানিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, শ্রীপরমহংসদেব তর্ক-চূড়ামণিমহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ কোনও আদেশপ্রাপ্তির বিষয়ে উত্তর দিতে সমর্থ না হওয়ায়, ঠাকুর তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের চিরন্তন উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীশশধরের সহিত সাক্ষাতের সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"যখন প্রথমে তোমার কথা শুন্‌লুম, জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে। যে পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, সে পণ্ডিতই নয়।......আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।" ঠাকুর এই প্রসঙ্গে নিজ জীবনে জগন্মাতার আদেশপ্রাপ্তির কথা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেবীর নিকট হইতে লোকশিক্ষার আদেশ আসিলে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে হয় না, বক্তৃতা দিবার স্থান-কাল নির্দ্দেশ করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিতে হয় না, চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট লৌহখণ্ডের ন্যায়, ভক্তগণ আপনারাই সেই

মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণী শুনিবার জন্য সাগ্রহে সমবেত হইয়া থাকেন। নিরক্ষর ব্যক্তিও আদেশ প্রাপ্ত হইলে জগতে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে, তা ব'লে মনে ক'র না যে, তার জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই প'ড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ফুরোয় না।......ওদেশে ধান মাপবার সময় এক জন মাপে আর এক জন রাশ ঠেলে দেয়, তেম্‌নি যে আদেশ পায়, সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। সে জ্ঞান আর ফুরোয় না।" সকল মহাপুরুষেরই এক কথা। যীশুখৃষ্ট জ্ঞানের "রাশ" সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—

"Take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the spirit of your father which speaketh in you."

(কি কথা বলিবে অথবা কিরূপে তাহা বলিবে, সে সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করিও না। প্রচারের সময় যাহা বলিবার প্রয়োজন হইবে, সেই বাণী তোমাদের কণ্ঠে প্রদত্ত হইবে। ইহা জানিও যে, তোমাদের শক্তিতে প্রচার হইতেছে না, বিশ্বপিতার বাণীই তোমাদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে।)

আদেশপ্রাপ্তি ব্যতীত কোনও ধর্ম্মপ্রচারই জগতে কল্যাণকর হইতে পারে না, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীপরমহংসদেব প্রায়ই একটি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করিতেন। তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে উদাসীন আমাদের পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ কোনও

কোনও গ্রামবাসী লোক রাত্রিকালে এই পুষ্করিণীর তটভূমিতে মল-মূত্রত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীর জল দূষিত করিয়া তুলিতেছিল। কত লোকে এই সম্বন্ধে বাগ্-বিতণ্ডা করিয়া অপরাধীদিগের উদ্দেশে গালি-গালাজ প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু ফলতঃ এই স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তনই পরিলক্ষিত হইল না। এক দিন হঠাৎ কোম্পানীর জনৈক "চাপরাসী" পুষ্করিণীর তটদেশে এক আদেশ টাঙ্গাইয়া দিল এবং তাহার পর হইতে আর কোনও লোক ঐরূপে জল দূষিত করিতে সাহস করিল না। ঠাকুর এই সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, 'চাপরাস' ব্যতীত লোকশিক্ষার প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

ভগবানের আদেশ মানুষের কি আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করে, তাহা খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাসে সল-এর (Saul) জীবনে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সলের জীবন ঋষি বাল্মীকির জীবনের ন্যায় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পরে খৃষ্টধর্ম্মবিদ্বেষী সল্ একবার জেরুজালাম হইতে দামাস্কাস নগরের দিকে গমন করিতেছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভক্তদিগের প্রতি অত্যাচার করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। দামাস্কাসের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হঠাৎ দিব্যজ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং সল্ (Saul) ভূমিতে নিপতিত হইয়া দৈববাণী শ্রবণ করিলেন—"Saul, Saul, why persecutest thou me?" (সল, কেন তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছ ?)। বিস্মিত হইয়া সল্ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?" তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, "আমি যীশুখৃষ্ট—যাহাকে তুমি নির্য্যাতিত করিতেছ।" ইহার পর অন্ধ হইয়া সল্ তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং দামাস্কাসে গিয়া দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যে খৃষ্টধর্ম্মবিদ্বেষী লোক অসংখ্য ভক্ত নরনারীকে নির্য্যাতিত করিয়া অপার

আনন্দ অনুভব করিতেন, সেই লোকই আদেশপ্রাপ্তির পর আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশবিদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া সেণ্ট পল্ নামে, খৃষ্টধর্ম্মের দ্বিতীয় মহান্ প্রবর্ত্তকরূপে,—The Second Founder of Christianity—জগতে অমর হইলেন। দেবতার আদেশই তাঁহার জীবনে এই আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছিল।

ভগবানের আদেশপ্রাপ্তির আর একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত জগতে ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন মধ্যযুগে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, সাধনা ভুলিয়া মানব বাহিরের নিষ্ফল আচারকেই ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়ে ১১৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালীর এসিসি (Assisi) নগরে জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে ফ্রান্সেস্কো (Francesco) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সাধারণ ধনী দুলালের ন্যায় সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া প্রায় চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি হঠাৎ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে বহুদিন অবস্থান করিয়া অবশেষে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। একটি ভগ্ন মন্দিরে গিয়া তিনি কাতর-হৃদয়ে ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এক দিন তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

"God met him and a voice said, Go and build my church again."

(তিনি ভগবানের দর্শন পাইলেন এবং এই বাণী শ্রবণ করিলেন,—যাও আমার মন্দির নূতন করিয়া গঠিত কর।)

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভক্তগণ সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করেন না, নিরাকার ব্রহ্মই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। কিন্তু এই খৃষ্টান ভক্তপ্রবর ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

ভক্তের সহিত ভগবানের বিচিত্র সম্বন্ধ, তাহা লোকমত, শাস্ত্রমত অথবা ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহে। আদেশপ্রাপ্ত হইয়া, বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিতপালিত, ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান যখন ধূলিমুষ্টির ন্যায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যীশুখৃষ্টের আদর্শে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া, নগ্নপদে জীর্ণবস্ত্রে জগতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন এসিসির বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সেই মূর্খ উন্মত্তের চিত্তবিকার দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই!

"Great men smiled at the craze of the monomaniac........That a man of business should be blind to the preciousness of money was a sufficient proof, then, as now, that he must be mad."

(ধনী ব্যক্তিগণ উন্মত্তের মত্ততা দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। ধনী ব্যবসায়ী অর্থের দিকে না চাহিয়া, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিতে পারে, ইহা যেমন বর্ত্তমান যুগে উন্মত্ততার নিদর্শন, মধ্যযুগেও ইহা সেইরূপ উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।)

কিন্তু এই সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া, ইন্দ্রিয়সুখ ও বিলাসিতায় আকণ্ঠনিমগ্ন মধ্যযুগের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব বহু শতাব্দী পরেও ক্ষুণ্ণ না হইয়া, তাঁহার সাধনা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিতেছে। আদেশপ্রাপ্তি ব্যতীত এরূপ শক্তি এবং ত্যাগ জগতে দুর্ল্লভ।

এই আদেশপ্রাপ্তিই ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে একমাত্র সহায়ক নহে, ধর্ম্মগুরুর নিজের সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। একনিষ্ঠ সাধনা না থাকিলে আদেশপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে; সাধনা না করিলে "আদেশ" জীবনে নিষ্ফল হইয়া যায়। আদেশ সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত; আদেশ সাধনার দ্বারাই জীবনে সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ইংরাজীতে একটি

প্রচলিত কথা আছে—"We teach more by our lives than by our words" (আমরা আমাদের জীবনের দ্বারা যাহা শিক্ষা দিই, তাহা বাক্যের দ্বারা শিক্ষাপ্রদান অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী)। শ্রীপরমহংসদেবের জীবনে এই সত্য আমরা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। ঠাকুর যে উপদেশ নিজ জীবনে পালন করেন নাই, সে শিক্ষা তিনি অপরকে কখনও প্রদান করেন নাই। মহাভারতে যখন বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিবার মানসে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কঃ পন্থাঃ" (ধর্ম্মের পথ কি ?), সেই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মজগতে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুগম বলিয়া যুগযুগান্তর হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

(বেদ-সমূহ বিভিন্ন, স্মৃতিও বিভিন্ন মত প্রকাশ করে, এমন ঋষি নাই—যিনি নূতন মত প্রবর্ত্তিত করেন নাই। ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গভীর, সুতরাং মহাপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্মের পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে।)

এই সহজ উত্তরের মধ্যে ধর্ম্মজীবনের পথ যেরূপ সরলভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্ম্মগুরুগণের কঠিন দায়িত্বও ইহার দ্বারা সমভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপুরুষগণ যে পন্থা কেবলমাত্র মুখের বাক্যের দ্বারাই নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, তাহা পথ নহে; যে পন্থা দূর হইতে তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাও পন্থা নহে; যে পথে তাঁহারা 'গতাঃ', যে পথ তাঁহারা নিজে অনুসরণ করিয়াছেন,

সেই পথই সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অবলম্বনীয়। মহাভারত পথ-নির্দ্দেশের জটিল প্রশ্নের যে মীমাংসা করিয়াছেন, সেই পথ সাধকগণের পদচিহ্ন-রঞ্জিত। সুতরাং নিজ জীবনে ধর্ম্মোপদেশ পালন না করিয়া শুধু বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার নিস্ফল প্রয়াসমাত্র। মহাভারত ভক্তগণকে সে পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই।

মহাপুরুষগণ নিজ ধর্ম্মোপদেশ জীবনে পালন না করিয়া কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা তাহা প্রচার করিলে সেই ধর্ম্মপ্রচার নিস্ফল হইয়া থাকে, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপরমহংসদেব একটি সুন্দর গল্পের অবতারণা করিতেন। জনৈক কবিরাজের নিকট কোনও পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থার জন্য আগমন করিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে ঔষধ প্রদান করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা লইবার জন্য পরদিবস আসিতে অনুরোধ করেন। যথাসময়ে সেই পীড়িত ব্যক্তি পুনরায় উপস্থিত হইলে কবিরাজ মহাশয় তাহাকে গুড় খাইতে নিষেধ করিলেন। পীড়িত ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর কবিরাজের কোনও বন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বদিবসে এই সহজ ব্যবস্থা দিলেই হইত; ইহার জন্য পীড়িত ব্যক্তিকে পুনরায় আসিতে বলিয়া তাহার অসুবিধা করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বদিবসে তাঁহার ঘরে একটি বৃহৎ পাত্রে গুড় রক্ষিত ছিল, সুতরাং সে দিন তিনি রোগীকে গুড় খাইতে নিষেধ করিলে, রোগী কবিরাজের নিজগৃহে গুড় দেখিয়া তাঁহার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। সুতরাং গুড়ের পাত্রটি সরাইয়া তবে কবিরাজ মহাশয় তাহাকে গুড় খাইতে নিষেধের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপরমহংসদেব ইহার দ্বারা ইঙ্গিত করিতেন যে, নিজে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে না পারিলে অপরকে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও নিস্ফল।

এই বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক দিন শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রী-ম), নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) ও অন্যান্য ভক্তগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন। কঠোর সাধনা ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচারের প্রচেষ্টা নিষ্ফল, ইহাই বুঝাইবার জন্য ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মের মধ্যেই নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতেন না। ইহা উল্লেখ করিয়া শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।" "বেত খাবার ভয়ে" কথাটি সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্র প্রশ্ন করিলে, ভক্ত মহেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ-টাপ করেছে, যখন প্রমাণ হ'লো, তখন ঈশ্বর হয় ত বল্‌বেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মার্। তার পর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয় ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি। তার জন্যে বেতের হুকুম হ'ল। তখন আমি হয়ত বল্‌লাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কায করেছি। তখন ঈশ্বর দূতদের আবার হয়ত বল্‌বেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাঁকে বল্‌বেন, তুই একে উপদেশ দিয়েছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিস্ না; আবার পরকে উপদেশ দিয়েছিলি? ওরে কে আছিস্,—একে আর পঁচিশ বেত দে। তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সাম্‌লাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেক্‌চার দেবো।"

ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ নিজ জীবনে উপলব্ধি না করিয়া কেবলমাত্র বাক্যচ্ছটার দ্বারা যাঁহারা জগতে ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, সেই অন্তঃসারশূন্য মিথ্যাভিমানী ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জগতে মহাপুরুষগণের জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা নিজ-জীবনে তাঁহাদের সাধারণ উপদেশগুলিও নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া তবে সেই সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—

"প্রভু আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়।"

ধর্ম্মজীবনের ত কথাই নাই, সাধারণ উপদেশগুলিও নিজজীবনে পালন করিয়া মহাপ্রভু কিরূপে অপরকে শিক্ষাদান করিতেন, তাহা তাঁহার জীবনের দুই একটি ঘটনা হইতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। একবার মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দিরের আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য আপনি সম্মার্জ্জনীহস্তে ভক্তগণের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন।

চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে।

ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব যখন সম্মার্জ্জনী-হস্তে মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে আবর্জ্জনা দূর করিতেছিলেন, তখন তাঁহার 'ধূলিধূসর-তনু' হইল 'দেখিতে শোভন।' সেই তপ্তকাঞ্চনপ্রতিম দেহ যখন ধূলিধূসরিত হইয়াছিল, তখন সেই বরবপু কি শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা আজ কল্পনার দ্বারা অনুমেয়, ভক্ত কৃষ্ণদাসের লেখনীও তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে পারে নাই। যখন মন্দির 'মার্জ্জন' করিয়া ভক্তগণ বাহিরে আসিলেন, তখন দেখা গেল যে,—

"সবা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল।"

একবার ভক্ত জগদানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। সংসারত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণকে আহার-বিহারে সর্ব্ববিধ বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে সর্ব্বদাই উপদেশ প্রদান করিতেন, সুগন্ধি তৈলের কথা শুনিয়া প্রভু তাহা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলেন।

প্রভু কহে, "সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরমধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥"

ভক্ত জগদানন্দ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি তাঁহার "জগন্নাথের" জন্য তৈল আনিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর "জগন্নাথের" পূজায় তাহা ব্যবহৃত হইলে ভক্তের তৃপ্তি হইবে না, বারংবার জ্ঞাপন করিলেন।

শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ-বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে॥

ভক্ত জগদানন্দ অভিমানে ব্যথিত হইয়া গৃহ হইতে 'তৈলকলস' আনিয়া আঙ্গিনাতে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অভিমান ও দুঃখে সেবার দ্রব্য নষ্ট করিয়া, নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক জগদানন্দ শয্যাগ্রহণ করিলেন। প্রভু আসিয়া স্নেহার্দ্র-বচনে তাঁহার দুঃখ প্রশমিত করিলেন, কিন্তু তথাপি লোকশিক্ষার জন্য নিজ কঠোর আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

ভক্ত তুলসীদাস সাধনবর্জ্জিত মিথ্যা ধর্ম্মপ্রচারের নিষ্ফলতা সম্বন্ধে অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

তীব্র বিদ্রূপ করিয়া মিথ্যাভিমানী ধর্ম্মপ্রচারকগণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

পানি না মিলে আপকো, আওরণ বক্সত ক্ষীর,
আপন মন নিশ্চয় নহী, আউর বাঁধাওত ধীর।

(আপনার একবিন্দু জলও সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ অপরকে ক্ষীরভোজন করাইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। নিজ মন চঞ্চল, অথচ অপরকে সংযমী হইতে উপদেশ দেয়।)

ধর্ম্মের অনুভূতি ব্যতীত লোকশিক্ষাপ্রদানের প্রচেষ্টা ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের মতে বারিবিন্দুবিহীন দরিদ্রের অপরকে ক্ষীরভোজন করাইবার আকাঙ্ক্ষার ন্যায় অলীক ও উপহাসের যোগ্য।

সাধনার দ্বারা সত্যানুভূতি না হইলে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তাহা শ্রীপরমহংসদেব জানিতেন বলিয়া, তাঁহার জীবনে, প্রতিপদবিক্ষেপে আদর্শের পথ তিনি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের দর্শনলাভ করিলে আর কোনও শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে না, তথাপি ভক্তগণের শিক্ষার জন্য শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মসকল তিনি নিজ জীবনে পালন করিতেন। এক দিন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি তাঁহার সরল ভাষায় এই কথাই বলিয়াছিলেন। "এখানকার (শ্রীপরমহংসদেবের) যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি যোল টাং (ভাগ) ক'র্লে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্। আর, আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি, তা তোরা শালারা পাক দিয়ে দিয়ে তাই কর্ব্বি।" আপনার এই অমূল্য উপদেশ চিরজীবন স্মরণ রাখিয়া জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্তও কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান তিনি শিথিল হইতে দেন নাই। "সন্ন্যাসী জগদ্গুরু, তাকে দেখে লোকে শিখবে"—এই অমূল্য সত্য জীবনে পালন করিয়া আজ এই

সন্ন্যাসী দেহত্যাগের অর্দ্ধশতাব্দী পরেও জগদ্‌গুরুরূপে পৃথিবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

শ্রীপরমহংসদেব যখন দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোকশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, তখন বঙ্গদেশের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা শোচনীয়। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা তখন বঙ্গদেশে প্রসারলাভ করিতে কেবল-মাত্র আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে দেশে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। বঙ্গদেশে তখন বিজিত জাতির সমস্ত আদর্শই হীন বলিয়া প্রতিভাত, অমিতশক্তিশালী বিজেতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছিল। নিজের আদর্শ শিথিল অথচ বিদেশীর আদর্শ সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় নাই। এমনই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমোঘ শঙ্খ দক্ষিণেশ্বরের ঘন বনরাজির মধ্য হইতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাভিমানী যুবকেরা তখন "মাথাটা নুইয়ে পের্‌ণামটা পর্য্যন্ত কর্ত্তে জান্‌তো না।" মস্তক অবনত করিয়া গুরুজনকে প্রণাম করাও ইংরাজী শিক্ষাসম্পন্ন যুবকের নিকট কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গুরুজনকে প্রণাম করিবার কার্য্য দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মস্তকে সংলগ্ন করিয়াই শেষ হইয়া যায়, দেহ ঋজুই থাকে, মস্তক কিছুমাত্র অবনত হয় না।

শ্রীপরমহংসদেবকেও এই সাধারণ শিষ্টাচার নিজে পালন করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখন কেশবচন্দ্র চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া শ্রীপরমহংসদেবের প্রণাম গ্রহণ করিতেন। সেই যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ন্যায় একাধারে ভক্তি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী আর কেহই ছিলেন না। ঠাকুর বলিয়াছেন যে,

তিনি প্রতিবার সাক্ষাতের সময় ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিবার পর অবশেষে কেশবচন্দ্র ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া শ্রীপরমহংসদেবকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ঠাকুর সাধারণ কার্য্যও নিজে অনুষ্ঠিত করিয়া তবে জগতে শিক্ষাপ্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপরমহংসদেব দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করেন নাই। ভগবান্‌কে লাভ করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা তিনি আজীবন শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। দেহ—"হাড়মাংসের খাঁচা" মাত্র—যত দিন ভগবৎপ্রাপ্তি না হয়, তত দিন ইহার প্রয়োজনীয়তা। এই সম্বন্ধে তাঁহার মত এতই দৃঢ় ছিল যে, ভগবানের দর্শনলাভের পর সাধু ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করিলেও তিনি তাহাতে দোষারোপ করিতেন না। জীবনে দেহকে তুচ্ছ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া, মরণেও তিনি সেই শিক্ষা সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। নিদারুণ ব্যাধিতে দুর্ব্বল অবস্থায় যখন কণ্ঠনালীর ক্ষত তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট সৃষ্টি করিয়া মুহুর্মুহুঃ তাঁহাকে দেহের কথাই স্মরণ করাইতেছিল, তখনও ব্যাধির অসীম যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছিলেন। নিজে দেহবুদ্ধি বিস্মৃত না হইলে অপরকে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে উপদেশ প্রদান করা অলীক ও নিষ্ফল। ধর্ম্ম-জীবনে প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি নিজ আচরণের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুভূত সত্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া এবং সাধনার দ্বারা সেই আদেশ নিজ জীবনে সফল করিয়া, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীপরমহংসদেব লোকশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের শিশুপ্রীতি

দেবীর নিকট হইতে ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই শ্রীপরমহংসদেব ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একবার কামারপুকুর গমন করিয়াছিলেন। তথায় প্রায় ৬।৭ মাসকাল অবস্থান করিবার পর তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়ে কামারপুকুর হইতে কয়েক দিনের জন্য ঠাকুর নিজ ভাগিনেয় হৃদয়নাথের গ্রাম শিওড়ে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালীন হৃদয়ের একটি শিশুপুত্র শ্রীপরমহংসদেবের অনুক্ষণের সঙ্গী হইয়াছিল। এই গ্রামের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ভদ্রলোকদিগের সহিত ঠাকুর মিশিতে পারিতেন না বলিয়া এই শিশুর সরল ও পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন। শিশুটিও তাঁহার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত দিবস তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুকে নিমগ্ন থাকিত। কিন্তু দিবসের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত চতুর্দ্দিক্ যখন সন্ধ্যাসমাগমে ক্রমশঃ অন্ধকারে মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া আসিত, তখন ব্যাকুল হইয়া শিশু "মা যাব" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিত। সমস্ত দিবসের ক্রীড়াকৌতুক তখন মিথ্যা হইয়া যাইত, অন্ধকারের মধ্যে শিশু একটি সুপরিচিত ক্রোড়ের অন্বেষণ করিত। খেলনা, পাখী প্রভৃতি কত কি জিনিষের প্রলোভন দেখাইয়া ঠাকুর তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইত। ক্ষণে ক্ষণে শিশু অশ্রুসিক্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিত—"মা যাব"। এই শিশুকণ্ঠোত্থিত সহজ

দুইটি ক্ষুদ্র কথা ঠাকুরের সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তিনি শিশুকে সান্ত্বনা দিবার কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেই কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিতেন। শিশু কাঁদে, ঠাকুরও কাঁদেন, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "মা যাব" দুইটি ক্ষুদ্র সহজ শব্দ দুইটি বিভিন্ন হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী কম্পিত করিয়া একসুরে বাজিয়া উঠিত, আর সেই সুর সীমার সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করিয়া বিশ্বজননীর সহিত মিলনের অসীম ব্যাকুলতায় পরিণত হইত। ঠাকুর নিজের ইষ্টদেবীর কথা স্মরণ করিতেন, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন, দেশ, কাল, অবস্থা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনরায় যেন শিশু হইয়া শিশুর সহিত এককণ্ঠে রোদন করিতেন। সাধারণ মানুষ সমস্ত জীবন কামিনী এবং কাঞ্চনের উপভোগে নিমগ্ন থাকিয়া অন্তিমকালে যেমন বিশ্বজননীর শান্তিময় ক্রোড়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, অর্থপিপাসা, ভোগলিপ্সা, যশস্পৃহা কিছুই তখন তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে ক্ষণে ক্ষণে কেবল "মা যাব" এই নীরব শব্দ উত্থিত হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে, সেইরূপ নিখিল বিশ্বজনের বিরহী অন্তরের যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত ব্যাকুলতা শিওড়ের সেই সায়াহ্নকালে শিশুর মুখনিঃসৃত দুইটি সহজ কথায় শ্রীপরমহংসদেবের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া রোদনের শতধারায় বিশ্বজননীর চরণে নিবেদিত হইত। এই "মা যাব" ব্যাকুলতাই কত বর্ষ পূর্ব্বে কোন্ এক বর্ষাদিনে মসীমাখা আকাশের অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভক্তকবি বিদ্যাপতির সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া অসীম রোদনরূপে ভাষার বন্ধনের ভিতর আপনার মুক্তির সন্ধান করিয়াছিল। সে দিন হয় ত আষাঢ়ের নবমেঘরাজি গিরিনদীপ্রান্তরের সন্ধ্যার অন্ধকারকে দ্বিগুণতর ঘনায়িত করিয়াছিল, তারাশশিবিলুপ্ত সমস্ত আকাশ মেঘলিপ্ত হইয়া একখণ্ড জমাটবাঁধা কঠিন অন্ধকারস্তরে পরিণত হইয়াছিল, ছায়াবৃত অরণ্য,

নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর এক অব্যক্ত অন্ধ ব্যাকুলতায় একাকার হইয়া বিদ্যাপতির অন্তরেও এক গাঢ়তর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, আর সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া কবির হৃদয়ের অনন্ত ব্যাকুলতা ক্ষণে ক্ষণে গুমরিয়া উঠিতেছিল—

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি-বিনে দিন রাতিয়া।

অনন্তকালের পুঞ্জীভূত এই একই ব্যাকুলতা হৃদয়নাথের শিশুপুত্রের "মা যাব" কথায় শ্রীপরমহংসদেবের অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিত, আর তিনি বালককে ভুলাইতে যাইয়া তাহারই সহিত এককণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিতেন।

যে শ্রীপরমহংসদেব তাঁহার সাধনকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে বিষয়িসংস্পর্শ বিষবৎ পরিহার করিতেন, সেই ঠাকুর শিওড়গ্রামে এই শিশুর সাহচর্য্যে দিবসের পর দিবস কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে শিশুচরিত্রের রহস্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হইবে। শিশুদিগের সম্বন্ধে মহাপুরুষগণের অভিমত বড়ই সুন্দর ও বিচিত্র। শ্রীপরমহংসদেব একবার বলিয়াছিলেন—"পরমহংসরা তাই ছোট ছোট ছেলেদের কাছে আস্‌তে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ কর্‌বে ব'লে।" যে শিশু-স্বভাবের বিশিষ্টতা নিজ চরিত্রে সংক্রামিত করিবার জন্য পরমহংসগণও উৎসুক হইয়া থাকেন, সেই শিশুচরিত্রের অন্তরালে কি রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা মহাপুরুষগণের বিশ্লেষণ হইতেই সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, শিশুগণ কখনও কুটিলপ্রকৃতি অথবা অপরের অনিষ্ট-চিন্তানিরত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। শিশু এবং বয়স্ক লোকের

মধ্যে উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ লক্ষ্য করিলে অনেক সময়ে মানুষের চরিত্র উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমরা কখনও কখনও লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, শিশু হয় ত কোনও অপরিচিত লোকের ক্রোড়ে আনন্দচিত্তে সহজেই আপনাকে ধরা দিয়া থাকে, আবার কোনও ব্যক্তিবিশেষ সেই শিশুকেই ক্রোড়ে লইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া যায়। কোনও কোনও ব্যক্তি নিজ সন্তানগুলি ব্যতীত অপর কোনও শিশুকে স্নেহ অথবা প্রীতিপ্রদর্শন করিতে পারে না—শিশুজগৎ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ। শিশু এরূপ লোককে ভীতিস্বরূপ বলিয়া জানে এবং কখনও শিশুর দৌরাত্ম্য অথবা আবদার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিতামাতা রাত্রিকালে যেরূপ ভূতপ্রেতের ভীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ দিবাভাগে এই শিশুভীতির আকরস্বরূপ প্রতিবেশি-বিশেষের আশ্রয় তাহারা গ্রহণ করে। সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করিবার সময় চেষ্টা করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের পুত্রকন্যাগণকে কখনও স্নেহব্যবহার প্রদর্শন করিতে হইলে তাহারা অনেক সময়ে এরূপ নীরস এবং প্রাণহীন ব্যবহার করিয়া থাকে যে, সহজেই সেই স্নেহবিহীন কৃত্রিম ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শিশু হঠাৎ বিনা কারণেই কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িয়াছে, রোদনের সময় তাহার ক্রোড়ই শিশুকে শান্তি প্রদান করে, ক্রীড়া-কৌতুকের সময় তাহার সঙ্গই শিশুর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পিতামাতার ক্রোড় হইতেও শিশুকে এইরূপ অপরিচিত অনাত্মীয় লোকের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে দেখা গিয়াছে, কখনও বা শিশু নিজ কোমল হস্ত দুইটি দ্বারা এই অপরিচিত বক্ষকে আবেষ্টন করিয়া পিতামাতার সস্নেহ আহ্বানকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। সাধারণতঃ মানুষ অপর ব্যক্তিকে তাহার বাক্য এবং বাহ্য আচরণের দ্বারা বিচার

করিয়া থাকে, কিন্তু শিশুর বিচারদৃষ্টি অপরের বাক্য অথবা বাহ্য আচরণের দ্বারা প্রতিহত নহে, সে নিজের প্রাণ দিয়াই অপরের প্রাণকে উপলব্ধি করিয়া থাকে।

মানুষ সংসারে যতই প্রবেশ করিতে থাকে, ততই তাহার প্রাণ কোমলতা পরিহার করিয়া স্বার্থের বীভৎস ঘাতসংঘাতে কঠিনতা ধারণ করে, প্রাণের পরিবর্ত্তে মুখের কথা এবং কৃত্রিম ব্যবহারই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ মানুষ অপরকে তাহার নিজ আদর্শের দ্বারাই বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু শিশুর বাক্যও নাই, বাহ্য আচার-ব্যবহারও নাই, আছে শুধু তাহার সরল সুমধুর প্রাণ। সুতরাং অপরকে বিচার করিবার তাহার শুধু প্রাণশক্তিই আছে এবং কেবলমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই সে অপরকে বিচার করিয়া থাকে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, কোনও লোক হয় ত সংসারে আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত গম্ভীর, যাহাদের সহিত তাহার স্বার্থের সম্বন্ধ, তাহাদের নিকট সে সহজবোধ্য অথবা সহজপ্রাপ্য নহে। সাধারণ ব্যবহারে তাহার অপরিসীম ক্রোধেরও পরিচয় সময় সময় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হয় ত লোকচক্ষুর অন্তরালে, মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচরীভূত তাহার এমন তরল ও মধুর প্রাণ আছে যাহা পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ দেখিতে না পাইলেও শিশুর প্রাণের নিকট তাহা ধরা পড়িয়া যায় এবং আমরা সেই মনুষ্য-চরিত্রের বাহিরের দিক্ দেখিয়াই বিস্মিত হই যে, এরূপ গম্ভীর এবং কোপনপ্রকৃতির লোক কিরূপে শিশুর প্রিয় হইয়া পড়িল। এমন দেখা গিয়াছে যে, এরূপ লোকের সহিত সাধারণ বয়স্ক লোকের প্রীতি অথবা মিত্রতা বিরল, কিন্তু পল্লীর সকল শিশুরই সে বন্ধু, সকলেই তাহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করিয়া থাকে। শিশুর সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যে এই অসামাজিক গম্ভীরপ্রকৃতির লোক অনেক সময়ে প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দেয়, তখন অনাবিল তরল হাস্যমুখরিত এই

প্রহরগুলি সংসারের গুরুভারক্লিষ্ট দিবসের তুলনায় একান্ত অপার্থিব এবং অমূল্য বলিয়া মনে হয়। শিশু মানুষের প্রাণ, নিজ প্রাণ দিয়া বিচার করিয়া থাকে এবং কোথাও এই বয়োবৃদ্ধ শিশু ও বয়ঃকনিষ্ঠ শিশুর মধ্যে চরিত্রের সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই উভয়ের ভিতর এরূপ স্নেহ ও প্রীতিবন্ধন সম্ভবপর হইয়া থাকে।

সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি গোল্‌ডস্মিথ জনৈক ধর্ম্মযাজকের চরিত্র বর্ণনা করিবার সময় শিশুর সাহায্যেই সে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মযাজক তাঁহার যজমানবর্গের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার নানাবিধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী বর্ণনা করিয়া অবশেষে গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন যে, প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইলে শিশুগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিত এবং ধর্ম্মযাজকের সুদীর্ঘ অঙ্গবস্ত্র ধরিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সরল ও মধুরস্বভাব এই ধর্ম্মযাজক তাহাদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুহাস্য করিতেন এবং শিশুগণ সেই মৃদুহাস্যে আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ মাতার সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। যেন তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে আগমনের সমস্ত উদ্দেশ্য এই একটি মধুর হাসিতেই চরিতার্থ হইত। বাক্যের আড়ম্বর ছিল না, কেবল একটি মধুর হাসি, ইহাতে শিশুর সরলপ্রাণ ধর্ম্মযাজকের সরলপ্রাণের যে পরিচয় পাইত, তাহা অন্য কোনও বর্ণনা হইতে এরূপ বিশদভাবে প্রকাশিত হইত না।

এক দিন যীশুখৃষ্টের নিকট তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, কিরূপ লোক ভগবানের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে? এই প্রশ্নের মধ্যে যে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা মানবচরিত্র-পরিজ্ঞাত মহাপুরুষের নিকট অজ্ঞাত রহিল না। যীশুখৃষ্ট তাহাদের ধর্ম্মাভিমান দূর করিবার জন্য একটি শিশুকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন,—

"Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven."

(তোমাদের চরিত্র আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যত দিন শিশুর বিশিষ্টতা চরিত্রে পরিস্ফুরিত না হইবে, তত দিন তোমরা কেহই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে না।)

শিশুর চরিত্রের বিশিষ্টতা বলিয়া যীশুখৃষ্ট কি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তগণ বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক রাস্কিন্ এই শিশুচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

"So then, you have the child's character in these four things—Humility, Faith, charity and cheerfulness."

(অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিশুচরিত্র বিনয়, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আনন্দময়তা, এই চারিটি গুণের সমষ্টি মাত্র।)

বিনয় শিশুচরিত্রের একটি প্রধান বিশিষ্টতা। শিশু কখনও আপনাকে জ্ঞানী মনে করে না, সে সর্ব্বদাই শিক্ষা করিবার জন্য উৎসুক। যে কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবার স্পৃহা তাহার মনে বিশেষ বলবতী। আত্মাভিমান ও অহঙ্কার শিশুর চরিত্রকে কখনও কলুষিত করিতে পারে না।

"To know that he knows very little ;—to perceive that there are many above him, wiser than he ; and to be always asking questions, wanting to learn, not to teach."

(শিশু জানে যে, সে কিছুই জানে না, তাহার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী অনেক লোক আছেন ; সে সর্ব্বদাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে চায়, শিক্ষা প্রদান করিবার অহঙ্কার তাহার নাই।)

অগাধ বিশ্বাস শিশুচরিত্রের অন্য একটি বিশিষ্টতা। পিতামাতার উপর নির্ভরতা এই বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। পিতামাতা হাত ধরিয়া গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া, অথবা মরুভূমির উপর দিয়া লইয়া যাইলেও শিশু তাহার প্রতিবাদ করে না, যতক্ষণ পিতামাতার হাত ধরা থাকে, ততক্ষণ তাহার সাহসেরও অবধি থাকে না। এই বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা শিশুচরিত্রের পরিলক্ষণীয় বস্তু।

শিশু মানবকে সহজেই ভালবাসিতে পারে। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা শিশুচরিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু।

"Give a little to a child, and you get a great deal back."

(শিশুকে যতটুকু ভালবাসা আমরা দিই, তাহার অধিক শিশুর নিকট হইতে আমরা ফিরিয়া পাই।)

আনন্দময়তা শিশুচরিত্রের অন্যতম বিশিষ্টতা। কোনও দুঃখ-শোকই শিশুর চিত্তকে অধিকক্ষণ অধিকার করিতে পারে না, অতি সহজে এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দুঃখতাপ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সে আপনার অন্তরের আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া যায়। শিশুর জীবনে অতীত নাই, সুতরাং জ্বালাময়ী অতীতের স্মৃতি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, ভবিষ্যতের চিন্তা তাহাকে স্পর্শ করে না, সুতরাং ভবিষ্যতের অলীক মোহে তাহার মন আচ্ছন্ন নহে। বর্ত্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আনন্দস্রোতে শিশু অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে। ক্ষণিকের জন্য কোন দুঃখ মনে উদিত হইলেও জলরেখার ন্যায় তাহা অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবনের কোথাও তাহার কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না।

মহাপুরুষ যীশুখৃষ্ট শিশুর চরিত্রের যে বিশিষ্টতার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ইংরাজ লেখক রাস্কিন্ যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীপরমহংসদেব শিশু-

চরিত্রের বিশিষ্টতা তাঁহার অপূর্ব্ব মনোরম ভাষায় যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, শিশুর সেই চরিত্রবিশ্লেষণ অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়স্পর্শী। সে দিন তাঁহার নিকট ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার উপস্থিত ছিলেন। বিষয়রসপ্রলুব্ধ বয়স্ক মানবের চরিত্রের সহিত সরল ও পবিত্র শিশুর প্রভেদ বর্ণনা করিবার সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"কাঁচা 'আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন কথা বলে!—এই সব ভাবা। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে, প্রথমে সব জিনিষপত্র কেড়ে লয়, তার পর উত্তম-মধ্যম মারে; তার পর পুলিসে দেয়! বলে, 'কি! জানে না, কার চুরি করেছে!'

"ঈশ্বরলাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া-মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধ'রে কত ভাব, কত খেলা! রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব প'ড়ে রইলো; মার কাছে ছুটেছে! হয় ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্ছে, খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে প'ড়ে গেছে! হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবায় ক'রে বেড়াচ্ছে!

"যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে!' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না', সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমি দেব না।' তার পর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি আর একটি বাঁশী যদি হাতে দাও, তা হ'লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চ'লে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না।

৮

কিন্তু বাপ-মার সঙ্গে যখন অন্য যায়গায় চ'লে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো। পুরাণো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। তার পর জাত অভিমান নেই। মা ব'লে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা এক জন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর এক জন যদি কামারের ছেলে হয় ত এক পাতে ব'সে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই। আবার লোকলজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পিছন ফিরে বলে—দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না ?

"আবার বুড়োর 'আমি' আছে (ডাক্তার মহেন্দ্রলালের হাস্য) বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়; বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারী, কপটতা। যদি কারুর উপর আকোছ হয় ত সহজে যায় না;—হয় ত যত দিন বাঁচে, তত দিন যায় না। তার পর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। বুড়োর 'আমি' কাঁচা আমি।"

শিশুচরিত্রের এই অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ হইতে শ্রীপরমহংসদেবের নিজচরিত্রের বিশিষ্টতা আমরা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়িসঙ্গ-বিতৃষ্ণা

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই বিষয়ে শ্রীবুদ্ধদেব ও তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শাক্যসিংহ জগতের দুঃখকষ্টে ব্যথিত হইয়া নির্ব্বাণের উপায় অনুসন্ধান করিতে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং নিজ কঠোর সাধনের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া "বুদ্ধ" নামে অভিহিত হইবার পর "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মহামন্ত্র জগৎবাসীকে প্রদান করেন। শ্রীপরমহংসদেবও সেই একই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। বহুবর্ষ যাবৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নানাবিধ উপায়ে কঠোর সাধন করিয়া অবশেষে দেবীর আদেশ ও নিজ তপস্যাপ্রসূত শক্তিতে আপনাকে 'সমর্থ' মনে করিবার পর জগতে ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করেন। এই পৃথিবীতে মানুষের যতপ্রকার দুর্ব্বলতা দেখা যায়, তাহার মধ্যে অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার কণ্ডুয়নই প্রধান। প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসু অপেক্ষা সাধনভজনহীন ধর্ম্মশিক্ষকের সংখ্যা অনেক অধিক।

শ্রীপরমহংসদেব "সমর্থ" গুরুরূপে আপনার সাধনার ফল জগতে দান করিবার জন্য একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের ডাকিয়া বলিলেন—

"বল তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বল্‌ছি।" ভক্তগণ নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল, তিনি তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ বলিলেন—

"আর কিছু খোঁচ মোঁচ থাকে জিজ্ঞাসা কর।"

এই সময় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে যে স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব আরম্ভ হইল, তাহা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার ইহজীবনের সহিত শেষ হয়।

কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রচারের প্রারম্ভেই এক বাধা উপস্থিত হইল। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে অনেক গৃহী ও বিষয়ী লোক কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শ্রীপরমহংসদেবকে দেখিতে আসিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসু অপেক্ষা সংশয়াত্মার সংখ্যাই অধিক ছিল। এই সমস্ত সংসারী লোককে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। শুদ্ধ ও বিষয়-বিরক্ত ভক্তগণকে নিকটে পাইবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলার আরতি শেষ হইলে নহবৎখানার ছাতের উপর হইতে তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া শুদ্ধ ভক্তগণকে ডাকিতেন,—"তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়, তোদের না দেখে আমি আর থাকৃতে পাচ্ছিনে।" ঘনবনাকীর্ণ দক্ষিণেশ্বরের নির্জ্জন প্রাঙ্গণে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, এই ক্ষীণকায় সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া যাইত, কেহই সেদিন তাহার সন্ধান রাখিত না। প্রতি সন্ধ্যায় এইরূপ ব্যাকুল কণ্ঠ উত্থিত হইত, সে শব্দপ্রবাহ অনন্ত শূন্যে কোথাও কোনও প্রতিশব্দের সৃষ্টি করিত না। আরও একটি দিন বৃথা চলিয়া গেল, দেহধারণের উদ্দেশ্য তখনও সফলতার সীমা দেখিতে পাইতেছেনা, ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীপরমহংসদেব অধীর হইয়া উঠিলেন। তথাপি গৃহী লোকের সমাগমে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না। যে প্রাণের উৎস একদিন স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল, সে শীতলধারা তখনও তাঁহার অন্তরের ভিতর অবরুদ্ধ। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সে স্রোতোবেগ সহ্য করিবার, তাহার স্বচ্ছ শীতলতা উপলব্ধি করিবার শক্তি দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

শ্রীপরমহংসদেব সেই মুক্তধারা ধারণোপযোগী শিবশক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সত্য প্রচার বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও যিশুখৃষ্টের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যিশুখৃষ্ট ভক্ত ও গৃহীনির্ব্বিশেষে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; শ্রীপরমহংসদেবের প্রাণের কথা তাঁহার সীমাবদ্ধ কয়েকজন বিষয়বিরাগী ভক্ত ব্যতীত অপর কেহই শুনিতে পাইত না। খৃষ্টান্ ধর্ম্মগ্রন্থে বীজ বপনকারীর গল্পে (The Parable of the Sower) স্বয়ং যিশুখৃষ্ট এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষক ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইতেছে, কতকগুলি ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া পড়িল, পক্ষিগণ তাহা খাইয়া ফেলিল, কতগুলি কঠিন স্থানে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়াই যথেষ্ট রসের অভাবে সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া গেল, কতক বীজ কাঁটাগাছের মধ্যে বিনষ্ট হইল, উর্ব্বর ভূমিতে নিহিত অবশিষ্ট বীজগুলি হইতে শতসহস্রগুণ শস্য উৎপন্ন হইল। সুতরাং যিশুখৃষ্ট জানিতেন যে, তাঁহার নিক্ষিপ্ত সব বীজই শস্য উৎপাদন করিবে না, অধিকাংশই কালধর্ম্মে বিনষ্ট হইবে। তথাপি তিনি সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে ধর্ম্মের কথা বলিতেন, যাহার শক্তি ছিল সে গ্রহণ করিত, অবশিষ্ট শ্রোতাগণের সাময়িক উত্তেজনা ধীরে ধীরে শীতল হইয়া যাইত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম প্রচার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তিনি নিজশক্তি ঊষর ক্ষেত্রে অপব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। সভাসমিতি করিয়া লোক ডাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার তিনি জীবনে কখনও করেন নাই। সাধারণ বিষয়ী লোকদিগের ধর্ম্মগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা ছিল না, অথচ নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উপযুক্ত আধারে তাঁহার শক্তি প্রদত্ত হইলে কখনই ব্যর্থ হইবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিরুৎসাহ ভক্তকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিতেন, "এ কি তোকে হেলেয় ধরেছে যে গিল্‌তেও পার্চ্ছে না, ওগলাতেও পার্চ্ছে না, সাপেরও প্রাণান্ত, ব্যাঙ-এরও প্রাণান্ত,—এ

কেউটেয় ধরেছে, তিন ডাক ডেকেই শেষ হ'য়ে যাবে, আর যদি ছাড়িয়েও পালাস্, গর্ত্তে গিয়েও এ কামড়ের কাজ হবে।" সমর্থ গুরুর উপদেশ কখনই ব্যর্থ হয় না, আজই অথবা বর্ষবর্ষান্তে সে জীবন্ত বীজ ফলপ্রসূ হইবে—ইহাই শ্রীপরমহংসদেব ইঙ্গিত করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ বিষয়বিরাগী ভক্ত ব্যতীত কাহাকেও জ্ঞানদান করিবেন না ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। এই দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে তাঁহাকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বহু বিষয়ী লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে, দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইত, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের যে কেবলমাত্র সমাদর করিতেন না তাহা নহে, তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। কেহ রোগের ঔষধ প্রার্থনা করিত, কেহ মকর্দ্দমায় জিতিবার সহজ উপায় খুঁজিতে আসিত, কেহ বা শত্রুদমনের কৌশল সন্ধান করিত। শ্রীপরমহংসদেব চিন্তিত হইতেন পাছে বিশ্বের লোক ঘরে ডাকিয়া আনিয়া দেবী তাহাদের আড়ালে লুকাইয়া পড়েন। উত্তরকালে তাঁহার সাধনজীবনের কথা বলিবার সময় একদিন ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন—"আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল তখন বিষয়ী লোক আস্‌তে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ কর্‌তাম্"। একবার মথুরের সহিত ৺কাশীধামে যাইয়া রাজাবাবুর বাড়িতে বিষয়সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি নির্জ্জনে কাঁদিয়া ভবতারিণীকে বলিয়াছিলেন, 'মা, এ কোথায় আন্‌লি, কাশীতে এসেও বিষয়কথা শুনতে হচ্ছে!" ভক্তকে ধর্ম্মপথ নির্দ্দেশ করিবার সময় উপদেশ দিতেন, 'বিষয়ী লোক দেখলে আস্তে আস্তে সরে যাবি।" বিষয়ী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেবীর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন, "মা, যদি কখনও শরীর ধারণ হয়, যেন সংসারী করো না"। এই বিষয়ী-সংস্পর্শভীতি তাঁহার জীবনে শেষদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

ব্রহ্মভূত এই সন্ন্যাসীর গৃহী লোকদের প্রতি এরূপ অবিশ্বাস ও অনাস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে কয়েকটি স্থূল বিষয় সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল সাধারণ বিষয়ী লোকের সংস্পর্শে ধর্ম্মপথগামী সাধকের জীবন কলুষিত হইয়া উঠে। উভয়ে বিপরীত পন্থাবলম্বী, এক জনের উর্দ্ধদৃষ্টি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি নিবদ্ধ, অপরের নীচগামী মন স্থূল বিষয় রসে আপ্লুত। সুতরাং এই বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট মানবের সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হওয়ায় আপাতমধুর স্থূলবস্তুর আকর্ষণে সাধকের মনের উর্দ্ধগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুরদাসও বিষয়ী সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিতেন।

ত্যজ মন হরি বিমুখন কি সঙ্গ।
যাকে সঙ্গ কুমতি উপজত, করত ভজনসে ভঙ্গ ॥

(রে মন, যে হরি-বিমুখ তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর, কেন না তাহার সহবাসে কুমতি উপস্থিত হয় ও ভজনে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।)

বিষয়ী লোকের ভগবদ্‌ভক্তি সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও আস্থা ছিল না। সংসারীর ভক্তি ক্ষণস্থায়ী ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি বলিতেন যে এই সমস্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারে না, ইহারা যখন সামান্য 'এক খিলি পান' সাধুকে প্রদান করে তখনও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাঁচটা কামনা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। এই কামনাকলুষিত দান সন্ন্যাসী জীবনের অন্তরায় বলিয়া সাধারণতঃ তিনি সংসারীদের দান গ্রহণ করিতেন না, করিলেও তরুণ ভক্তদিগকে তাহা ব্যবহার করিতে দিতেন না। অনেক সময় দক্ষিণেশ্বরযাত্রী ধনী মাড়োয়ারী প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্যাদি এইরূপে নষ্ট হইত, কাহারও ভোগে আসিত না। কেবলমাত্র যে একজন যুবক ভক্ত সম্বন্ধে তিনি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন তাঁহার কথা যথাস্থানে

লিপিবদ্ধ হইবে। সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত ক্ষণস্থায়ী ভক্তিসম্বন্ধে শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, "সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তি করে, আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।" বিষয়ীর মর্কট বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশীদিন থাকে না। হয়ত কর্ম্ম নাই, গেরুয়া প'রে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো আমার একটি কর্ম্ম হয়েছে, কিছুদিন পরে বাড়ি যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।" সুতরাং এইরূপ অস্থিরচিত্ত লোকের পক্ষে সাধনভজন কত কঠিন তাহা উল্লেখ করিয়া শ্রীপরমহংসদেব সংসারের এক সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিতেন এবং নানাবিধ সাংসারিক আকর্ষণ ও দুঃখকষ্টের মধ্যে প্রকৃত ভগবৎচিন্তা দুরূহ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেন। "সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই; ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার।" সংক্ষেপে সাধারণ সংসারের এরূপ বিশদচিত্র অঙ্কন করা কবির পক্ষেও সুলভ নহে। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত বিষয়ী লোকদের আচরণ তিনি অপরের অজ্ঞাতে লক্ষ্য করিতেন। নৌকা করিয়া অনেক লোক আসিয়াছে, কেহ কেহ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেছে, আবার কেহ বা অল্পক্ষণ পরেই অস্থির হইয়া উঠিতেছে, ধর্ম্মকথায় মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছে না। এই সমস্তই তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টির অগোচর ছিল না। "ঈশ্বরীয় কথা তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধুর গা টিপছে—'কখন যাবে, কখন যাবে।' যখন বন্ধু কোনরকমে উঠল না, তখন বলে 'তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি।" ভগবৎসম্বন্ধীয় আলোচনা দীর্ঘ সময় সহ্য করা তাহাদের পক্ষে কঠিন। আবার যাহারা আপাতঃদৃষ্টিতে স্থির হইয়া তাঁহার কথা শুনিত, তাহাদেরও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি কোনও মিথ্যা আশা পোষণ

করিতেন না। বিষয়ভোগী লোকের ভদ্রতাবুদ্ধিজনিত মনোযোগের মূল্য তিনি জানিতেন। "বিষয়ীরা সাধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয় কথা, বিষয় চিন্তা, একেবারে লুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেইগুলি বার করে। পায়রা মটর খেলে মনে হলো যে ওর হজম হ'য়ে গেল। কিন্তু গলার ভেতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিজ গিজ করে।" তিনি মনে করিতেন, গৃহী লোকের জীবন্ত বিশ্বাসের অভাব, তাহাদের ভুক্ত মটরেই সমস্ত দেহ ও মন পরিপূর্ণ, ভক্তি ও বিশ্বাসের স্থান তাহাদের হৃদয়ে নাই। শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, 'বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ি জেঠীর কোন্দল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে—আমার ঈশ্বরের দিব্য। আর যেমন কোনও ফিটবাবু পান চিবুতে চিবুতে, হাতে ষ্টিক (ছড়ি) ক'রে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে—ঈশ্বর কি beautiful ফুল করেছেন।" "হরিবিমুখন" বিষয়ী লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা কত ভ্রান্ত এবং তাহাদের "সংস্পর্শজা ভোগাঃ দুঃখযোনয়ঃ" (বিষয় স্পর্শ জনিত সুখ, দুঃখের আকর) ইহা শুদ্ধ ভক্তদিগকে বুঝাইয়া বারংবার সাবধান করিয়া দিতেন। তীর্থযাত্রী গৃহস্থ তীর্থ গমনই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, পথকেই গৃহ ভাবিয়া সন্তুষ্ট হয়, পুত্রকন্যাদিগকে দেবদেবীর চরণামৃত পান করানই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করে। "এরা হরিকথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চ'লে যায়, বলে হরিনাম মর্‌বার সময় হবে, এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিংবা ছেলেদের বলে 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও, তা না হ'লে তেল পুড়ে যাবে', আর পরিবার ও ছেলেদের মনে করে কাঁদে আর বলে, হায়! আমি ম'লে এদের কি হবে! আর বদ্ধজীব যাতে এতো দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে, মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'লো আবার বছর

বছর মেয়ে হবে ; বলে, কি করবো অদৃষ্টে ছিল। যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা কর্ব্বার অবসর পায় না—কেবল পরিবারের পুঁটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপায় করে। মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাইরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, তীর্থ গেলে, কি হবে? সংসারে আসক্তি ভিতরে থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। কত আবল-তাবল বলে ; হয়ত বিকারের খেয়ালে "হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। শুকপাখী সহজ বেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধ'রলে নিজের বুলি বেরোয়। ক্যাঁ, ক্যাঁ করে।" অপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গী, ওজস্বিনী ভাষা ও গভীর ভাবের সমন্বয়ে সাধারণ লোকজীবনের এই বিশদ্‌চিত্র বারংবার ভক্তবৃন্দের হৃদয় স্পর্শ করিত।

বিষয়ী-লোকেরা জীবনে প্রেম ও ভক্তির অভাব সাধারণতঃ স্বীকার করিলেও নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই উচ্চধারণা পোষণ করিয়া থাকে। বুদ্ধিহীনতা বা বুদ্ধির অল্পতা এ পৃথিবীতে কেহই স্বীকার করে না। শ্রীপরমহংসদেব আত্মাভিমানী সংসারী লোকের হীনবুদ্ধির কথা বারংবার উল্লেখ করিতেন। যে-বুদ্ধির গৌরব করিয়া সংসারীলোকেরা আপনাদিগকে চতুর মনে করে, সেই বুদ্ধিকে তিনি "চিঁড়ে ভেজা বুদ্ধি" "রাঁড়িপুতী বুদ্ধি" বলিয়া অভিহিত করিতেন। বিধবা স্ত্রীলোকের সন্তান দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নিরঙ্কুশ জীবন যাপন করিয়া প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হয়, পরমুখাপেক্ষী হইয়া মনের মেরুদণ্ড হারাইয়া ফেলে, সুতরাং মলিনবুদ্ধি লইয়া প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে পারে না। ইহাই 'রাঁড়িপুতী বুদ্ধি।' যে বুদ্ধিতে "টাকা হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটির কর্ম্ম হয়, উকীল হয়, সে বুদ্ধি চিঁড়েভেজা বুদ্ধি।" একবার তাঁহার ভাগিনেয়

হৃদয়নাথ একটি এঁড়ে বাছুর আনিয়া প্রতিদিন তাহাকে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে বাঁধিয়া রাখিত, বড় হইলে লাঙ্গল টানিবার জন্য দেশে পাঠাইয়া দিবে ইহাই তাহার সঙ্কল্প ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ের নিকট ইহা শুনিয়া মায়াচ্ছন্ন বুদ্ধির কথা ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সংসারী লোকে এই এঁড়ে-বলদ-করা বুদ্ধিরই গৌরব করিয়া থাকে। যে-বুদ্ধি মানুষকে পশুর অপেক্ষা উচ্চ আসন দিয়াছে, তাহার সমস্ত শক্তি একমুষ্টি অন্ন-সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করাকে শ্রীপরমহংসদেব বুদ্ধির "বাজে-খরচ" বলিয়াই মনে করিতেন। অন্ন সংগ্রহ করা প্রয়োজন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যদি কেবলমাত্র অন্ন সংগ্রহের জন্যই সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে মানুষ ও পশুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে জ্যোতির পথ আবিষ্কার করা, দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের সন্ধান পাওয়া, রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান করা ও অনন্তমৌনের বাণী অন্তরে শ্রবণ করিবার শক্তিতেই মানববুদ্ধির চরম সার্থকতা। বুদ্ধির অপব্যয় ও অদূরদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, এইরূপ ক্ষীণ ও অস্থির-বুদ্ধি সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল নহে। "এসব লোকের কথার ঠিক্ থাকে না। বলে, কিন্তু পেরে ওঠে না।" এই মেরুদণ্ডবিহীন মন সম্বন্ধে ইংরাজিতে একটী চলিত কথা আছে—'Hell is paved with good intentions' 'অর্থাৎ নরকে যাইতে যাইতেও লোকে সাধুসঙ্কল্প করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি তাহাদের কখনও ছিল না, এখনও নাই।'

এই বিষয়ে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের জীবনের একটী কৌতুককর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন ইংরাজসমাজে তাঁহার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু অসীম বিষয়বুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি মনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। লর্ড কার্জ্জন নিজে বলিয়াছেন, "Every morning

I pray : Please God, may I not be rude or unkind during the course of this coming day to any man or woman. In the evening when I retire to bed, I go back upon my day and examine whether that prayer has been vouchsafed. I always find that I have been very rude and very often rude, during the day, to many men and alas ! even to a few women."

(প্রতিদিন প্রভাতে আমি প্রার্থনা করি : 'হে ঈশ্বর, আমি যেন সমস্ত দিনের মধ্যে কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের প্রতি কর্কশ ব্যবহার না করি।' রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ করিবার সময় একবার সমস্তদিনের হিসাবনিকাশ লই—আমার প্রভাতের প্রার্থনা সফল হইয়াছে কিনা ভাবিয়া দেখি। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে দিনের মধ্যে আমি অনেকবার স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে মানুষের মনে আঘাত দিয়াছি।)

এই আত্মগ্লানি লর্ড কার্জ্জন প্রতিদিন সহ্য করিতেন, তথাপি চঞ্চল মনকে কখনই বসে আনিতে পারিতেন না। অপরের সহিত ব্যবহারের সময় তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যর্থ হইয়া যাইত। বিষয়ীর এই বুদ্ধিভ্রংশতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মন মত্তকরী" সুতরাং "সংসারী লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে ওঠে না।" অথচ যাঁহার বুদ্ধি ভগবদ্মুখী হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই 'প্রমাথি, বলবদ্, দৃঢ়ং' (ইন্দ্রিয় ক্ষোভকারী, বলবান ও উচ্ছৃঙ্খল) মনকেও আয়ত্ত করা কঠিন নহে। বঙ্গদেশে এক মফঃস্বল সহরের কলেজে জনৈক ধার্ম্মিক লোক অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। একদিন কোন কল্পিতবিষয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়া জনৈক ছাত্র অধ্যক্ষ মহাশয়ের আফিসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভদ্রোচিত ভাষায় অপমানিত করে। অধ্যক্ষ মহাশয় এই লেখককে বলিয়াছিলেন যে, হঠাৎ অপমানসূচক ভাষা শুনিয়া তড়িতের মত ক্রোধ তাঁহার সমস্ত

মনকে আচ্ছন্ন করিল, কম্পিতকলেবরে চেয়ার ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, রূঢ় অসংযত ভর্ৎসনার বেগ তাঁহার জিহ্বা অধিকার করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল "আমি এতদিন যে সংযম অভ্যাস করিয়াছি, আমার সেই সমস্ত জীবনের সাধনা এই হতভাগ্য বালকের মুহূর্ত্তের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। তখন মন ধীরে ধীরে শান্ত হইল, আমি পুনরায় আসন গ্রহণ করিলাম।" চিত্তবিকারের কারণ লর্ড কার্জ্জন ও এই অধ্যক্ষমহাশয়—উভয়েরই উপস্থিত হইয়াছিল। উভয়েই উচ্চশিক্ষিত। অথচ একজন পুনঃ পুনঃ মনের নিকট পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করিতেন, অপরজন ইন্দ্রিয়ক্ষোভকে "পুনঃ বশিত্বাদ্বাবলবন্নিগৃহ্য" (জিতেন্দ্রিয় বলিয়া ইন্দ্রিয়বিকার পুনরায় দূর করিয়া) চিত্তের সমতা রক্ষা করিতেন। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। লর্ড কার্জ্জনের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলেও পরিশুদ্ধ হয় নাই, অধ্যক্ষ মহাশয় সাধনার দ্বারা বিপথগামী মনকে সংযত করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। বিষয়ী ও ধার্ম্মিকের বুদ্ধির মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

এইরূপ বিষয়তৃষ্ণাকলুষিত মন সাধনার প্রবল অন্তরায়। যে লোক সর্ব্বদাই আপনার ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইতেছে, স্থিরবুদ্ধিপ্রদিষ্ট পথে বিচরণ করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার বিক্ষুব্ধ মন কখনও ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত হইতে পারে না। এই অন্তরায় উপলব্ধি করিয়া যিশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God."

(উটের পক্ষেও ছুঁচের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া পার হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু ধনীলোকের পক্ষে স্বর্গলাভ সম্ভবপর নহে)। ধনীলোকই ঘোরতর সংসারী, সেইজন্য ধনীলোকের উল্লেখ করিয়া সংসারীর পক্ষে ঈশ্বরলাভ কত বিঘ্নবহুল তাহা যিশুখৃষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শ্রীপরমহংসদেবও এই আসক্তিকলুষিত বুদ্ধিসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কেবল রাতদিন বিষয়কর্ম্ম কর্‌লে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে?……তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর……কিন্তু শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধির গোচর—যে মনে, যে বুদ্ধিতে আসক্তির লেশমাত্র নেই। শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা একই জিনিষ।" প্রাণধারণের গ্লানিমাত্র যাহাদের জীবনে আছে, ঈশ্বরলাভরূপ সার্থকতা নাই, সেই সমস্ত লোকের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন, "বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নেই। যেন গোবরের ঝোড়া।" ইহাদের ঈশ্বর বিষয়ে উদ্দীপনা সাধারণতঃ হয় না, হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী—"যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে—ছ্যাক্ করে উঠলো—তার পরেই শুকিয়ে গেল।"

অশেষ দোষের আকর এই সংসারে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করিতে, "দুঃখদোষানুদর্শনম্" (সংসারের দুঃখ দোষ দেখিবার) শক্তি প্রবোধিত করিবার জন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ সংসারের যে চিত্র ভক্ত ও গৃহী উভয়ের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করিতেন, তাহা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে অঙ্কিত করা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। তিনি সংসারের বাহিরে থাকিয়াও গৃহীর জীবন যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে এই চিত্র আমরা দেখিতে পাই। মহর্ষি কণ্বের শিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন। অরণ্যের মহাশান্তিতে অভ্যস্ত শিষ্যগণের পক্ষে কোলাহলমুখরিত মহানগরী দুঃসহ মনে হইতেছে। ভোগের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া সন্ন্যাসীর দৃষ্টি রাজপ্রাসাদের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছে। সেখানে কত অতৃপ্ত বাসনা, লালসার উত্তপ্ত নিশ্বাস ও নিষ্ফল কামনার অভিশাপে পাষাণপুরীর প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আছে, তাহার নির্ণয় নাই। শার্ঙ্গরব সঙ্গীকে বলিতেছেন, "এই রাজপ্রাসাদ আমার নিকট

'হুতবহপরীতং গৃহমিব' (অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের ন্যায়) প্রতীয়মান হইতেছে।" রাজপ্রাসাদই যদি এত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে সাধারণ গৃহীর কুটীরে শীতলতার আশা কোথায়! কিন্তু এই অগ্নিদগ্ধ জীবনকেই সংসারীরা স্বাভাবিক মনে করে, জালা জুড়াইবার স্থান আছে তাহা বিস্মৃত হয়, মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি অপব্যয়িত করিয়া ফেলে। "বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের কোন মতে হুঁস হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না। উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর দর করে পড়ে, তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোকতাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হ'ল—তবু আবার বিয়ে ক'রবে। ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা যে শোকে অধীর হ'য়েছিল—আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধ্‌লে, গয়না পর্‌লো! এ-রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়েছেলেও হয়। মোকর্দ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকর্দ্দমা ক'রে। যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্‌তে পারে না, আবার বছর বছর ছেলে হয়।····· বদ্ধজীবের আর একটী লক্ষণ। তাদের যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায় তাহ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। এতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে।" এই অস্বাভাবিক সংসার প্রীতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, "সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে। সর্ব্বদাই মনে করে আমিই সব কর্‌ছি। আর গৃহপরিবার এ-সব আমার। দাঁত ছরকুটে বলে—এদের—মাগছেলের—কি হবে! আমি না থাক্‌লে এদের কি

ক'রে চ'ল্‌বে। আমার স্ত্রীপরিবার কে দেখবে ?" ইহাই গীতার "অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"—(অহং জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া লোকে নিজেকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে)।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৮টার সময় অনেক গৃহী ও ব্রহ্মচারী ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই স্নেহাস্পদ ও অনুগৃহীত। তিনি সচরাচর যাহাদিগকে 'বহিরঙ্গ' বলিতেন সেরূপ কোনও লোক এই শীতের প্রভাতে তখনও আসে নাই। শ্রীপরমহংসদেব ছোট খাটখানিতে বসিয়া জনৈক গৃহীভক্তকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "লজ্জা হয় না! ছেলে হয়ে গেছে আবার স্ত্রীসঙ্গ। ঘৃণা করে না? পশুদের মত ব্যবহার! যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম ব'লে বোধ হয়। যে শরীর থাক্‌বে না, যার ভেতর কৃমি ক্লেদ, শ্লেষ্মা যতপ্রকার অপবিত্র জিনিষ সেই শরীর নিয়ে আনন্দ! লজ্জা হয় না!" এই তীব্র ভর্ৎসনা কেবলমাত্র "অন্তরঙ্গ" শিষ্যদিগকেই শুনিতে হইত—এই তীব্রভাষাই তাঁহার সংসারীজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করিত।

এইরূপ অচেতন মোহমায়াসমাবৃত ইন্দ্রিয়ভোগ-লোলুপ জীবনকে তিনি নানাবিধ তুলনার দ্বারা ফুটাইয়া ভক্তগৃহীকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেন এবং ব্রহ্মচারীদিগকে সময় থাকিতে সাবধান করিয়া দিতেন। সমস্ত উপমাগুলি সহজ ও চিত্তস্পর্শী।

"রসুনের বাটি যত্ ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাক্‌বেই। ছোক্‌রারা শুদ্ধ আধার, কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেক দিন ধ'রে কামিনীকাঞ্চন ঘাঁট্‌লে রসুনের গন্ধ হয়।

"যেন কাকে ঠোক্‌রান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ।

"নূতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌তে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়।

"বড় বেলায় দাম্‌ড়া হ'য়েছে, আমি বৰ্দ্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া গাই-গরুর কাছে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'একি হ'লো? এ তো দাম্‌ড়া!' তখন গাড়োয়ান বল্লে, 'মশায়, এ বেশী বয়সে দাম্‌ড়া হ'য়েছিল, তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।'

"এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা ব'সে আছে। একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বর চিন্তা কর্চ্ছে, একজন আড় চোখে চেয়ে দেখলে। সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হ'য়েছিল।"

বিষয়ী সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা শ্রীপরমহংসদেবের মনে চিরদিন সমভাবে বৰ্ত্তমান ছিল। বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীদিগের প্রতি আচরণ তাঁহার এই বিশ্বাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রধানতঃ কতকগুলি বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীপরমহংসদেব কোন ভক্তের বাড়ী যাইলে সেখানে মাদুরে গঙ্গাজল ছিটাইয়া তবে তাহা ব্যবহার করিতেন, কারণ মাদুরখানিতে কত বিষয়ী লোক আসিয়া বসিয়াছে, তাহাদের সংস্পর্শজ দোষ তাহাতে হয়ত তখনও বৰ্ত্তমান। সংবাদপত্রসমূহ বিষয়চৰ্চ্চা, পরনিন্দা প্রভৃতিতে পূর্ণ, সুতরাং তিনি সংবাদপত্র স্পর্শ করিতেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মাঘ তিনি কবি গিরিশচন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। "আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয় কথা, পরচৰ্চ্চা, পরনিন্দা; তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা সরান হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।" সংবাদপত্রের প্রতি এইরূপ বিতৃষ্ণা কোন কোন ধাৰ্ম্মিক লোকের মধ্যে এখনও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবন্ধু ইংরাজমনীষী পিয়ার্সনের

পিতা ইংলণ্ডে ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিতেন। তিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেন না। প্রভাতে উঠিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিলে সমস্তদিন মনের মধ্যে ক্রোধ, বিদ্বেষ, নিন্দাপ্রবৃত্তি আন্দোলিত হইতে থাকে, দিনটী নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সংবাদপত্র প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের অন্তরায় মনে করিয়া বৃদ্ধ পিয়ার্সন শেষ জীবনে সংবাদপত্রের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল অনেক সাধু সন্ন্যাসীও সত্যমিথ্যাসঙ্কুল সংবাদ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক, লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কর্ম্মোপলক্ষে ইতস্ততঃ গমন করিবার সময় একখানি সংবাদপত্র তাঁহারা সঙ্গে লইয়াছেন। জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত গৃহীর পার্থিব জগতের সংবাদ রাখা যেমন প্রয়োজন, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহা তেমনই বৃথা ও অকিঞ্চিৎকর। সংবাদপত্রপাঠের অভ্যাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয় এবং কোনদিন সংবাদপাঠ হইতে বঞ্চিত হইলে মন অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে থাকে। এই অভ্যাস ধর্ম্মজীবনের বিরোধী কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে নরহত্যা, নারীহরণ, যুদ্ধের বর্ব্বরতা, হিন্দু-মুসলমান-ইংরাজের স্বার্থ-সংঘাতের বিক্ষুব্ধ আবর্ত্ত, দম্ভ-দর্প-অভিমান-ক্রোধ-পারুষ্যপূর্ণ সংবাদ সমূহের আলোচনা ধর্ম্মজীবনের অনুকূল নহে, ইহা মনকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। এরূপ সংবাদগ্রহণের আনন্দ অপেক্ষা গ্লানিই অধিক।

লুব্ধ, ভোগবিলাসী সংসারী লোকের দান শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করিতেন না। যাহার মনের কলুষ দূর হয় নাই, গীতায় তাহার দান "তামস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জামাকাপড় প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে তিনি শুদ্ধ সত্ত্ববিশিষ্ট ভক্তকে অনুরোধ করিতেন। "গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও, সকলের জামা তো পরি না।" 'সকলের জামা তো পরি না'—এই ক্ষুদ্র কথাগুলির অন্তরালে

বিষয়ীস্পর্শ-কলুষিত দ্রব্যের প্রতি তাঁহার অনাদর প্রচ্ছন্ন থাকিত। যাঁহারা সর্ব্বদাই বিষয় রসে মগ্ন হইয়া আছেন এরূপ লোকের প্রদত্ত খাদ্য-দ্রব্য তিনি নিজে খাইতেন না, তরুণ ব্রহ্মচারীদিগকেও দিতেন না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু সংসারী জীবের প্রতি শ্রীপরমহংসদেবের ধারণা অথবা আচরণ যাহাই হউক না কেন, ত্রিতাপক্লিষ্ট অসহায় নরনারী তাঁহাকে ক্ষীণ মুষ্টি দিয়া আকর্ষণ করিয়া রহিল। অনেক সময় তাহাদিগের সঙ্গ পরিহার করিবার জন্য তিনি উপবিষ্ট সংসারী ভক্তগণকে মন্দিরে দেবীদর্শন করিতে যাইতে বলিতেন। কিন্তু অবহেলা অথবা অবজ্ঞা কিছুই তাহাদিগকে দূরে সরাইতে পারিত না। সাধু নরোত্তম সম্বন্ধে কবি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষেত্রেও ঠিক্ তাহাই হইয়াছিল।

ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি'
সহসা কমল গন্ধে মত্ত হ'য়ে দ্রুত পক্ষ মেলি'
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম উপবনে
উন্মুখ পিপাসা ভরে, সেই মতো নরনারীগণে
সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি'
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্ন বেদিকার' পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।

এই রূপে সংসারীলোকের যাতায়াত দক্ষিণেশ্বরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথম প্রথম বিষয়ীদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেও ক্রমশঃ তাহাদের সংস্পর্শ সহ্য হইয়া আসিল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দুই হাত দিয়া ভগবানকে আকর্ষণ করিবার শক্তি তাহাদের নাই বলিয়া কি তাহারা তৃণখণ্ডের মত সংসার স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইবে, তিনি করুণা করিয়া জীবনের গতি ফিরাইবার জন্য তাহাদিগকে

সাহায্য করিবেন না? অবশেষে সাধুসঙ্গ ও নির্জ্জনে যাইয়া ভগবানের দয়ার জন্য কাতর ক্রন্দন—ইহাই গৃহীভক্তের একমাত্র উপায় বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এইবার শ্রীপরমহংসদেব আপনার উপদেশে আপনিই ধরা পড়িলেন। নির্জ্জনে যাইয়া কাতর প্রার্থনা সাধন-সাপেক্ষ, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতাবাসীর পক্ষে সাধুসঙ্গ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। দক্ষিণেশ্বরের দ্বার তখনও উন্মুক্ত, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও নিরক্ষর মূর্খ, সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারী ও জড়বাদী সংসারী, সকলেই সমবেত হইল, নিজ নিজ শক্তি ও ভাবনা অনুযায়ী সিদ্ধি লাভ করিল, কেহই বঞ্চিত হইল না এইরূপে জনসমাগম হইতে লাগিল, কিন্তু অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কখনও অন্তর্হিত হইল না—সংসারবিরাগী ব্রহ্মচারীর সমাদর গৃহী কোনদিন পাইল না। কিন্তু পাছে এই ব্যবহারের পার্থক্য কাহারও মনে আঘাত দেয় ইহা আশঙ্কা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ জীবনে বলিতেন, "তবে কি এদের (সংসারী) ঘৃণা করি? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি। তিনি সব হ'য়েছেন—সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই মাতৃ যোনি, তখন বেশ্যা ও সতী লক্ষ্মীতে কোনও প্রভেদ দেখি না।" 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সমস্তই ব্রহ্ম) এই জ্ঞানজ্যোতিঃ চক্ষের সম্মুখে আনিয়া যখন গৃহী দর্শন করিতেন, তখন সব একাকার হইয়া যাইত, নরেন্দ্রনাথ ও ভগবতী দাসীর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিত না। কিন্তু সংসারীর দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের এই দৃষ্টিভঙ্গী সকল সময়ে সমভাবে বিরাজ করিত না।

দক্ষিণেশ্বরে দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু যাহাদিগের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাদের কেহই তখনও আসে নাই। অশান্ত মন কোথাও স্থির হইতেছে না, সন্ধ্যার পর চীৎকার করিয়া শুদ্ধ ভক্তদিগকে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু সে ধ্বনি তখনও প্রতিধ্বনির

সৃষ্টি করে নাই, অমূল্য সাধনজীবনের আর একটি দিন বৃথাই কাটিয়া গেল, জীবনের যা কিছু সঞ্চয় তাহা নামাইবার স্থান তখনও দৃষ্টি গোচর হইল না। ভক্ত মথুর সাধুচিত্তের এই প্রবল আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কই ভক্তরা এলো না?" শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর দিলেন, "কি জানি বাপু, মা তো বলেছেন তারা আসবে।" মথুর দেখিলেন প্রশ্নটী সমীচীন হয় নাই, কোন বেদনার তন্ত্রীতে তিনি অজ্ঞাতসারে আঘাত করিয়াছেন। তখন সান্ত্বনা দিবার জন্য পুনরায় বলিলেন, "তা বাবা কেউ নাই এলো, আমি তো আছি, আমি একাই একশো।"

কিন্তু মা বলিয়াছেন ভক্তেরা আসিবে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ব্যাকুল প্রতীক্ষা, দৃষ্টি দূরনিক্ষিপ্ত, মনে সংশয়াতীত আত্মবিশ্বাস।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে শুদ্ধভক্ত সমাগম

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন—নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), যোগীন্দ্র (স্বামী যোগানন্দ) আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কথক শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ধর্ম্ম জীবনের এক এক প্রদেশে এক এক জন দিগ্‌বিজয়ী বীর। ইঁহাদের মধ্যে যে ভাগ্যবান্ ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ পদ্মমধ্যে সহস্রদল বলিয়া অভিহিত করিতেন, যে সব্যসাচী বিজয়-তিলকে ভূষিত হইয়া দেশবিদেশে স্বীয় গুরুর পতাকা বহন করিয়াছিলেন, একমাত্র যাঁহারই রথে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ অলক্ষ্যসারথিরূপে বিরাজিত হইয়া তাঁহাকে জয়মণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন তখনকার যুগে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার উন্মাদনায় নরেন্দ্রনাথের অহঙ্কারের সীমা ছিল না, নিজের বুদ্ধির উপর অসীম আস্থা ছিল, পাছে কেহ ঠকাইয়া কিছু ভুল বুঝাইয়া দেয়—এই আশঙ্কায় মন সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিত। কিন্তু যেদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হইল সেদিন নরেন্দ্র যে গান দুইটি গাহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইলেন, নিজের সেই গান দুইটির স্রোতের মুখে পড়িয়া নরেন্দ্রের সমস্ত অহঙ্কার ও সতর্কতা কোথায় ভাসিয়া গেল। প্রথম গানটি

মন চল নিজ নিকেতনে।

সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥

বিষয় পঙ্কক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন ভুলিছ আপন জনে ॥
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে ॥
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শমদম তুইজনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে স্থধাইও পথ সে পান্থ নিবাসী জনে ॥
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন কাঁপে যার শাসনে ॥

এই গানের ভাষার ভিতর দিয়া নরেন্দ্রনাথ যেন নিজ নিকেতনে যাইবার জন্য আহ্বান শুনিতেছেন, সংসার বিদেশ—তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ নামে পান্থধামের কথা শুনিয়াছেন, সংসার পথে ভ্রান্ত পথিক-মনকে সাধুসঙ্গ আশ্রয়ে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিতেছেন। গানের ভিতর দিয়া নরেন্দ্রের অন্তরাত্মা যেন কাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ সাধুসঙ্গ লাভ করিল। কিন্তু সাধুর গৃহে কীট-পতঙ্গও বাস করে, দুষ্ট লোকও কত আসে যায়, স্থতরাং আত্মনিবেদন না হইলে সাধুসঙ্গ আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। তাই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় গানে আত্ম-নিবেদন করিলেন।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ॥
হৃদয়-কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥

দিন বিফলে চলিয়া যাইতেছে, নরেন্দ্রনাথ আশাপথ নিরখিয়া বসিয়া আছেন। আজ হৃদয়কুটীর দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, গুরুরূপী ভগবান কৃপা করিয়া আসিয়া তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল করুন। গানের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ের মধ্যে, পরস্পরের অজ্ঞাতসারে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু এই গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে বা লৌকিক সমাজে আপনাকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। নানাবিধ কারণে ধর্ম্মব্যবসায়ী গুরুর প্রতি তাঁহার মনে অবজ্ঞার উদয় হইয়াছিল। তিনি দেখিতেন, বিষয়ী লোক নিজেই ত্রিতাপে জর্জ্জরিত, অথচ সাধন-ভজনবিহীন হইয়াও পূর্ব্ব-পুরুষদের অনুসৃত মন্ত্র-প্রদানকার্য্য গ্রহণ করিয়া বংশপরম্পরায় লোককে দীক্ষা প্রদান করিতেছে। কিন্তু এই দেশে একদিন গুরুর আদর্শ কত উচ্চ ছিল তাহা নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায়।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

(অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে অন্ধীভূত জীবকে জ্ঞানরূপ শলাকা দ্বারা যিনি দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।)

কিন্তু গুরু নিজেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিজেই অন্ধ, পুত্রকলত্রাদি ভরণপোষণের জন্য হয়ত অপরের দাসত্ব করিতেছেন, ঘোর বিষয়াসক্ত অথচ দীক্ষা প্রদান করিয়া দলে দলে শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া তোলাই জীবনের ব্রত হইয়াছে। এ যেন "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" (অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে)। এইরূপ গুরুশিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

গুরু লোভী, শিখ্‌ লালচি, দোনো কে—নে যাও
দোনো বপুরা ডুব মরে চড়্‌হে পাথরকে নাও।

(যে গুরু বিষয়লোভী এবং যে শিষ্য সংসারাসক্ত তাহারা দুজনে একত্র ভবসাগর যাত্রী হইলে পাথরের নৌকা ডুবিয়া উভয়েরই মৃত্যু সুনিশ্চিত)।

এই হতভাগ্য দেশে ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষকতা, কবিগিরির মত গুরুগিরিও জীবিকার্জ্জনের একটি অন্যতম পেশা। এইরূপ পেশাদারী গুরু সম্বন্ধে শ্রীপরমহংসদেবের অবজ্ঞার সীমা ছিল না। শক্তিহীন গুরুর শিষ্য আরও শক্তিহীন হইবে, ইহা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার নিজস্ব অমার্জ্জিত গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন "হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য।" নিজের দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে এই গুরুগিরিসম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য শ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছেন—

"অনেকের ইচ্ছা হয় গুরুগিরি করি—পাঁচজনে গণে মানে, শিষ্য সেবক হয়, লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়, কত লোক আসছে যাচ্ছে, শিষ্যসেবক অনেক হয়েছে, ঘরে জিনিষ পত্র থৈ থৈ কচ্ছে! গুরুগিরিও বেশ্যাগিরির মত! ছার টাকাকড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্যে আপনাকে বিক্রি করা! যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিষের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়, এখন তার বেশ হয়েছে, একখানা ঘরভাড়া নিয়েছে, ঘুঁটেরে, গোবররে, তক্তপোষ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা মাদুর তাকিয়া, কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে, তাই সুখ ধরে না! আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ী দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে! সামান্য জিনিষের জন্য নিজের সর্ব্বনাশ!" কি অপূর্ব্ব ভাষা ও অপূর্ব্ব বর্ণনা! পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন "সাবিকে" চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, যেমন তিনি একদিন এই সাবিকে দেখিয়াছিলেন। আজ এই অখ্যাতা ও

অজ্ঞাতা 'সাবি' নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সে কোথায় ছিল, তাহার শেষ জীবনের পরিণতি কি, কিছুই আমরা জানি না, কিন্তু ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্ব্বে এই দাসীর পরিবর্ত্তিত জীবন দেখিয়া শ্রীপরমহংসদেবের মনে যে সত্য উদিত হইয়াছিল, তাহা চিরন্তন, কারণ পিতামাতার প্রদত্ত নাম সাবিত্রী, তাহাদের কন্যার কর্ম্মবশে বিকৃতার্থ হইয়া তাহার ঐতিহ্য ও পরিচয় সমস্তই যেমন হারাইয়াছিল, সেইরূপ সাবিরূপী অনেক মানুষ আপন মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া নিজে বিষয়কূপে নিমগ্ন হইতে হইতে অপরকেও ধর্ম্মের ছলনায় সেই মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যায়। তাই শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন—

"গুরুগিরিও বেশ্যাগিরির মত!"

হিন্দু সমাজের অধঃপতনের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ধর্ম্মের শিথিল আদর্শই এই অবনতির প্রধান কারণ। বংশের একজন কুলতিলক হয়ত সাধনার দ্বারা আপনাকে জীবনের উচ্চ শিখরে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং নিজে পথ দেখিয়া অপরকে সেই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন সাধন-ভজনহীন পুত্র পিতার গৌরবের আসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মধ্বজী গুরুরূপে বংশপরম্পরায় দীক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিল এবং মন্ত্র প্রদান যখন অর্থোপার্জ্জনের অন্যতম সহজ পন্থারূপে পরিণত হইল, তখন হইতেই ধর্ম্মের এই বিকৃত আদর্শ হিন্দু সমাজের শক্তি ধীরে ধীরে অপহরণ করিতে লাগিল, তখন হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষ জগতের নিকট লজ্জিত ও উপহাসাস্পদ হইল। বিষয়াসক্ত গুরু দিন দিন অধঃপতিত হইতে লাগিলেন। যদি এই গুরুগিরির লোভ তাঁহার না আসিত, হয়ত একদিন না একদিন তাঁহার চৈতন্য হইত, আপনাকে জানিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারিতেন। কিন্তু গুরুর মিথ্যা-অভিমান-কলুষিত ও ভোগলিপ্সু মন ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া গুরুর সর্ব্বনাশ সাধন করিল, শিষ্য ক্রমে ক্রমে লুব্ধ গুরুর উপর আস্থা হারাইল এবং

গুরুদত্ত মন্ত্রের প্রতি সংশয়াপন্ন হইয়া অবশেষে বিনষ্ট হইল। এইরূপে দেশের ধর্ম্মবল ক্ষয় হওয়ায় নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু একদিন এই ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষকে ভগবানের মূর্ত্ত প্রতিনিধিরূপে ভারতবাসী গুরু বলিয়া বরণ করিত, তাঁহারা আপন মহিমায় সমাসীন হইয়া শিষ্যের পাপতাপকলুষিত জীবনের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন, আত্মার নির্ম্মল জ্যোতিতে শিষ্যের মনের দৈন্য ও অন্ধকার দূর করিয়া তাহাকে ভূমার আনন্দ প্রদান করিতে পারিতেন। এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াই সাধক গুরুপদে অভিষিক্ত হইতেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর জীবনের একটি ঘটনায় এই সত্য বিশদরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীলোকনাথ তখন বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন,—বিবিক্তসেবী, আপনার সাধনায় আপনি নিমগ্ন, কাহাকেও মন্ত্র প্রদান করিবেন না, ইহাই দৃঢ়সঙ্কল্প। এমন সময়ে এক যুবক একদিন বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিনের পর দিন যায়, নীরব একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা ভক্ত ভাবীগুরুর তপোভঙ্গ করিতে স্থিরসঙ্কল্প। গুরু ও শিষ্যের অভূতপূর্ব্ব সমর, গুরু শিষ্য গ্রহণ করিবেন না, শিষ্য গুরুকে সেবার দ্বারা জয় করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। শ্রীলোকনাথের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মলমূত্র ভক্ত স্বহস্তে ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন, জলের কলসী মস্তকে ধারণ করিয়া গুরুর কুটীরে লইয়া আসেন, সেবায় নিয়োজিত মন সিক্ত মস্তকের কথা ভুলিয়া যায়। অবশেষে ক্ষত হইয়া মস্তকে কীট জন্মিল, ভক্তের তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। একনিষ্ঠ সেবার আকর্ষণে শ্রীলোকনাথ সঙ্কল্পচ্যুত হইয়া ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। এই যুবক বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্রীনরোত্তম দাস। যখন শ্রীনরোত্তম গুরুর পদবন্দনা করিলেন, তখন শ্রীলোকনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কখনও শিষ্য করিব না—ইহাই আমার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু তুমি ভক্তির দ্বারা আমাকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি আমার আদি

মধ্য ও শেষ শিষ্য। এখন তোমার সমস্ত পাপ আমাকে দাও।” শ্রীলোকনাথের শেষের এই কথাগুলির মধ্যে—তোমার সমস্ত পাপ আমাকে দাও—মন্ত্রপ্রদানের অনিচ্ছার মূল কারণ নিহিত ছিল। শিষ্য পাপভার রাখিবার স্থান পাইল,—কিন্তু গুরু যদি সেই পাপ-গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে সেই ভারতলে নিষ্পেষিত হইয়া উভয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। শ্রীপরমহংসদেবও এই এককথাই বলিতেন—“মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ গ্রহণ কর্ত্তে হয়।” তিনি শিষ্য গ্রহণ করিবার সময় যে সমস্ত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অবশেষে শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণী শিষ্য বাছিয়া লইতেন তাহার মূলে এই একই বিশ্বাস ছিল—“গুরুকে শিষ্যের পাপ গ্রহণ করিতে হয়।”

এইরূপে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণের মধ্যে নিজ সাধনা পরিস্ফুট করিবার জন্য তাহাদের সমগ্র জীবনের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন আপনাকে কঠোর আদর্শের সম্মুখে রাখিয়া শিষ্যমণ্ডলীর জীবন সেই আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। সাধক এবং পণ্ডিতের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য। সাধক বাক্য এবং জীবনের দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, পণ্ডিতের বাক্যই সর্ব্বস্ব, বাক্য ও জীবনের মধ্যে সাধারণতঃ অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। তাই প্রকৃত গুরুর জীবনে শিথিলতার কোন অবকাশ নাই, সহস্র চক্ষু তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে, কোথাও কোন ত্রুটি হইলেই শিষ্যের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করিবে। তাই যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই—“As he spoke so he lived” (যে কথা তিনি বলিতেন তাহা তিনি নিজের জীবনে পালন করিতেন)। গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীপরমহংসদেবও ঠিক্ এই নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, “শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না, বাহিরে ত্যাগও চাই”। যখন সাধু একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার পক্ষে নিরাসক্ত মনই যথেষ্ট, কিন্তু যখনই

সেই সাধুর জীবন লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন শুধু নিরাসক্ত মন হইলেই চলিবে না, দেহকেও নিরাসক্ত না রাখিলে সাধারণ জীবের ধর্ম্ম-জীবনে শিথিলতার সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্মসমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্ম্য জীবনের যে শিখরে উঠিয়াছিলেন, সেখানে অধিকাংশ বাহ্যিক আচরণই নিরর্থক। বিধিপূর্ব্বক পূজাজপাদি দূরের কথা, উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণও সিদ্ধযোগীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। যোগী সততই ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন, বাহিরের কোন ক্রিয়া অথবা বাক্যের দ্বারা সেই তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন সংযোগকে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হয় না। তথাপি নামগ্রহণ, দেব-দেবী দর্শনে নতশির হইয়া প্রণাম, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমস্ত জল্পনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন, এই সমস্ত ধর্ম্মের বিধি লোকশিক্ষার জন্য শ্রীপরমহংসদেব নিজ জীবনে পালন করিতেন। তিনি বলিতেন, "পরমহংস অবস্থায় কর্ম্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্ব্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম্ম করে সে লোক শিক্ষার জন্য।" কিন্তু পরমহংসদেবের "লোক" বলিতে কয়েকটি শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণী শিষ্য মাত্র বুঝাইত। তাঁহার জগৎ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ গৃহী জীবগণ সেই সীমার ভিতর প্রবেশাধিকার কখনও লাভ করে নাই। তাই একদিন অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে তিনি বলিয়াছিলেন—"এখানে যা কিছু করা সে তোদের জন্য। আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্। আর আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি তো তোরা শালারা পাক্ দিয়ে দিয়ে তাই কর্‌বি।" এই গ্রাম্য ভাষা ও ভাবের ভিতর দিয়াই গুরুজীবনের অসীম দায়িত্ব পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইত। গুরু ষোল আনা আদর্শ পালন করিলে শিষ্য এক আনা মাত্রও পারিবে কিনা তাহাও অনিশ্চিত, সেখানেও "যদি" রহিয়াছে—"যদি তোরা এক টাং করিস্!" অথচ গুরু যদি আদর্শের এক অংশও শিথিল করিয়া দেন তাহা হইলে স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত শিষ্যগণ

সেই শিথিলতার প্রশ্রয়ে আদর্শের কোন্ নিম্নস্তরে নামিয়া যাইবে তাহার নির্ণয় নাই। এই বিশাল বিশ্বে কোথায় কোন্ কেন্দ্রে আকর্ষণী শক্তি কার্য্য করিতেছে, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই শক্তি শিথিল অথবা উদাসীন হয়, তাহা হইলে কত শত গ্রহনক্ষত্র নিমেষের মধ্যে কক্ষচ্যুত হইয়া পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সেইরূপ সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রীভূত গুরুকে সর্ব্বদাই সচেতন থাকিতে হয়, একবার দৃষ্টি অপসারিত করিলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রগণ ভ্রমণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই উচ্ছৃঙ্খলতার বিক্ষুব্ধ আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় হারাইয়া যাইবে, কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাই প্রকৃত সাধকের শিষ্যগ্রহণ ধর্ম্মজীবনের অসীম দায়িত্ব, নূতন সাধকের গুরুগিরি আধ্যাত্মিক বিলাসিতা মাত্র।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার সাধনা শিষ্যগণের মধ্যে সংক্রামিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাকেই ইংরাজিতে বলে "A thought in motion" অর্থাৎ যে চিন্তা ধারা এতদিন একটি মহান্ অন্তরের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবরুদ্ধ ছিল, সেই শক্তি এখন স্রোতোবেগে বাহির হইয়া শিখর হইতে শিখরে ছড়াইয়া পড়িল, গুহা হইতে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন এই একই সাধনায় অনুপ্রাণিত কয়েকটি জীবনকে লইয়া একটি ভক্তমণ্ডলী গঠিত হইল। কবীর বলিতেন, "করণী করে সো পুত্র হামারা, কথনী কহে সো নাতি" অর্থাৎ যে আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে সেই আমার পুত্র, যে ধর্ম্মালোচনায় নিমগ্ন সে আমার পৌত্র। এইরূপ পুত্র ও পৌত্রগণকে লইয়া শ্রীপরমহংসদেবের সংসার, ইঁহাদের কল্যাণ চিন্তায় তিনি সর্ব্বদাই জাগরূক, ইঁহাদের সঙ্গেই তাঁহার জীবন-যাত্রার নিগূঢ় পরামর্শ। একদিন ভবানীপুরের ঈশান মুখোপাধ্যায় নামে এক গৃহী ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে, তা হলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।" তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ যে উত্তর

দিলেন তাহাতে গৃহী ও অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে প্রভেদ পরিস্ফুট হইল, তাঁহার আদর্শ 'সবাই'এর জন্য নয় ইহাও ভক্তেরা বুঝিতে পারিলেন। "সবাই ত্যাগ কর্‌বে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনীকাঞ্চনে মুখ জুবড়ে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা, কোনটা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ?" এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, ত্যাগের মহান্ আদর্শ সকলের জন্য নয়, তাঁহার নির্ব্বাচিত কয়েকজনের জন্য মাত্র, অপর সকলে "শিয়াল কুকুরের মত কামিনী-কাঞ্চনে মুখ জুবড়ে" থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু কেবলমাত্র গুরুর তপঃপ্রভাবে শিষ্যের-জীবন গঠিত হয় না, আবার শিষ্যের ভক্তি থাকিলেও মন্ত্রসিদ্ধি না হইতে পারে। গুরু ও শিষ্য উভয়কে লইয়া শক্তির পরিপূর্ণতা। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, "ক্রিয়া হি বস্তুপহিতা প্রসীদতি" অর্থাৎ উপযুক্ত ক্ষেত্র না হইলে বীজ ফলপ্রসূ হয় না। শিষ্যনির্ব্বাচনে শ্রীপরমহংসদেব অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিতেন! যে শিষ্যকে যে বিশ্বাসে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শিষ্য সমগ্র জীবনে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে অথবা তাঁহার তিরোধানের পর, সেই বিশ্বাস কখনও ভঙ্গ করেন নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই শিষ্যগণ প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে দিগ্‌বিজয়ী বীর। ভক্তেরা বলেন যে, কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার লীলার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া অনুকূল অবস্থার মধ্যেই নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া যান। সব যুগেই এক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। শ্রীবুদ্ধদেব, শ্রীযিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তগণের যে সমস্ত শিষ্য ছিলেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মজীবনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, কেবল মাত্র গুরুর ভাস্বর দীপ্তির সম্মুখে তাঁহাদিগের জ্যোতি অপেক্ষাকৃত ম্লান হইয়া আছে। মহাপুরুষগণের দান গ্রহণ

করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রীজয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন, তখন সেই "মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণ নামাক্ষর" শুনিবার জন্য রাজা হইতে "মালীর দুহিতা" পর্য্যন্ত সকলেই উৎকর্ণ হইয়া ছিল।

একদিকে

জয়দেব ঠাকুর আর রাজা দুইজনে
বাগিচাতে থাকে কৃষ্ণকথা আলাপনে।

অন্যদিকে

মালীর দুহিতা এক বার্ত্তাকুর ক্ষেতে
বার্ত্তাকু উঠায় আর গায় (গীতগোবিন্দ) আনন্দেতে।

(ভক্তমাল)

ভগবানের বিধানে যুগে যুগে তাঁহার লীলাক্ষেত্রে গুরু ও শিষ্যের এইরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

গুরু ও শিষ্যের যোগাযোগ পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধের সহিত তুলনীয়। যেমন পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সেইরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়কে লইয়া ধর্ম্মের গৌরব। গুরু শিষ্যের ভিতরে শক্তিসঞ্চার করিয়া দিলে তবে গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনের বলে শিষ্য ক্রিয়াবান্ হইয়া জগতে মন্ত্র-শক্তি প্রচার করিতে সমর্থ হন। ভক্তগণের মধ্যে গুরু কর্ত্তৃক শক্তি-সঞ্চারণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তগোস্বামীর অন্যতম দাস রঘুনাথ এইরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

কাতর দেখিয়া প্রভুর দয়া উপজিল।
মুচ্‌কি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেম ভক্তি দিল।
নিজ পারিষদে প্রভু প্রধানে গণিল॥

(ভক্তমাল)
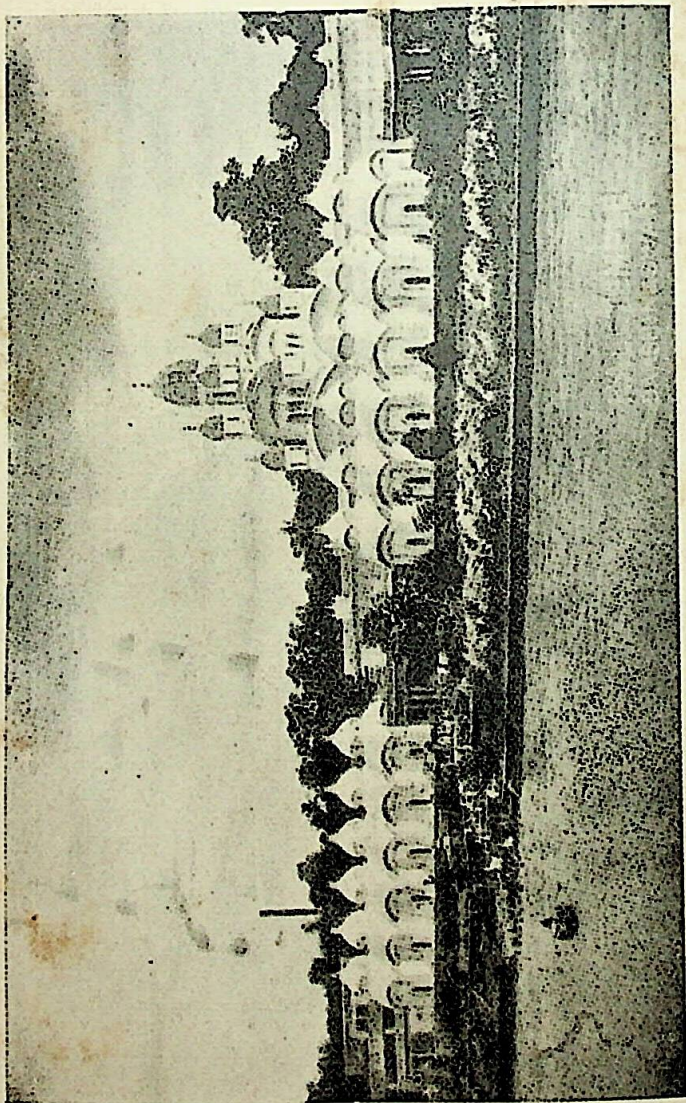
গঙ্গাবক্ষ হইতে
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

শ্রীসনাতনের ভিতর মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

তবে প্রভু সনাতনে বড় কৃপা কৈল।
শক্তি সঞ্চারিয়া নিজ তত্ত্ব জানাইল।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর সম্বন্ধে ভক্তমালে লিখিত হইয়াছে—

শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে
পশ্চিম দেশেতে কর ভক্তির প্রচারে।
পাঞ্জাব লাহোর আর মূলতানাদি করি
শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি।

(ভক্তমাল)

শ্রীপরমহংসদেব দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন এবং এই শক্তির প্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় সহস্র সহস্র ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ হন।

গুরুপদাভিষিক্ত শ্রীপরমহংসদেবের জীবনের আরও অনেক ঘটনায় তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রায়ই শিষ্য-দিগকে বলিতেন যে, তাঁহার নিবিড় সংস্পর্শে যে সকল লোক আসিয়াছে তাহাদের শেষ জীবন, আর পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী বেলা ৩ ঘটিকার সময় কাশীপুরের বাগানে তিনি অনেক ভক্তের বক্ষস্পর্শ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। এদিকে যে সকল ভাগ্যবান যুবক তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চ আধার, সুতরাং শ্রীপরমহংসদেবের দান গ্রহণ করিতে সমর্থ। এইরূপ একজন মাত্র শিষ্যের কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ আমরা শেষ করিব। শশীমহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের অন্যতম সর্ব্বত্যাগী যুবক। তাঁহার জীবনের একদিনের ঘটনা শ্রী"ম" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"শ্রীযুক্ত শশীর বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় প্রায় নয় মাস ধরিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া শশী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে বি-এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ইনি এণ্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধকও নিষ্ঠাবান। ইনি বাপমায়ের বড় ছেলে। তাঁহাদের বড় আশা যে ইনি লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের দুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্য ইনি সর্ব্বত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বল্‌তেন, 'কি করি, আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। হায়! মা বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না। তাঁরা কত আশা করেছিলেন! মা আমার গয়না পর্‌তে পান নাই, আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব। কিছুই হলো না। বাড়ীতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়। গুরুমহারাজ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন, আর যাবার জো নাই।"

স্নেহময়ী মাতাকে গহনা গড়াইয়া দিতে পারিল না বলিয়া পুত্রের দুঃখের সীমা নাই, মাতার কথা স্মরণ করিয়া কোমলপ্রাণ পুত্র কতদিন কাঁদিয়াছে, কিন্তু গুরুর আদর্শ যখন মনে পড়িতেছে তখন সব মোহ ও দুর্ব্বলতা কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, শিষ্য "বজ্রাদপি কঠোরাণি" হইয়া আপনার লক্ষ্যপথে অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বত্যাগী শিষ্য না হইলে শ্রীপরমহংসদেবের সাধনার ধন তিনি কখনও বিশ্বাস করিয়া দিয়া যাইতেন না, দিলেও সে শক্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও জাতিভেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যে ধর্ম্মসংসার স্থাপন করিলেন, তাহার ভিতর নানাজাতির লোক সমভাবে গৃহীত হইয়াছিল। যে বেতনভোগী পুরোহিত হীনজাতি বলিয়া রাণী রাসমণির অন্ন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মী ব্রাহ্মণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তর হইতেই শিষ্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করেন। এই ঘটনা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জাতিবিভাগ সম্বন্ধে আচার ও বিশ্বাসের প্রশ্ন স্বভাবতঃই উদিত হয়। কয়েকবর্ষ মাত্র পূর্ব্বে এই প্রশ্নই বাংলাদেশের কৌতূহলী ধর্ম্মসমাজে মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই তর্কবিচারে যোগদান করিয়াছিলেন। আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের প্রায় ষাট বৎসর পরে এই প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা যত দুরূহ বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে ইহা সেরূপ নহে। সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া সংস্কারশূন্য বুদ্ধিতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জাতিভেদ সমাজের কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অধীন বলিয়া মনে করিতেন না। নানাবিধ ক্ষেত্রে তাঁহার সুস্পষ্ট কথা, নিজধর্ম্মগোষ্ঠীর ভিতর তাঁহার ব্যবহার এবং পানভোজনাদির সময় তাঁহার অনুসৃত আচার লক্ষ্য করিলে এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না।

দেহত্যাগের তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেল গাছ, তালগাছ বড় হয়, বাল্‌তো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়োনা।" এই কথাগুলি হইতে জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সরল ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

সাধনের প্রথম অবস্থায় যখন দেহ ও মনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট থাকে, তখন দেহের শুচিতা রক্ষা করা প্রয়োজন, কারণ দেহ অশুচি হইলেই দেহাশ্রয়ী মন চঞ্চল হইয়া উঠিবে। কিন্তু সাধক যখন ধর্ম্মপথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, দেহ ও দেহীর পার্থক্য উপলব্ধি হইয়াছে, শুদ্ধমন দেহনিরপেক্ষ হইয়া দেহের অনেক উর্দ্ধে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তখন হীনজাতিস্পর্শ অথবা ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারহীনতা সেই আত্মজ্ঞানী পুরুষকে কলুষিত করিতে পারে না। যাহারা মনে করেন যে, জাতিবিচার পরিত্যাগ করিলেই সর্ব্বত্র সমদর্শন হওয়া যায় তাঁহারা কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া যান। সাধনের দ্বারা সমবুদ্ধি হইলে তারপর জাতিভেদ-জ্ঞান আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দিব্যদৃষ্টি সহকারে মানবের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই তাঁহার নিকট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অর্থহীন হইয়া গেল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ধ্যান কর্‌ছিলাম; ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে মন চ'লে গেল রস্‌কের বাড়ি। রস্‌কে ম্যাথর।……মা দেখিয়ে দিলেন ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোলমাত্র, ভিতরে সেই এক কুল-কুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র।" যাঁহার দৃষ্টি এত সূক্ষ্মগামী হইয়াছে, যিনি সমস্ত জীবকে একই সত্তায় সত্তাবান দেখিতেছেন, তাঁহার পক্ষে যজ্ঞসূত্র ধারণ করা যেমন নিষ্প্রয়োজন, অপরের জাতির হিসাব লওয়াও তেমনই নিরর্থক। কিন্তু দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানবের পক্ষে জাতিভেদ ও আহার্য্য বিচার প্রয়োজনীয় জানিতেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের সাধন জীবন গঠন করিবার সময় উপদেশ দিয়াছিলেন "তুই এখন কয়েকদিন কাহারও হাতে খাস্‌নি, নিজে রেঁধে খাস্‌। এ অবস্থায় বড় জোর নিজের মার হাতে খাওয়া চলে, অপর কাহারও হাতে খেলেই ঐ ভাব নষ্ট হয়ে যায়। পরে ঐটে (সাধন অবস্থা) সহজ হয়ে দাঁড়ালে তখন আর ভয় নেই।" নবীন শিষ্যকে যখন আহারের এই বিচার করিতে

উপদেশ দিতেছেন, সেই সময়ে ব্রহ্মভূত গুরুর নিজদেহে যজ্ঞোপবীত ছিল না, জননীর মৃত্যু হইলে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন নাই, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের বাড়িতে কে রন্ধন করিয়াছে তাহার সন্ধান না লইয়াই পংক্তিভোজন করিতেছেন, শিষ্যদিগকে মেঘমন্দ্রস্বরে বলিতেছেন, 'শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে ধন্য, আর হবিষ্য করে যদি কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে তাহ'লে সে ধিক্।" জাতিভেদের আবরণ যদি আপনি না খসিয়া পড়ে তাহা হইলে টানিয়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করিলে অন্তরে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

যে জাতিবিচার জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নবীন সাধকের প্রয়োজন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মনে করিতেন, সেই জাতিভেদ-বুদ্ধি ধর্মজীবনে অগ্রগতির প্রবল অন্তরায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। জাত্যভিমান অষ্টপাশের অন্যতম, ইহা যতদিন বিদ্যমান থাকে ততদিন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ঘনবনাচ্ছন্ন আমলকী বৃক্ষের পাদদেশে গভীর রাত্রিতে যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে বসিতেন। ধ্যানের সময় পাছে ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ধর্মচিন্তায় ব্যাঘাত উৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় সেই সময়ের জন্য বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সূত্রচিহ্ন তিনি দেহে ধারণ করিতেন না। একদিন তাঁহার ভাগীনেয় হৃদয় গোপনে ইহা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিতেছেন বলিয়া মামাকে মৃদু তিরস্কার করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়, এটা অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাকৃতে হ'লে ঐ সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকৃতে হয়, তাই ঐ সব খুলে রেখেছি; ধ্যান করা শেষ হ'লে ফির্‌বার সময় আবার পরব।" দেবীর সহিত সাময়িক যোগসংস্থাপন করিতে হইলেও বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের অভিমানচিহ্ন পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা এই সূত্রগ্রন্থিই আত্মার শুদ্ধ দৃষ্টিকে, আত্মসমর্পণের পথকে, অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। নীলাচলে শ্রীঅদ্বৈত-

প্রভুর কুটীরে শ্রীচৈতন্যদেব গমন করিলে ভক্তবর ঈশাননাগর মহাপ্রভুর পদধৌত করিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। প্রভু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ, আমার অপরাধ হইবে।' ঈশাননাগর ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উত্তর দিলেন, 'যাহা মহাপ্রভুর সেবার বিরোধী তাহার প্রয়োজন নাই।' বিনয়ের অবতার শ্রীচৈতন্যপ্রভু আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, ঈশান তাঁহার পদধৌত করিয়া কৃতার্থ হইলেন। জাতি-অহঙ্কারের চিহ্ন দেহে বর্ত্তমান থাকিতে আত্মসমর্পণ হইতে পারে না, কারণ আত্মসমর্পণ আত্মবিলোপন সাপেক্ষ, আবার আত্মসমর্পণ না হইলে সেবার সম্পূর্ণ অধিকারী হওয়া যায় না। জাতিবুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান পরস্পর বিরোধী, একের অস্তিত্ব থাকিতে অপরের উদয় হওয়া সম্ভব নহে।

গুণকর্ম্ম বিভাগের ফলে যে চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বর্ণভেদ জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতে বিলুপ্ত হইলে শুদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ভক্তজাতি রজঃ ও তমোগুণের অধীন নহে, সুতরাং পরিশুদ্ধ আত্মাতেই যাঁহাদের পরিচয়, সেই মনুষ্যকুল-তিলকগণ সাধারণ জাতিবিভাগের উর্দ্ধে অবস্থান করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। ভক্ত একটি পৃথক্ জাতি।' সাধক তুলসীদাস সেই এককথাই বলিয়াছেন—

চারিজাত মিলে হরি ভজিয়ে এক বরণ হো যায়।
অষ্ট ধাতুমে পরশ লাগায়ে এক মূল মে বিকায়॥

(হরি ভজন করিলে চতুর্বর্ণ একবর্ণ হইয়া যায়, যেমন স্পর্শমণির স্পর্শ লাগিলে অষ্টধাতুই সোণার মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।)

তাই আমরা দেখিতে পাই গুরু সামাজিক জীবনে কি জাতি ছিলেন, শিষ্য তাহার সন্ধান করে না। নীচজাতিসম্ভূত সাধক আপন সাধনার

বলে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিলে তাঁহার সমুজ্জ্বল আত্মার সম্মুখে শিষ্যগণ তদীয় শরীরের পরিচয় লইতে বিস্মৃত হইয়া যায়। শ্রীনরোত্তমদাস যখন হরিনাম বিতরণ করিতেছিলেন তখন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ এই হীনজাতি-সম্ভূত মহাপুরুষের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অন্যতম। ব্রাহ্মণ হইয়াও ইতরজাতির শিষ্য বলিয়া গঙ্গানারায়ণকে নীরবে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। কিন্তু শ্রীনরোত্তমদাস দেহত্যাগ করিবার জন্য গঙ্গাতীরে অন্তিমশয্যা গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অক্ষম বিবেচনায় ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ যখন সেই মৃতকল্প সাধুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, তখন গুরুনিন্দা-অসহিষ্ণু গঙ্গানারায়ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নির্ব্বিকার, নিশ্চলদেহ গুরুর পাদদেশে বসিয়া গঙ্গানারায়ণ রোদন করিতে করিতে বলিলেন—'প্রভু, কত পাষণ্ড উদ্ধার করিয়াছ, এখন এই যে অবোধ ব্রাহ্মণগণ তোমার নিন্দা করিয়া আপনাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে ইহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া ইহাদিগের দণ্ড কর।' শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় গুরু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহারাই অবশেষে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া শুদ্ধাত্মা ভক্ত বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরও উর্দ্ধে অবস্থিত, ইহাই প্রতিপন্ন করিল। ভগবৎ দর্শনলাভ সাধুর নূতন জন্ম সূচিত করিয়া থাকে, সুতরাং তখন হইতে পূর্ব্বের দেহসংশ্লিষ্ট জীবনবৃত্তান্ত অথবা জাতিচিহ্ন তাঁহার পক্ষে নিরর্থক হইয়া যায়। ভক্তমালে লিখিত হইয়াছে—

পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে
বিবাহ হইলে স্বামিগোত্রে প্রবর্ত্তকে।
তথা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা মাত্রে শ্রেষ্ঠ হয়
নীচত্ব শূদ্রত্ব তেজি দ্বিজত্বকে পায়॥

এই কারণেই যোগিরাজ গম্ভীরনাথজী নিজ পিতামাতা অথবা জন্মস্থানের কখনও উল্লেখ করিতেন না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া যখন কেহ তাঁহাকে জন্ম অথবা বাল্যজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিত তখনই তিনি বলিতেন, 'প্রপঞ্চ সে ক্যা হোগা।' অর্থাৎ এই সকল সাংসারিক বিষয় জানিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

সাধুগণের জীবন ও বাণী অনুধাবন করিলে জগতের ভক্তগণ যে একজাতির অন্তর্ভুক্ত ইহাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শ্রীবুদ্ধদেব, শ্রীযিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগাবতারগণ বিভিন্নদেশে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইলেও "The still sad music of humanity" অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির বেদনার নীরব সঙ্গীত, তাঁহাদের হৃদয়বীণায় সমভাবে আঘাত করিয়াছিল, একই সত্য তাঁহারা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, একই উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের সকল প্রচেষ্টার মূলে নিহিত ছিল। আত্মার অমরদীপ্তিতে তাঁহাদের বর্ণবৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শত সহস্র বৎসর পরেও তাই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানুষ এই সমস্ত মানবরূপী জ্যোতির্ম্ময়গুলীর সম্মুখে বারংবার মস্তক অবনত করিতেছে। কপিলাবস্তু নগরীর ধূলি আজ কোথায় আকাশে মিশাইয়া গিয়াছে, সে সিংহাসন, সে রাজপ্রাসাদ আজ নাই, কিন্তু 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই মহাসত্যের পুরোহিত এখনও জগৎ জুড়িয়া মানবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। কোথায় সেই রোমজাতি যাহাদের গগনস্পর্শীঅহঙ্কার পতঙ্গের মত অসীম দুর্লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছিল, যাহাদের বীরেরা সেই অহঙ্কারের কীর্ত্তি প্রতিমা অমর করিবার জন্য জয়স্তম্ভ তুলিয়াছিল, কবিগণ জীবনের সুখ-দুঃখকে তুচ্ছদিনের উর্দ্ধে ধরিয়া মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন! বাণীপুত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আজ 'ভেঙ্গে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ, নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য, বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্দ্ধিত জাতির ইতিহাস।'

কিন্তু যে শিশু সেই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে দীনাতিদিনের ন্যায় একজীর্ণ অশ্বশালায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই শ্রীযিশুখৃষ্টের 'শত্রুকেও ভালবাসিবে' এই বিশ্বপ্রেমের বাণী সহস্র সহস্র শতাব্দীর পরেও প্রতি শুদ্ধ হৃদয়ে আজিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দিগ্বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের রঙ্গভূমি নবদ্বীপ হয়ত আজ গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত, ন্যায়ের জটিল তর্ক আজ সেই নগরীতে কোলাহলের সৃষ্টি করে না, দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থী যুবকগণ এখন আর সেখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসে না, কিন্তু শাস্ত্রসিন্ধুমন্থন করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু 'জীবে দয়া ও নামে রুচি'—এই যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা 'বিষয় বিষমতৃষ্ণা'-নিপীড়িত চঞ্চলবুদ্ধি জীবগণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া আজিও সর্ব্ববাদীসম্মত। দক্ষিণেশ্বরের তপোবন আজ শব্দমুখরিত বিপণিক্ষেত্রে পরিণত, মন্দিরের উপরে শ্রীপদে আবদ্ধ পাঁইজরের নূপুরধ্বনি চির দিনের জন্য স্তব্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্যময়ী ঈশ্বরী আজ আমাদের সম্মুখে পাষাণ প্রতিমা! কিন্তু সেই ভাগীরথীতীরে কামিনীকাঞ্চনত্যাগের যে মহান্ আদর্শ একদিন প্রচারিত হইয়া ভোগবিলাসে আকণ্ঠনিমগ্ন কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে চিন্তালহরীর সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই উজ্জ্বল আদর্শ আজিও পূর্ব্বে পশ্চিমে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহস্রধারায় নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। অহিংসা, বিশ্বপ্রেম, নামরূপীব্রহ্ম, বিষয়-বৈরাগ্য সকলই একসূত্রে গাঁথা সত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং জীবনে একই ব্রত গ্রহণ করিয়া, একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ও একই সত্তায় সত্তাবান হইয়া এইরূপ মহাপুরুষগণ 'মহাপুরুষজাতি' বা 'ভক্তজাতি' আখ্যায় জগতে পরিচিত হইয়াছেন। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের জন্যই 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।' কিন্তু যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে রতি নাই, যজ্ঞসূত্র তাহার রজ্জুখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছেন, 'আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ

কর্‌ছে। তা দেখেছি অর্দ্ধেক পাতা উল্‌টে যাবে।' এইরূপ বিবেকবুদ্ধি-বিহীন ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভয়া গলে লাপট সূত।
তাও ভক্তিকা মরম না জানে জ্যায়সে জঙ্গলীভূত॥

(গলায় উপবীত থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যদি ভক্তিবিহীন হয় তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ জঙ্গলীভূতের সমান।)

কিন্তু ভজনপূজনের দ্বারা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে শ্বপচোঽপি দ্বিজাধিকঃ' (চণ্ডালও দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ), ইহা পণ্ডিতদিগের অভিমত।

এইরূপে দেহবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া যাঁহারা আত্মারাম হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে জাতিবিচারের সাধারণ মানদণ্ড অপ্রযোজ্য, ইহা সাধু ও শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত হইয়াছে, ভক্তের জাতিবিচার নিরর্থক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীহরিদাস নীচ যবনকুলে, প্রহ্লাদ দেবদ্বেষী দৈত্যকুলে এবং হনুমান অধম কপিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাতিকুল সর্ব্ব নিরর্থক বুঝাইতে
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে।
এ সকল বেদ বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।
প্রহ্লাদ যে হন দৈত্য, কপি হনুমান
সেই মত হরিদাস নীচজাতি নাম॥

ভক্তের জাতিবিচার করিয়া দ্রৌপদী একবার বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন। বাল্মীকি নামে জনৈক ভক্ত চণ্ডাল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে

নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে দ্রৌপদী নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যাদি পাত্রে করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। দরিদ্র বাল্মীকি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুস্বাদু ব্যঞ্জনসমূহ কোন্‌টীর পর কোন্‌টী খাইতে হয় তাহা না জানিয়া ইচ্ছামত কিছু কিছু ব্যঞ্জন তুলিয়া ভক্ষণ করিলেন। অতিথি চণ্ডালজাতিসম্ভূত বলিয়া আহারের পর্য্যায় ব্যতিক্রম করিয়াছেন—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দ্রৌপদীর মনে ভক্তের প্রতি অবজ্ঞার উদয় হইল।

দ্রৌপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময় ॥
হেন পরিপাটীরূপে রন্ধন করিল
নীচকুলে জন্ম খাবার ক্রম না জানিল ॥

(ভক্তমাল)

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের আহারের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে আশা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু শঙ্খধ্বনি হইল না।

বেত্রাঘাত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয় ॥
হাঁরে মূঢ়মতি তুমি ধর্ম্ম নাহি জানো
বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজো কেনো ॥

তখন—

শঙ্খ কহে অবিচারে রোষ আমা প্রতি
বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিলা দ্রৌপদী ॥

দ্রৌপদীর অপরাধে শঙ্খের শাস্তিবিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুঃখিত হইলেন; পাঞ্চালী নিজ কলুষিত মনের নগ্নচিত্র সর্ব্বসমক্ষে উন্মোচিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মর্ম্মাহত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সহিত ব্যবহার এই একই বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। তাই সুবর্ণবণিক্‌ অধর তাঁহার আপনার লোক। একদিন অধরের বাড়িতে ভক্তদের আহারের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া

ব্রহ্মণ্যাভিমানী কোন কোন শিষ্য সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন কিন্তু যখন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ সেইখানে আনন্দসহকারে ভোজন করিলেন, তখন তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন শুনিয়া শ্রীপরমহংসদেব কলিকাতা ঠনঠনিয়ায় দেবীর নিকট তাঁহার আরোগ্যের জন্য ডাব ও চিনি মানৎ করিয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ রোদন করিয়া বলিয়াছিলেন, ভক্ত কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তিনি আর কাহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের লেখক মহেন্দ্রনাথ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য আহার করিতেন, অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতে যাইয়া তাঁহার হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যবৃন্দের তালিকায় তাঁহার নাম চিরদিনই বর্ত্তমান ছিল অথচ কোন কোন বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মণের অধিক সমাদর পাইতেন। সাধারণতঃ শ্রীপরমহংসদেব নিজের জন্য রক্ষিত ভোজ্যদ্রব্য হইতে অপরকে অগ্রভাগ তুলিয়া খাইতে দিতেন না, তিনি অন্নব্যঞ্জনাদি প্রথমে দেবীকে নিবেদন করিয়া তবে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রথম যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জন্য রক্ষিত অন্নব্যঞ্জনাদি হইতে নরেন্দ্রনাথকে অগ্রভাগ তুলিয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন সেদিন তাঁহার চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া তদীয় সহধর্ম্মিণী ও উপস্থিত ভক্তগণ সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। কামনা-কলুষিত বলিয়া মাড়োয়ারী-প্রদত্ত মিষ্টান্ন তিনি অন্যান্য শিষ্যগণকে খাইতে দিতেন না, কিন্তু তাঁহারই আদেশে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল সেই মিষ্টান্ন বহন করিয়া কলিকাতায় নরেন্দ্রনাথকে দিয়া আসিতেন। শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের

তারতম্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ব্যবহারপার্থক্যের মূলদেশে নিহিত ছিল। শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রহ্মচারিশিষ্য শ্রীকুলদানন্দ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান কালে ভোজ্যদ্রব্যাদি গুরুকে পরিবেশন করিবার সময় সুস্বাদু ব্যঞ্জনগুলি একটু অধিক মাত্রায় তাঁহার পাত্রে প্রদান করিয়াছিলেন, মনের গোপন কোণে কোথায় লোভ লুক্কায়িত ছিল যে, গুরুর সেবা শেষ হইলে পাত্রের অবশিষ্ট ব্যঞ্জনগুলি শিষ্যের রসনার তৃপ্তি-সাধন করিবে। ব্রহ্মচারীর প্রচ্ছন্ন লালসা লক্ষ্য করিয়া শ্রীবিজয়কৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে দিলে এঁটো বস্তু দেওয়া হয়। খেয়ে আহারে তৃপ্তি হয় না, ক্ষুধাও মিটে না।' ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের তখন চৈতন্য হইল। তমঃপ্রসূত লালসা ব্রহ্মচারীর সত্ত্ব-গুণকে আচ্ছন্ন করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে কলুষিত করিয়াছে সুতরাং তাঁহার স্পর্শ ভোজ্যদ্রব্যকে উচ্ছিষ্টে পরিণত করিতেছে, ইহাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সাধারণ স্থূলদৃষ্টি দেহের অবস্থাই লক্ষ্য করিয়া থাকে, মনের ভিতর প্রবেশ করিবার শক্তি তাহার নাই, সুতরাং সমাজে দেহস্পর্শজনিত কলুষিতাই একমাত্র বিচারের বস্তু। কিন্তু যাঁহার পরিশুদ্ধ দৃষ্টি দেহের অন্তরালে মনকেও দেখিতে সমর্থ, সেই তত্ত্বদর্শী সন্ন্যাসী মনের অবস্থা দিয়াই শুচি ও অশুচির বিচার করিয়া থাকেন। তাই সত্ত্বগুণের পরিস্ফুরণের জন্য ব্রাহ্ম, বৈদ্য, কায়স্থ ও সুবর্ণবণিক সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মণের ন্যায়, কখনও বা ব্রাহ্মণের অধিক, সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাধুদের লৌকিক আচরণ লক্ষ্য করিলে ভক্তগণ যে বর্ণাশ্রমবিভাগের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তাঁহারা সকলে এক জাতি—ভক্তজাতি—এই সত্য সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, জীবের ভিতর ভগবান অগ্নিরূপে রহিয়াছেন বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত লোককে আহার করাইলে অগ্নিরূপী ভগবানকে আহুতি দেওয়া হয়। কিন্তু অসৎ লোককে ভোজন

করান তিনি কখনও অনুমোদন করিতেন না। "যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।" ভাষার তীব্রতা হইতেই বুঝা যায় যে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অসদাচারী সকলের সম্বন্ধেই এই নিষেধ প্রযোজ্য ছিল। একবার তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় সিওড় গ্রামে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নানাবর্ণের বিষয়ী লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "দেখ্ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস্ তবে এই তোর বাড়ি থেকে চল্লুম।" অথচ তিনি অনেক ক্ষেত্রে নরেন্দ্র প্রভৃতি সত্বগুণী শিষ্যগণকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইবার জন্য পরিচিত কোন কোন ধনী গৃহীকে অনুরোধ করিতেন। সুতরাং সামাজিক প্রথানুযায়ী ব্রাহ্মণ-ভোজনই ধর্ম্ম বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন না, মনে যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সেবাই গৃহস্থের পক্ষে কল্যাণপ্রদ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভক্তপ্রবর তুলসীদাস এই এক কথাই বলিয়াছেন।

খান খরচন বহু অন্তরা মনকে দেখ বিচার।

এক খাওয়ায়ে সাধকো এক মিলাওয়ে ছার॥

(মনে মনে বিচার করিয়া দেখ খাওয়াইয়া খরচ করিবে তাহাতেও বহু অন্তরায় বিদ্যমান। এক ব্যক্তি সাধুকে ভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জ্জন করে, আর এক ব্যক্তি দুষ্টলোককে খাওয়াইয়া তার শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দেয়।)

দুষ্টব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া তাহার তমোগুণ বৃদ্ধি করাইলে সমাজ অথবা ধর্ম্ম উভয়েরই অনিষ্টসাধন হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীতুলসীদাসের অভিমত ছিল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈতপ্রভুর জীবনের একটি অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। যবন হরিদাস যখন শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রায়ই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। ইহাতে পাছে কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজ বিরূপ হয় এই আশঙ্কায় শ্রীহরিদাস

তাঁহার আপত্তি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কর্ণগোচর করিলেন। কিন্তু আচার্য্য ইহাতেও বিচলিত হইলেন না।

আচার্য্য কহেন "তুমি না করিহ ভয়॥
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন"॥

এইরূপ আচরণ সাধুদিগের জীবনে অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সত্যনিষ্ঠাই মানবকে জীবনের উচ্চস্তরে লইয়া যায়, ইহা প্রতিপন্ন করিতে ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের নিপুণ হস্তে এই নীরস আখ্যায়িকা ছন্দোবদ্ধ হইয়া "ব্রাহ্মণ" নামে বাংলাদেশের পাঠকগণের নিকট পরিচিত। মহাকবি কাহিনীটিকে হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য কোন কোন স্থানে কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিলেও মূল আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

সত্যকাম নামে এক বালক মহর্ষি গৌতমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে আসিয়াছে। মহর্ষি তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণ ব্রহ্মবিদ্যায় একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। সত্যকাম নিজ গোত্রহীন জন্মের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইল না, কিছুই গোপন করিল না, জননীর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই যথাযথরূপে মহর্ষির নিকট নিবেদন করিল।

"ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি—সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি।"

লজ্জাহীন অনার্য্যের ধৃষ্টতা দেখিয়া মহর্ষির ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ হয়ত সেদিন বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু যে গুরু সত্যকে বরণ করিয়াই মহর্ষি হইয়াছিলেন, তিনি সত্যকামের এই নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করেন নাই।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।'

কুলশীলের পরিচয়বিহীন বালকও ব্রহ্মর্ষিপ্রদত্ত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া বর্ণের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল। আত্মা সামাজিক জাতিকুলের নিয়মাধীন নহে, ইহা স্বাধীন ও অনন্ত উন্নতিশীল, একবার সেই শুভ্র-জ্যোতির স্ফুরণ হইলে দেহ ও মন কিছুই মলিন থাকে না। যাঁহারা এ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে সামাজিক জাতিবিভাগ বিলুপ্ত হইয়া নূতন করিয়া ভক্তজাতির সৃষ্টি হইবে ইহা বিচিত্র নহে। এই জন্য সত্যসন্ধী বালক গোত্রহীন হইয়াও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই একই কারণে গঙ্গানারায়ণ ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্রবংশজাত শ্রীনরোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন, হরিদাস যবনবংশসম্ভূত হইয়াও বৈষ্ণবসমাজে চিরপূজ্য, কায়স্থবংশোদ্ভূত নরেন্দ্র এই একই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বহু ব্রাহ্মণশিষ্যের উর্দ্ধে সহস্রদলপদ্ম বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিলেন। আনন্দ সত্যের অপর একটি রূপ মাত্র এবং এই আনন্দের উদয় হইলে সাধারণ জাতিবিচার-বুদ্ধি মন হইতে কোথায় তিরোহিত হইয়া যায়। এই আনন্দলিপ্সা বিকৃত হইয়া জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবকে অধিকার করিলে আনন্দের আশায় ইন্দ্রিয়সুখপ্রয়াসী মূর্খ যখন "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" হইয়া পরস্ত্রী দেহের প্রতি ধাবিত হয়, তখন জাতি বিচার করিবার অবসর তাহার থাকে না। বারির আশায়

মরীচিকার প্রতি ধাবিত হইলেও ক্ষণকালের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত বলিয়া নারীদেহের জাতিবিচার তাহার মনে উদিত হয় না। যে বিষয়ী লোক কুটিল সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ঘাত-প্রতিঘাতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে যখন সংস্কারবিহীন মূঢ় শিশুর সরল মনের নিকট আশ্রয় লইয়া আত্মবিস্মৃতির আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে তখন সেই শিশুর জাতির সন্ধান সে কখনও করে না। পরনারীর দেহ এবং শিশুর মন যে কারণে মানুষকে সমাজের জাতিবিভেদের কথা ভুলাইয়া দেয়, ঠিক সেই কারণেই শিষ্য নির্ব্বাচনের সময় গুরু, গুরুবরণ করিবার সময় শিষ্য, সাধারণ জাতিবিচার বুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া আনন্দগ্রহণ ও প্রদান করিবার শক্তির দ্বারাই আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অবশ্য দেহ, মন ও আত্মার মধ্যে যে পার্থক্য, ইন্দ্রিয়-বিলাসী, বিষয়ী অথবা সাধুর মধ্যে সেই পার্থক্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান। কিন্তু সকলের মূলে সেই আত্মোৎসর্গ, সেই আনন্দলিপ্সা, সেই আত্মবিস্মৃতি। কেহ ভ্রান্তপথে, কেহ বা সত্যপথে সেই একই বস্তুর সন্ধানে ফিরিতেছে, সেইজন্য আচরণ একই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' হইয়া গুরুরূপে শিষ্যদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই তাঁহার নিজের জীবনে তিনি সাধারণ জাতিবিচারের নিয়মগুলি পালন করেন নাই, কিন্তু শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা তখনও ধর্ম্মের নিম্নস্তরে অবস্থান করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধনা করিতেছিলেন তাঁহাদের পক্ষে জাতিবিচার প্রয়োজনীয়, ইহাই তিনি বারংবার বলিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ

জাতিবর্ণনির্বিশেষে এই সমস্ত শিষ্যবৃন্দকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিগ্বিজয় আরম্ভ হইল। সভাসমিতি নাই, সংবাদপত্রে কোন ঘোষণা নাই, আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি নাই অথচ লোকের মুখে মুখে কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই মহাপুরুষের কথা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভক্তগণের আকর্ষণে শ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যপরিবেষ্টিত সাধুকে দেখিয়া সেই পল্লীবাসী সুরসিক গৃহীগণ বলাবলি করিতেন "পরমহংসের ফৌজ আস্‌ছে।" ক্রমে ক্রমে ইহা ঠাকুরের কর্ণগোচর হইলে তিনি হাস্য করিয়া বলিতেন "শালারা বলে কি? পরমহংসের ফৌজ আস্‌ছে!" এইরূপে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে কথাগুলি কৌতুকের অবতারণা করিত একদিন কালক্রমে সেই কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য হইবে ইহা তখন কেহই জানিতে পারে নাই। আজ তাঁহার সৈন্যমণ্ডলী দেশ দেশান্তর অধিকার করিয়াছে, তাঁহার বাণী মেঘমন্দ্রস্বরে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার সেনানী-গণ আশা করিতেছেন যে, একদিন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীপরমহংসদেবের "ফৌজ" মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞানতা, জাতিবিদ্বেষ এবং বিচিত্র মানবহৃদয়ও প্রতিমুহূর্ত্তে জয় করিতেছে। ইংরাজ কবি মিল্টনের কথা আজ ভারতের সর্ব্বত্যাগী সাধুর জীবনে সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

Peace hath her victories no less renowned than war (শান্তির বিজয়গৌরব যুদ্ধের বিজয়গৌরব অপেক্ষা কম নহে)

কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন সাধুপ্রকৃতি লোক বাস করেন শুনিলেই শ্রীপরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু

"ভাললোক" দেখিতে যাইয়া সময় সময় তাঁহাকে বেশ বিব্রত হইতে হইত। বাগ্ বাজারে দীননাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ধার্ম্মিক লোক বাস করেন শুনিয়া শ্রীপরমহংসদেব আপনাকে সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য সারথি মথুরকে অনুরোধ করিলেন। মথুরের প্রাণ একজনের সত্তাতেই পরিপূর্ণ, সুতরাং অন্য সাধু দেখিবার স্পৃহা তাঁহার ছিল না, তথাপি ঠাকুরের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিতেন না। সুতরাং মথুর একদিন শ্রীপরমহংসদেবকে সঙ্গে লইয়া বাগবাজারে উপস্থিত হইলেন। দীননাথের বাড়িটী অত্যন্ত ছোট ছিল, তাহার উপর মথুরের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইদিন দীননাথের ছেলের উপনয়ন। জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়িতে স্থানাভাব। অবশেষে বিব্রত হইয়া মথুর ঠাকুরকে লইয়া নিকটস্থ যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে গেলেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল সুতরাং গৃহস্বামী ব্যস্ত হইয়া মথুরকে বাধা প্রদান করিলেন। রাজজামাতা মথুরের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল, দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, আর তোমার কথা শুন্‌ছি না।" কিন্তু সকল সময়েই এইরূপ প্রহসনের সৃষ্টি হইত না। তদানীন্তন যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সহিত শ্রীপরমহংসদেব নিজে যাইয়াই দেখা করিয়াছিলেন অথবা যাঁহারা তাঁহার গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, কর্ম্মবীর কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই মহারথীগণের নাম বঙ্গদেশে আবাল-বৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত, সুতরাং ইঁহাদের সহিত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কিরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা জানিবার কৌতূহল সহজেই মনে উদিত হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক্ কোন্ সময়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। সঙ্গে মথুর ছিলেন। মথুর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, অতএব অনুমান হয় যে, ১৮৬৮ অথবা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের কোনও সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ মহর্ষির নিজবাটীতে শ্রীপরমহংসদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতার প্রধান ধনীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ ভোগৈশ্বর্য্যপরিবেষ্টিত হইয়াও মহর্ষির মন ভগবদ্মুখী ছিল বলিয়া তিনি শীঘ্রই ধর্ম্মসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের নেতা বলিয়া তাঁহার নাম ও সাধনার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার উপকণ্ঠে নিবিড়বনরাজিসমাবৃত দক্ষিণেশ্বরেও মহর্ষির ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা প্রবেশ করিয়াছিল। তাই একদিন তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে অনুরোধ করিলেন। এক্ষেত্রে মথুর সহজেই সম্মত হইলেন, কারণ বনিয়াদীধনীবংশসম্ভূত দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাইতে ঐশ্বর্য্যাভিমানী মথুরের আত্মমর্য্যাদায় কোথাও আঘাত লাগিল না। বিশেষতঃ উভয়ে একসময়ে একই কলেজে সহপাঠীরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সুতরাং মথুর প্রসন্নমনে শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া অধুনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ধনী সমাজের শীর্ষস্থানীয় দেবেন্দ্রনাথের অতিথিঅভ্যাগতের প্রতি সামাজিক আচরণ আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি হাস্যমুখে কৌতুক করিয়া মথুরের পদমর্য্যাদাসূচক স্ফীত ও পরিপুষ্ট উদরের উল্লেখ করিলেন এবং সরল ও অমায়িক ব্যবহারে মথুরকে প্রীত করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাস ছিল যে, ভগবৎচিন্তা করিয়া অনুভূতি আরম্ভ হইবামাত্র কিছু কিছু শারীরিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ

সাধকের বক্ষঃস্থল দীপ্তোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাই সাধনজীবনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। তাঁহার নিজেরও সাধনার সময় এইরূপ হইয়াছিল। সুতরাং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীপরমহংসদেব মহর্ষিকে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত প্রথম পরিচয়ের দিনে নিজদেহের আচ্ছাদন অপসারিত করিতে মহর্ষি সম্মত হইলেন ইহা সত্যসত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু মথুরের সহিত মহর্ষির বন্ধুতাই বোধ হয় এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, মহর্ষির গৌরবর্ণ বক্ষ হইতে রক্তবর্ণ আভা নিঃসৃত হওয়ায় দেহের উপরিভাগ যেন সিন্দুর অবলেপিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সাধকের এই লক্ষণ দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রীত হইলেন।

কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হইল মহর্ষির হৃদয়ে তখনও আত্মাভিমানের ছায়া রহিয়াছে। ঠাকুর ভাবিলেন ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সম্মান মহর্ষিকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে সুতরাং অভিমান থাকিলেও তাহা উপেক্ষণীয়। তিনি দেখিলেন, মহর্ষির যোগ ও ভোগ উভয়ই আছে, সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের বিশ্ববিজয়ী পুত্র একদিন ছন্দোবদ্ধ ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষে এক নূতন চিন্তাধারা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, তাহা মহর্ষির জীবনের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের ভাষার বন্ধনে চিরন্তনরূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

তাই বিস্মিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, "অনেক ছেলেপুলে ছোট ছোট, ডাক্তার এসেছে।" তাঁহার বন্ধনবিহীন নিজ ধর্ম্মজীবন হইতে এই দৃশ্য কত পৃথক!

পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষির সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন "অত জ্ঞানী হয়ে সংসারে সর্ব্বদা থাক্‌তে হয়! বল্লুম্, তুমি কলির জনক, —'জনক এদিক্ ওদিক্ তুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি, আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও। অনেক কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র খুসী হয়ে বল্লে, আপনাকে উৎসবে আস্‌তে হবে। আমি বল্লাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার তো এই অবস্থা দেখছো, কখন কি ভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বল্লে, না আসতে হবে; তবে ধুতি আর উড়ানি প'রে এসো, তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু ব'ল্লে আমার কষ্ট হবে। আমি বল্লাম, তা পারব না। আমি ·বাবু হতে পার্‌বো না। দেবেন্দ্র, সেজবাবু, সব হাস্‌তে লাগল। তার পরদিনই সেজবাবুর কাছে দেবেন্দ্রর চিঠি এলো —আমাদের উৎসব দেখতে যেতে বারণ ক'রেছে। বলে, অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না।" ইহা হইতেই মহর্ষির ধর্ম্মজীবন ও শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। বিশিষ্ট ধনীসমাজে প্রচলিত শিষ্টাচারের এক কণিকাও ধর্ম্মের নামে ক্ষুণ্ণ হইবার উপায় ছিল না, সংসারী-জীবনের ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যগুলিও নিয়মিত পালন করিতে হইত, সংসার, সমাজ ও ধর্ম্ম সবই এক মহাবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত, ঈশ্বরের জন্য কাহাকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয় না। এদিকে শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন যে, অমৃত সন্ধান করিতেছি শুধু মুখে বলিলে চলিবে না, সংসারতীরে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ-পারাবারে ডুব দিতে হইবে, সংসার নাই, সমাজ নাই, শিষ্টাচারের অনুরোধ নাই, আছে শুধু সাধকের একমুখী আত্মা ও তাহার সম্মুখে অনন্ত শান্তিপারাবার। সুতরাং যেখানে মতের এত পার্থক্য, সেখানে পরিচয় একদিনের দেখাশুনায় শেষ হইয়া যাইবে ইহা বিচিত্র নহে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত শ্রীপরমহংসদেবের পরিচয় বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ মার্চ্চ মাসে বেলঘরিয়ার বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের প্রথম দর্শন হয়। এই দর্শনের পূর্ব্বে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। একদিন সমাধি অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন একঘর লোক বসিয়া আছে, তাহাদের সম্মুখে কেশবচন্দ্র যেন একটি ময়ূরের মত পাখা বিস্তার করিয়া বিরাজমান। পাখা তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। আরও দেখিলেন, মস্তকে লালমণি পরিশোভিত কেশবচন্দ্র নিজ শিষ্যগণকে বলিতেছেন, "ইনি কি ব'ল্ছেন, তোমরা সব শোনো।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ আধ্যাত্মিক পরিচয় শারীরিক দর্শনের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ হওয়ায় উভয়ে বিভিন্নসমাজভুক্ত হইলেও চন্দ্রের আলোকবেষ্টনীর মধ্যে নক্ষত্রের মত কেশবচন্দ্র তখনও সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত। কিন্তু ধর্ম্মপথের পথিক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁহার কথা অবিদিত ছিল না—আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সাহায্যে তিনি পূর্ব্বেই কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাই একদিন নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠাইয়া কেশবের সন্ধান লইলেন এবং ভাগীনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ার বাগানে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "এঁরই ন্যাজ খসেছে, ইনি জলেও থাক্‌তে পারেন ড্যাঙ্গাতেও থাক্‌তে পারেন।" মহর্ষিকে "কলির জনক" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম দিনের উক্তিও সেই একই অর্থব্যঞ্জক। সংসারে থাকিয়াও কেশবচন্দ্র ভগবানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে সমর্থ—জল অথবা স্থল, সংসার অথবা সন্ন্যাস, তাঁহার নিকট

অবস্থার কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করে না। প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হইলে, কর্ম্মরত কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে দেরী হইত, তিনি হয়ত চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া টেবিলের উপর কাগজপত্রে কিছু লিখিতেছেন। কখনও বা তিনি হাত তুলিয়া ইংরাজি প্রথায় শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করিতেন। ইহার ভিতর অবজ্ঞার কোনও ভাব ছিল না, অবজ্ঞা ক্ষুদ্র মনের বিকার মাত্র, কেশবচন্দ্রের উদার হৃদয়কে ইহা কখনও কলুষিত করে নাই। ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব সুতরাং সম্মুখে অবস্থিত মানুষের অপেক্ষা কাজই বড় বলিয়া মনে হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে প্রণাম করিতেন, বিন্ধ্যগিরির উচ্চশির ভূমিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া সেই প্রণিপাতের অর্থগ্রহণ করিতে ধর্ম্মভীরু কেশবচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শাস্ত্র জ্ঞানে সমুন্নত শির ভূমিতে লুটাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ের সম্বন্ধ শুষ্ক শিষ্টাচারকে অতিক্রম করিয়া পরস্পরের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল।

কিন্তু ব্রাহ্মমতাবলম্বী কেশবের সহিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শ্রীরামকৃষ্ণের এই ঘনিষ্ঠতা প্রথম প্রথম অনেকের চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইত। এই প্রীতির বন্ধন আন্তরিক এবং কল্যাণপ্রসূ কি না সে বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিতেন। শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায় নামে এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নেপাল মহারাজার প্রতিনিধিরূপে কলিকাতায় বাস করিতেন। ভক্তমণ্ডলীর নিকট "কাপ্তেন" নামে পরিচিত সদাচারী এই ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। কিন্তু ঠাকুর যখন কলিকাতায় যাইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত পুনঃ পুনঃ দেখা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ব্রহ্মণ্যাভিমানী এই ভক্ত তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া প্রায় এক মাস দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যিনি ইংরাজের সহিত এক পংক্তিতে আহার করেন, ভিন্নজাতিতে আপনার

কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, তিনি ভ্রষ্টাচার, সুতরাং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরায়। শ্রীরামকৃষ্ণ উপাধ্যায় মহাশয়ের মিথ্যা অভিমান দূর করিবার জন্য বলিলেন, "আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে,—দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুন্‌তে যাই—আমি কুল্‌টি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?" কাপ্তেন তথাপি বুঝিলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশবদর্শন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহাকে রূঢ় কথা শুনিতে হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি তো টাকার জন্য যাই না—আমি হরিনাম শুন্‌তে যাই, আর তুমি লাটসাহেবের বাড়িতে যাও কেমন ক'রে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন ক'রে?" এই আঘাতে বিশ্বনাথের চৈতন্য হইল, ইহার পর তিনি অথবা অপর কেহ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কেশবচন্দ্রের নিন্দা করিতে সাহসী হন নাই।

উভয়ের মধ্যে যাতায়াত বাড়িতে লাগিল। গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্র নিজে সাধক বলিয়া শ্রীপরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক শক্তি উপলব্ধি করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। প্রথম হইতে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে জগতে পরিচিত করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' পত্রিকায় কেশবচন্দ্র লিখিলেন, "আমরা অল্পদিন পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে দেখিয়া তাঁহার সরলতা ও সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী দৃষ্টিশক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি।" ধর্ম্মপিপাসু সমাজের নিকট নিজলেখনী প্রয়োগে অথবা কথাবার্ত্তার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচারিত করা কেশবচন্দ্র জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উৎসাহ দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জান্‌তে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান ক'রে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না।"

কিন্তু কেশবচন্দ্র নিজ সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তাঁহার বাটীতে যাতায়াত করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজের অনেক ভক্তের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় হইল। সিঁদুরিয়াপটী, সিমলা প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে এবং কোন কোন ভক্তের গৃহে আহূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যাইতে আরম্ভ করিলেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষিত ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির অভাব ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, কেহ বা শাস্ত্রবিষয়ে সুপণ্ডিত, আবার কেহ ধনী অথচ চরিত্রবান্ ছিলেন। এইরূপ শক্তিশালী ধর্ম্মমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অতি শীঘ্র কলিকাতার ভক্ত ও শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। এই বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট বঙ্গদেশের সুধীসমাজ চিরদিন ঋণী। আত্মপরিচয় দিবার প্রবৃত্তি শ্রীপরমহংসদেবের কখনই পরিদৃষ্ট হইত না,—ফুল ফুটিলে মৌমাছি আপনি আসিবে—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভগবান তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিবার সময় যে রীতি অথবা পন্থা অবলম্বন করেন, মানুষ চেষ্টা করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। তাই কলিকাতার মৌমাছিবৃন্দ দক্ষিণেশ্বরের তপোবনের ফুলের কি করিয়া সন্ধান পাইয়াছিল ইহার সূত্র অন্বেষণ করিতে করিতে আমরা কেশবচন্দ্রের নিকট উপনীত হই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র পরস্পরের নিকট হইতে কি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া মিথ্যা তর্কজালের অবতারণা করা আজ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজ আজ অর্দ্ধশতাব্দীর উর্দ্ধকাল অবিচ্ছিন্নভাবে যে পবিত্র ধর্ম্মস্রোতে শীতল হইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে দুইটি সমধর্ম্মী আত্মার নিবিড় সম্বন্ধ, যাহার সৌরভ দ্রুতগতিতে মহানগরীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীকে দক্ষিণেশ্বরে আকর্ষণ করিয়াছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় কেশবচন্দ্র না আসিলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে আরও অপেক্ষা করিতে হইত, হয়ত ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হইত না, তাঁহার

মহাপ্রস্থানের দিন আরও দূরে সরিয়া যাইত। ইহাই উপলব্ধি করিয়া স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "যেখানে সংবাদ পৌঁছিলে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা প্রায় সকল ভক্তগণ জানিতে পারিবেন, জগদম্বা তাঁহাকে সে কথা প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়া বেলঘরিয়া উদ্যানে লইয়া যাইয়া ভক্তপ্রবর শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।" সুতরাং ফুল ও মৌমাছির মধ্যে অদৃশ্য সূত্ররূপে কেশবচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, একথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনজন ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বিজয় পতাকা ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া জগতের সম্মুখে চিরদিনের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন—ভক্ত মথুরানাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ। শক্তির তারতম্য থাকিলেও উদ্দেশ্যের কোন বিভিন্নতা ছিল না।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের কথা। সেদিন বরিশালের কর্ম্মবীর অশ্বিনীকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের আসিবার কথা, দেরী হইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন। "রাজেন্দ্রবাবুকে ব'ল্লেন, হ্যাখো দিখিন্, কেশব আস্‌চে কিনা। একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বল্‌লেন, না। আবার একটু শব্দ হ'তে বল্লেন, হ্যাখো, আবার হ্যাখো। এবারও একজন দেখে এসে বল্‌লেন, না। অম্‌নি পরমহংসদেব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে, ওই এল বুঝি প্রাণনাথ। হ্যাঁ, হ্যাখো, কেশবের চিরকালই কি এই রীত! আসে, আসে, আসে না। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবলসহ এসে উপস্থিত।" আর একদিন—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে নভেম্বর। সেদিন কেশবচন্দ্র পীড়িত ও দুর্ব্বল, তাঁহাকে দিখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়াছেন। নানাবিধ ঈশ্বরীয় কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর বলিলেন "তোমার অসুখ হ'লেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদ্‌তুম্।

বল্‌তুম, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কল্‌কাতায় এসে ডাব চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মা'র কাছে মেনেছিলুম, যাতে অসুখ ভাল হয়।" এই দুই দিনের ঘটনা একত্র করিয়া দেখিলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধ কত গভীর, সর্ব্ববিধ-মলিনতাবিহীন, যেখানে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ সমস্তই বিলুপ্ত, শুধু আত্মার সহিত আত্মার মিলনে নিরন্তর আনন্দসঙ্গীত উত্থিত হইতেছে —এই দেহাতীত নিত্যসম্বন্ধ সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে।

কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কি অভিমত পোষণ করিতেন তাহা জানিবার কৌতুহল স্বতঃই মনে উদিত হয়। ঠাকুর সাধককে বিচার করিবার সময় একটিমাত্র কষ্টিপাথর ব্যবহার করিতেন— কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ। যে-সাধকের জীবনরেখা এই প্রস্তরে উজ্জ্বল হইয়া অঙ্কিত না হইত তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপথে যথেষ্ট অগ্রগামী হইয়া নির্লিপ্তভাবে সংসারকর্ম্ম সম্পাদন করিলেও সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারীর সমাদর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একদিনের ঘটনা। সেদিন কেশবচন্দ্র কয়েকটা ব্রাহ্ম ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মকথায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, ভক্তগণ উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাত্রির অধিকাংশ সময় ভগবদ্‌চিন্তায় অতিবাহিত হইবে এই আশায় শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কাজটাজ আছে, যেতে হবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার উত্তরে উপমা-প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের জীবন লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেন গো, তোমার আঁসচুবড়ির গন্ধ না হ'লে কি ঘুম হ'বে না? মেছুনী মালির বাড়ীতে রাতে অতিথি হ'য়েছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার আর ঘুম হয় না। হুসখুস করছে, তাকে দেখে মালিনী এসে বল্‌লে—ঘুমুচ্ছিসনি

কেন গো! মেছুনী বল্লে, কি জানি মা, কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হ'চ্ছে না, তুমি একবার আঁসচুবড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তখন মেছুনী আঁস-চুবড়িতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।" কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন নির্ব্বাহপ্রণালী শ্রীরামকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "কেশবের সংসার ছিল, কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও ছিল। সংসারটাকে ত রক্ষা ক'র্ত্তে হবে? তাই অত লেক্‌চার দিয়েছে, কিন্তু সংসারটা বেশ পাকা ক'রে রেছে গেছে। অমন জামাই! বাড়ির ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট! সংসার ক'র্ত্তে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গাই সংসার।" এইরূপ জীবন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বত্যাগী আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং যখন একদিন কেশবচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না?" তাহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একই ভাব বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। "লোকমান্য, বিদ্যা, এসব নিয়ে তুমি আছ কিনা তাই হয় না। ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুষী। খানিকক্ষণ পরে চুষী ফেলে যখন চিৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে। তুমিও মোড়লী কোচ্ছ, মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।"

আর একদিনের কথা। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বরিশালের স্বনামধন্য অশ্বিনী দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি ভঙ্গের পর হঠাৎ কেশবচন্দ্রকে বলিলেন, "একদিন তোমার ওখানে গেছলাম, শুন্‌লাম তুমি বল্‌ছ, 'ভক্তিনদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ব।' আমি তখন উপর পানে তাকাই, (যেখানে কেশববাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ বসেছিলেন) আর ভাবি তাহলে এদের দশা কি হবে? তোমরা গৃহী একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে কি করে গিয়ে পড়বে? সেই নেউলের

মত পেছনে বাঁধা ইট, কোন কিছু হলে কুলঙ্গায় উঠে বস্‌লো, কিন্তু থাকবে কেমন ক'রে। ইটে টানে আর ধুপ্‌ করে নেমে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান ট্যান কর্ত্তে পার, কিন্তু ঐ দারাসুত ইট টেনে আবার নামিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তিনদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে, আবার ডুব দেবে আবার উঠবে। এম্‌নি চল্‌বে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি করে ?" কিন্তু একেবারে যে ঝাঁপ দেয় নাই তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। এখানে কোনও আপোষ ছিল না, যে ডুব দিয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে একেবারে নিমগ্ন হয় নাই, তাহাকে শ্রীপরমহংসদেব কখনও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। সেইজন্য একদিন গৃহীভক্ত ঈশান যখন তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া কৃপাভিক্ষা করিতেছিলেন তখন বিধিবিহিত ধ্যান-ধারণাকারী এই গৃহীকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ওরে বামুন, ডুবে যা, ডুবে যা।" ভাসিয়া থাকিলে চলিবে না, ডুবিয়া যাইতে হইবে, নতুবা রত্নের সন্ধান মিলিবে না। এই জন্যই আর একদিন তাঁহার 'সহস্রদলপদ্ম" নরেন্দ্রনাথকেও বিদ্রূপ ও তিরস্কার শুনিতে হইয়াছিল। তখন নরেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রথানুযায়ী প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ভগবদ্‌চিন্তা করিয়া থাকেন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতেছিলেন,

ভজন সাধন তাঁর কররে নিরন্তর।

তৎক্ষণাৎ ঠাকুর তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন, "যা করিস্‌না তা বল্‌বি কেন ? তুই বল্‌ "ভজন সাধন তাঁর কররে দিনে দুবার।" সর্ব্বস্বপণ করিয়া আত্মার সমস্ত শক্তিতে যে ভগবানকে আকর্ষণ করিতেছে না, সে অশেষস্নেহভাজন নরেন্দ্রনাথ হইলেও তাহার ক্ষমা ছিল না। তাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা—"এদিক ওদিক দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পার্‌লেন না।" কিন্তু ভূমার সহিত পরিচিত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাহা "তেমন কিছু" নয়, তাহা যে আজ বঙ্গদেশে শিক্ষিত সমাজে বিরল

ও আদর্শ স্থানীয় ইহা আমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ হইতে কেশবচন্দ্র অনেক দূরে থাকিলেও যে সমস্ত ভক্তগণের পুণ্য স্মৃতিতে শ্রীপরমহংসদেবের সাধনজীবন জগতে মধুর হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের সকলের মধ্যে কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের পার্থিব পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। প্রায় নয় বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গ করিবার সৌভাগ্য এক মথুর ব্যতীত আর কাহারও হয় নাই। আজিকার ধর্ম্ম কঠিন গণ্ডীপরিবেষ্টিত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আচারের দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবান সাকার, নিরাকার এবং আরও কত কি, ব্রহ্মানন্দের ভগবান একমাত্র নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, শ্রীপরমহংসদেব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কেশবচন্দ্র গৃহী, শ্রীরামকৃষ্ণ নিরক্ষর, দরিদ্র, পল্লীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ, কেশবচন্দ্র বিদ্বান, ধনী, মহানগরীর কোলাহলে অভ্যস্তজীবন, জাতিসংস্কারবিরোধী। কিন্তু এত পার্থক্য থাকিলেও কোথাও এমন মিল ছিল যাহার স্বচ্ছন্দ গতিকে আচারের তুচ্ছ বালুরাশি কোন বাধা প্রদান করিতে পারিত না। "Dogma divides, religious experience unites" (ধর্ম্মের আবরণ বিভিন্ন, কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি এক) গিলবার্ট মরের এই কথাগুলি মনে রাখিলে সেই মিলনের কারণ সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে উদারদৃষ্টির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মহাপুরোহিতরূপে জগতে পরিচিত সেই উদারদৃষ্টি অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও যদি ব্রহ্মানন্দের না থাকিত তাহা হইলে তিনি শিবকালীমূর্ত্তিবিরাজিত, দেবীনাম-মুখরিত দক্ষিণেশ্বরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এত যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক সাধনা ছিল, যাহার বলে তিনি বিপ্লবী শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। নিজ সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াও কেশবচন্দ্র তাঁহার উচ্চ আসন হইতে বারংবার নামিয়া

আসিয়া নিরক্ষর সাধকের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। যে হস্ত একদিন মহিমময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর করস্পর্শে অভিনন্দিত হইয়াছিল সেই হস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের ধূলিধূসরিত পদযুগল গ্রহণ করিতে লজ্জিত হয় নাই। কত বড় আধার হইলে তবে আপনার দেহের গৌরব মানুষ ভুলিয়া গিয়া অপরের আত্মার গৌরবকে উচ্চস্থান প্রদান করিতে পারে! বড় আধার ছিলেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদর্শন করিতে নবদ্বীপ, কাশী, কলিকাতায় দৌড়াদৌড়ি করিতেন, অনাদরের ভয় ছিল না, লজ্জা তাঁহাকে কখনও তিরস্কৃত করে নাই। কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রকার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, নিজ ধর্ম্মসমাজের সহস্র প্রয়োজনের দাবী উপেক্ষা করিয়া সময়ে অসময়ে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, ঘড়ি ধরিয়া কার্য্য করা যাঁহার অভ্যাস ও জীবনের আদর্শ ছিল তিনি সময়ের সব হিসাব ভুলিয়া যাইয়া প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করিয়া হয়ত গভীর রাত্রিতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তবুও বুদ্ধির ভর্ৎসনা ছিল না, মনের উপর প্রশ্ন পাহারা দিত না, যাতায়াতের পথে যুক্তিতর্কের সংঘাত হইত না, স্বাধীন ইচ্ছা বল্‌গামুক্ত রথে স্বচ্ছন্দগতিতে সঞ্চরণ করিত। তাই যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুসময়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে অবিচলিত চিত্তে দেহবিমুক্ত আত্মার লীলাদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বন্ধনবিহীন সন্ন্যাসী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে বলিয়াছিলেন, "আমি তিনদিন শয্যাত্যাগ করিতে পারি নাই; মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে।" ব্রহ্মানন্দের দেহ বিনষ্ট হইয়া অন্ততঃ তিনদিনের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনুকে অক্ষম করিয়াছিল, ইহাই কেশবচন্দ্রের আত্মশক্তির নিদর্শন, ইহাই উভয়ের অপার্থিব সম্বন্ধের সম্যক পরিচয়।
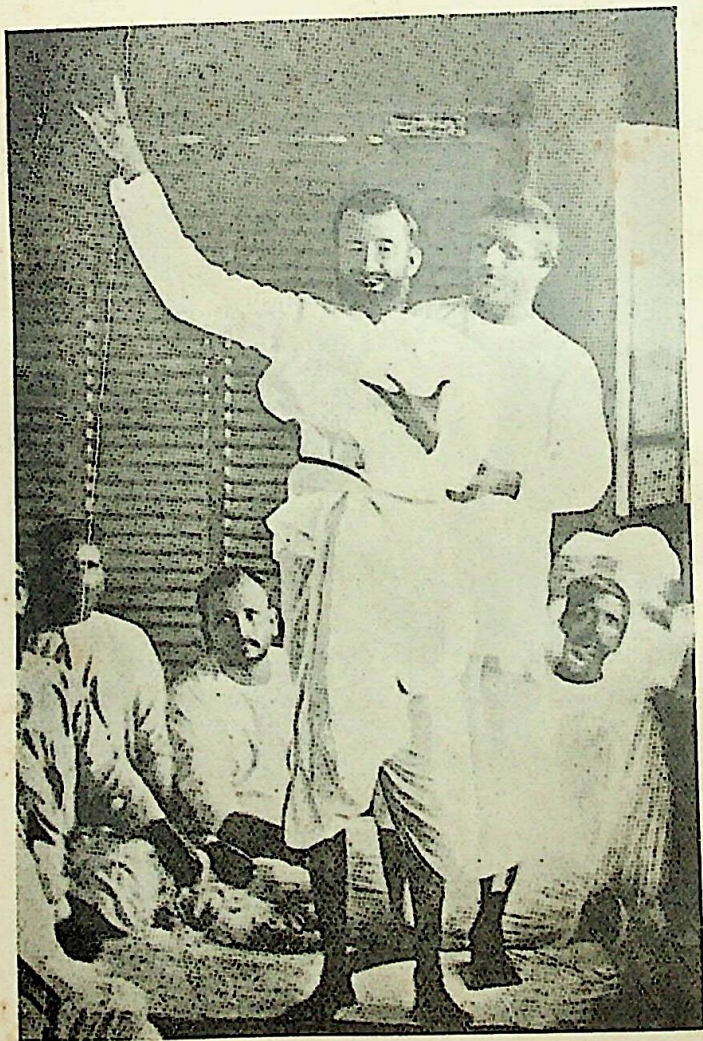
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গৃহে

ভাবসমাধিস্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পার্শে হৃদয় নাথ

কর্ম্মবীর কৃষ্ণদাস পাল

কর্ম্মবীর কৃষ্ণদাস পালের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ১৮৮১ অথবা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে মনে হয় কৃষ্ণদাস দেবীদর্শন করিতে আসিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত হন। তদানীন্তন সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস সুপরিচিত ছিলেন। সেই যুগে সভাসমিতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা সুপ্ত ও অবনত ভারতবাসীকে নিজ অধিকারে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে কয়েকটী মহাপ্রাণ ব্যক্তি আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। পরস্পর পরিচয়ের পর ঠাকুর কৃষ্ণদাসের নিকট জীবনের উদ্দেশ্য কি প্রশ্ন করিলেন। এই একই প্রশ্ন তিনি অনেক সময়ে গৃহী ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন। কৃষ্ণদাস উত্তর দিলেন, "জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করাই" মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কর্ম্মক্ষেত্র ইংলণ্ডের প্রভাব তখন উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, সুতরাং 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক মহাশয় এই স্বাভাবিক উত্তরই প্রদান করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখ নাশ তুমি ক'রবে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালের গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা হয় কোরো।" কৃষ্ণদাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় জাতিগণ "জগতের উপকার করাই" মানবজীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য "জগৎ" বলিতে তাঁহারা নিজ নিজ

সীমাবদ্ধ দেশই বুঝিয়া থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ইহাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বিধবা আশ্রম স্থাপিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের ভিতরেই গুপ্ত পাপস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, দেশের নামে টাকা উঠিয়া চতুর দেশনেতার আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করিয়াছে, নিরক্ষর দেশবাসীর অজ্ঞতা দুরীকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামন্দির আচার্য্যস্থানীয় দেশপ্রেমিকের লাভজনক জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে,—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অন্যদিকে ইউরোপে ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা এই একই উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া, "জগতের" উপকারের নামে দুর্ব্বল ও অসহায় জাতির প্রতি পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, ইংরাজ "জগতের" উপকার করিবার জন্যই বহুবর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে, পোলাণ্ড কতবার খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ইউরোপের একই মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট আত্মবলি প্রদান করিয়াছে, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি সভ্য জাতিসমূহ জগতের উপকার করিবার জন্যই আফ্রিকার অক্ষম আদিম অধিবাসীগুলিকে নিজদেশে নিজগৃহে বিবিধ প্রণালীতে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত করিয়াছে। হিংসার উৎসবে আজি অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের যে ভয়ঙ্করী উন্মাদরাগিনী বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাও জগতের উপকারের জন্য, ইহা পরস্পর বিরোধী, লুব্ধ জাতিগণ আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে। জগতের উপকারের জন্য শিক্ষামন্দির, হাসপাতাল, বাণিজ্যকেন্দ্র নির্ম্মিত হইয়াছে, আবার জগতের উপকারের জন্যই "Scorched Earth" (পোড়ামাটির) নীতি অবলম্বন করিয়া সেগুলিকে নির্ম্মমহস্তে ধ্বংস করিতে করিতে পরাজিত জাতি পশ্চাদপসরণ করিতেছে। ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করিয়া চিত্তপরিশুদ্ধি না হইলে কর্ম্মের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। **Duty is Religion** (কর্ত্তব্যসাধনই ধর্ম্ম) ইংরাজজাতির এই অর্দ্ধসত্যকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া কর্ম্মবীর

কৃষ্ণদাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, আদর্শের আর একটি দিক্ "Know Thyself" (আত্মানং বিদ্ধি) তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই সেদিন তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরক্তিভাজন হইতে হইয়াছিল।

আজিও ভারতবর্ষে ইংরাজি আদর্শের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা আমাদিগকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের উদ্দেশ্য বলিতে শিক্ষিত ভারতবাসী নানাবিধ কর্ম্মই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা জগতের উপকারের নামে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের—অর্থ, যশ, গৌরব—সন্ধান করিয়া থাকি। পরের জন্য কর্ম্ম করিতে হইলে পূর্ব্বে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, এই আত্মবিসর্জ্জনের শক্তি সাধন-সাপেক্ষ, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। বৃহৎ ও স্থূল কর্ম্মের জন্য অর্থ, লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা, ভোগসমৃদ্ধ শারীরিক শক্তি প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক শরৎচন্দ্র ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত কৃচ্ছ্রসাধনকারী বালকগণের আশ্রমকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাঁহার "শেষ প্রশ্ন" নামক উপন্যাসে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আছে।

"ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত। কেহ আলো জ্বালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে, আপনি যাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়।......

ছেলেটী প্রফুল্লমুখে কহিল, আজ রবিবারে আমাদের আলুর দম হয়।

—আর কি হয়?

—আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর দম? ডাল কিংবা ঝোল কিংবা আর কিছু—

......কমল কহিল, বলুন সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার শিক্ষা কি ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, পরণে শীর্ণ বস্ত্র, মাথায় রুক্ষকেশ, একবেলা অর্দ্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠছে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু, পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন, যারা অনেক পেয়েছে তারা সহজেই দিয়েছে, এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের গ্রাজুয়েট তৈরী কর্ত্তে হয় নি।"

কর্ম্মের মোটামোটি আদর্শ এই প্রতিবাদের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে,—নিজে ভোগ করিয়া অপরের ভিতর ভোগের শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ করিতে হইবে—ইহাই বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত। কিন্তু শরৎচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পাওয়ার আনন্দ যাহার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহারই হাত দিয়া দেশের লক্ষ্মী তাঁহার ভাণ্ডারের চাবি বারংবার প্রেরণ করিয়াছেন। এদেশে দুঃখদাহনের মধ্যেই যে বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার বিদ্যার সাগর আজ কালবশে শুষ্ক ও নিঃশেষিত কিন্তু তাঁহার দানের শতমুখী উৎস সেদিনের মত আজিও বহু হৃদয়ে সরসতা সঞ্চারিত করিয়া নব নব রূপে দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যতদিন "পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার" ক্ষুদ্র তৃপ্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন, ততদিন এজগতে তিনি কাহারও কাজে লাগেন নাই, শত সহস্র ধনী আইন ব্যবসায়ীর নীহারিকার মধ্যে তিনি একটী অস্পষ্ট বিন্দুমাত্র ছিলেন, কিন্তু যেদিন অকিঞ্চনতার ভিতর দিয়া দেশবন্ধুরূপে নবজীবন লাভ করিলেন, সেইদিন তাঁহার দানের মূল্য ও জীবনের সার্থকতা ভারতবাসী উপলব্ধি

করিতে পারিল। শরৎচন্দ্র হরেনবাবুকে পৃথিবীর দিকে "চেয়ে দেখিতে" বলিয়াছেন কেননা "যারা অনেক পেয়েছে তারা সহজেই দিয়েছে।" ইহা শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি-বিভ্রম, ইহা সত্যের অপলাপ মাত্র। যাহারা অনেক পাইয়াছে, তাহারা আরও অনেক প্রত্যাশা করিয়াছে, দিবার শক্তি তাহাদের ছিল না, যদি কখনও দিয়া থাকে তাহা কখনই সহজে নহে। ভোগের মধ্যে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত হইয়া যে-ব্যক্তি অপরকে দান করিয়াছে, তাহার সেই কর্ম্ম তুচ্ছ অথবা বিবিধ অনিষ্টের আকর, কিন্তু যে মানব ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কর্ম্ম করিয়াছে, বিধবার সর্ব্বস্ব তুইটি ক্ষুদ্র মুদ্রা যেমন যিশুখৃষ্ট গ্রহণ করিয়া ধনীর স্বর্ণমুদ্রার উপরে স্থান দিয়া, সেই দানকে অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ সর্ব্বত্যাগীর কর্ম্মও যুগে যুগে নূতনরূপে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। "যত পাই তত চেয়ে চেয়ে তত পেয়ে পেয়ে চাওয়া মোর, পাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়"—ইহাই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ভোগবিলাসী সাধারণ মানবের কর্ম্মফলের সুস্পষ্ট চিত্র।

তাই সেদিন কৃষ্ণদাসের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করেন নাই। শিষ্যদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল।…একটু কথা ক'য়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই।" "কিছু" অর্থাৎ ধর্ম্মভাব এবং ত্যাগের দীক্ষাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল,—এই "কিছু"র দ্বারাই তিনি মানবকে বিচার করিতেন এবং ইহার অভাব হইলে যত বড় কর্ম্মই হউক না কেন, তাঁহার নিকট কোন সমাদরলাভ করিত না। প্রাণে যাহার সুর নাই, সে যদি শুধু বাঁশিতে সুর বাহির করে তাহা যেমন শ্রোতার মর্ম্মস্পর্শী হয় না, সেইরূপ রাজনীতিক নেতা আপনার সুখৈশ্বর্য্যে অবহিত হইয়া অবসরমত দেশের উপকারের জন্য যে শুষ্ক বাক্যস্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকেন, তাহা কালবশে অতি সহজেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে রাজনীতিক নেতা অপেক্ষা কবি দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়া থাকেন। কবিতা মর্ম্মস্থানের

অনুভূতিসাপেক্ষ সুতরাং বাক্য ও মনের একই অবস্থা না হইলে কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে না। তাই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে যেরূপ প্রবুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত আর কোন রাজনীতিক নেতার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আবার মহাকবি অপেক্ষা সাধকের স্থান কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক উচ্চে—তাঁহার বাক্য, মন ও আত্মা এক মহাসঙ্গমে উপনীত হইয়াছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দের দান মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বাণীরও অনেক উর্দ্ধে। রাজনীতিক কর্ম্ম বুদ্ধিপ্রসূত, মহাকবির প্রেরণাস্থল তাঁহার হৃদয়, সাধকের কর্ম্ম আত্মার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে কর্ম্ম শুধু বুদ্ধি হইতে উত্থিত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে বাক্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে সে কর্ম্মের কর্ত্তীর ভিতরে "কিছু নাই" ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট, অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের কথক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত কোন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার মুখে বিদ্যাসাগরের নানাবিধ গুণের কথা শ্রীপরমহংসদেবের কর্ণগোচর হইত। বঙ্গদেশের এই উজ্জ্বল ভাস্কর শ্রীরামকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিল। একদিন অপরাহ্ণকালে মহেন্দ্রনাথ ও অপর দুই একজন ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বাদুড়বাগানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের এই দর্শন ও পরিচয় বাংলাদেশের সমাজে চিরস্মরণীয়। একদিকে জ্ঞান ও ভক্তি অন্যদিকে সর্ব্বত্যাগী নিষ্কাম কর্ম্ম, একজন তখনকার ধর্ম্ম-সমাজে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, অপরজনের দয়ার খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত। বিদ্যাসাগরের রথ, অশ্ব, পতাকা কিছুই ছিল

না, তিনি দীনবেশে সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি একাকী যে-কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহস্র সহস্র লোকের পক্ষেও সম্ভবপর হয় নাই। কর্ম্মের যে উচ্চভূমিতে বিদ্যাসাগর অধিরূঢ়, সেখানে তাঁহার তুলনা নাই, সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ ও একাকী। তাই ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিদ্যাসাগরের সাক্ষাতের স্মৃতি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মত আজিও মধুর ও পবিত্র, ভক্তি ও কর্ম্মের মিলনধারায় বাদুড়বাগানের বাটী আজিও বাঙ্গালীজাতির নিকট তীর্থ-স্বরূপ।

দক্ষিণেশ্বর হইতে বাহির হইয়া গাড়ী কলিকাতা অভিমুখে চলিয়াছে, ঠাকুর আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিবামাত্র হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল। মন কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, অন্য কথা শ্রবণ করিতে অসহিষ্ণু। ভক্ত মহেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ীর প্রতি ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'এখন ওসব কথা ভাল লাগ্‌ছে না।' বিদ্যাসাগর-বাটীর প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভীত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় বেশভূষার কোন ত্রুটি থাকিলে পাছে সম্মানী ব্যক্তির মর্য্যদা হানি হয়! কোনও অপরিচিত পণ্ডিত অথবা ধার্ম্মিক লোকের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ অদ্ভুত চঞ্চলতা সময় সময় পরিদৃষ্ট হইত। বিদ্যাসাগরের বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় শ্রীপরমহংসদেবের বেশভূষা ও মনের অবস্থার বিশদ চিত্র মহেন্দ্রনাথ অঙ্কিত করিয়াছেন।

'ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না?' গায়ে একটী লংক্লথের জামা, পরণে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটী

কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্ণিশ করা চটী জুতা। মাষ্টার বলিলেন, 'আপনি ওর জন্য ভাব্‌বেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না, আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।' বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।'

কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের সম্মুখীন হইলেন, তখন সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধাভাব কোথায় তিরোহিত হইল, দেবীর অনুপ্রেরণায় উৎসমুখে বাক্যস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, মনে হইল যেন 'সাক্ষাৎ বাগবাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন।'

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত শ্রীপরমহংসদেবের মানব-জীবনে কর্ম্মের স্থান ও সার্থকতা লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কৃষ্ণদাস পালের কর্ম্মের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমোদন করেন নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কর্ম্মপ্রণালী তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থন করিয়াছিলেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যে-সব কর্ম্ম কর্‌ছ এতে তোমার নিজের উপকার। ......যে লোক কামনা-শূন্য হ'য়ে কর্ম্ম ক'র্‌বে সে নিজেরই মঙ্গল কর্‌বে।' সাধারণতঃ কর্ম্ম হইতে অভিমানের সৃষ্টি হয়, 'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' (অহংকারে আচ্ছন্ন-বুদ্ধি মানব আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে) সুতরাং কর্ম্ম অধঃপতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কর্ম্ম মঙ্গলপ্রসূ বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। তথাপি সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কর্ম্ম করিলেই ফল আছে এবং সেই ফলের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়; দেহাভিমানী লোক সেই ফল আপনি গ্রহণ করিয়া থাকে, জ্ঞানী তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে, ইহাই পার্থক্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থরূপে না জানিলে তাঁহাকে ফল অর্পণ করা অসম্ভব, তাই মানুষ সাধারণতঃ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

সুতরাং বিদ্যাসাগর সৎকর্ম্ম করিলেও শুদ্ধ নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার অধিকারী হন নাই, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন। 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে কর্ম্ম করে সে ভাল কাজ—নিষ্কাম কর্ম্ম করবার চেষ্টা করে।' 'চেষ্টা করে',—এই কথাগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মের অসম্পূর্ণতার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। দীনবন্ধু, সর্ব্বত্যাগী বিদ্যাসাগরের পক্ষেও নিষ্কাম কর্ম্ম কেন কঠিন তাহার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। ......মনে করছি অনাসক্ত হ'য়ে কাজ কর্‌ছি, কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব কর্‌লুম, কি অনেক গরীব কাঙ্গালের সেবা কর্‌লুম, মনে কর্‌লুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে কর্‌ছি, কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হ'য়েছে, জান্‌তে দেয় না। তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে।'

ঈশ্বরের ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই সুতরাং "নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌বার চেষ্টা করে মাত্র" কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্দেহ। ঈশ্বরানুভূতি না হইলে কেন নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভবপর নহে, ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। মানুষের কর্ম্ম দুইটী বিভিন্ন বুদ্ধিপ্রসূত। কেহ জীবের প্রতি দয়া করে, কেহ বা শিব-জ্ঞানে তাঁহার সেবা করে, উভয়ই সৎকর্ম্ম কিন্তু এই উভয়বিধ কর্ম্মের উৎস বিভিন্ন। যে দয়া করে সে জীব হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে, একজনের দুঃখ অপর একজন লাঘব করিতেছে। এখানে প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ রহিয়াছে এবং এই আত্মপ্রসাদ অহঙ্কারের রূপান্তর মাত্র। ইহাই পাশ্চাত্ত্য জগতের আদর্শ। মহাকবি সেক্ষপীয়র এই আদর্শপ্রণোদিত হইয়া বলিয়াছেন—

It (Mercy) is twice blessed ;
It blesseth him that gives and him that takes.

(দয়া দ্বিবিধ উপকার সাধিত করে। যে পাত্র সে দয়া গ্রহণ করিয়া সুখী হয়, যে দাতা সে দয়ার কার্য্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।)

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন কথা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'দয়া কি রে? শিবজ্ঞানে জীবের সেবাই' মানব-ধর্ম্ম। যাঁহার সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হইয়াছে, যাঁহার দিব্যদৃষ্টি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' দেখিতে পায়, তাঁহার পক্ষে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে উচ্চনীচের কোন ব্যবধান নাই, তিনি 'দয়া' করেন না, তিনি শিবজ্ঞানে দরিদ্রনারায়ণের 'সেবা' করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার ভগবৎ উপলব্ধি হয় নাই তিনি জীবকে শিব বলিয়া জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি 'বহুজনহিতায়' যাহা করিয়া থাকেন তাহা 'দয়া', অহঙ্কারের বিকার মাত্র, 'সেবা'—আত্মনিবেদন নহে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ সেবাবুদ্ধিপ্রণোদিত নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কাছে তুমি কর্ম্মতট আত্মা-তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তি-সিন্ধু অনন্ত গভীর।

বিদ্যাসাগর কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত; নিষ্কাম কর্ম্মের প্রয়াস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা-তটিনীর কর্ম্মতটে সকল কর্ম্মের 'ভোক্তা ও প্রভু' কেহই পরিদৃষ্ট হয় না, তাঁহার কর্ম্মের পরিসমাপ্তি কর্ম্মেই হইয়া যায়। তাই শ্রীপরমহংসদেব দূরের প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 'অন্তরে সোণা চাপা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। ......আরও এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল, ব্রহ্মচারী বল্লে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দনগাছ পর্য্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে সোণার খনি। তারপর কেবল হীরা মাণিক! এই সব ল'য়ে

একেবারে আণ্ডিল হ'য়ে গেল।' বিদ্যাসাগর চন্দনের কাঠমাত্র দেখিয়াছিলেন, হীরা-মণি-মাণিক্যের সন্ধান পান নাই। কিন্তু তাঁহার ভিতরে শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আত্মবিস্মৃতির জন্য 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি' (যিনি অনন্ত, তাঁহাতেই সুখ, সীমাবদ্ধ বিষয়ে সুখ নাই) ইহা মনে পড়িতেছে না, ক্ষুদ্র কর্ম্ম লইয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া আছেন, কিন্তু অগ্রসর হইলেই হীরা-মুক্তার খনি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। 'এ যা বল্‌লুম বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন, তবে খপর নাই। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। বরুণ রাজার খপর নাই।' কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে শিষ্যদের নিকট ঠাকুর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। অন্তরে সোণা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন, জান্‌তে পার্‌লে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে ইচ্ছা হয়।' ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের কর্ম্মময় জীবনে কয়েকটী শুভ মুহূর্ত্ত। সেই দিন তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা আর কেহ কখনও তাঁহাকে শুনায় নাই, জীবনের যে সার বস্তু তিনি এতদিন বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, দূরের সেই 'শান্তি সিন্ধু অনন্ত গভীরের' প্রতি প্রবোধিত করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিদ্যাসাগর—বাটীতে আগমন করেন। সেই দিন ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছি।' স্তব্ধ হইয়া এই কর্ম্মবীর শুনিলেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম তো আদিকাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়, উদ্দেশ্য নয়।···ঈশ্বর লাভ হ'লে আর কর্ম্ম কর্‌তে হয় না, মনও লাগে না।'

কিন্তু যে মহান্ উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের তপোবন হইতে কোলাহলমুখরিত নগরীর ভিতর সন্ধান করিয়া অযাচিতভাবে আগমন

করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য মুকুলেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাহা প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই কর্ম্মযোগের মহাপুরোহিত কর্ম্মগগনে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত বিরাজ করিয়াও জীবনের সায়াহ্নে নিরানন্দ, কর্ম্মক্লান্ত ও নিষ্প্রভ। গগনস্পর্শী উচ্চশির লইয়া তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ মহামানবের মত অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার প্রদীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে বাংলার অনেক রাজা, মহারাজার উদ্ধত দৃষ্টিও সঙ্কুচিত হইয়াছে। অথচ গভীর মোহের মধ্যেও মানুষ মস্তক অবনত করিবার, চক্ষুদ্বয় শীতল করিবার আধারের সন্ধান করিতেছে, ইহাই মানবের জন্মগত অধিকার, এই অধিকার আছে বলিয়াই মানুষ আজ পশুর উপরে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর চিরদিন এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেন, যাঁহার নিকট শির বিলুণ্ঠিত করিলে, সেই শির জগতের সম্মুখে উচ্চগগন ভেদ করিয়া যায়, সেই পরমপুরুষের সন্ধান পাইলেন না। তাই জনৈক লোক তাঁহার নিন্দা করিয়াছে শুনিয়া দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন, 'ওর কি কখনও উপকার করেছিলাম যে, ও আমার নিন্দা ক'র্ছে?' এই প্রশ্নের অন্তরালে কি নৈরাশ্য, মানব চরিত্রের প্রতি সন্দেহ ও নিজ জীবনের নিষ্ফলতার ব্যথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। নীরস কর্ম্মের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রি ৯টার পর বিদ্যাসাগর-বাটী পরিত্যাগ করেন, ঈশ্বরচন্দ্র দ্বারদেশে আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। গাড়ীর প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি, চিন্তামগ্ন বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার বহুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট কথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, ২৩শে মে, ঠাকুর কলিকাতায় রামচন্দ্রের বাটীতে বসিয়া আছেন। ভগবদুপলব্ধি না হইলে শাস্ত্রপাঠ বৃথা উল্লেখ করিয়া উদাহরণ স্বরূপ বলিলেন, 'দেখ্‌লাম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া

আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু শাস্ত্র পড়্‌লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না।' আর একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরকে এক কথায় চিনেছি, কত দূর বুদ্ধির দৌড়।......ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চূণো পুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?' বিদ্যাসাগর একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মপ্রবাহে পড়িয়া তাহা বিস্মৃত হন। ইহাই সত্যনিষ্ঠ শ্রীপরমহংসদেবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত করিয়াছিল এবং বিদ্যাসাগর তাঁহার চক্ষে অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 'বিদ্যাসাগর সেদিন বল্লে এখানে আসবে, কিন্তু এলো না।......বিদ্যাসাগর সত্য কথা কথা কয় না কেন?' মূর্ত্তিমান্ সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ইহা বিদ্যাসাগরের অমার্জ্জনীয় ত্রুটি। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও বিদ্যাসাগর সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত নহেন, পণ্ডিত হইয়াও সত্যের প্রতি একনিষ্ঠতা তাঁহার ছিল না—ইহাই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধারণা। সুতরাং একদিনের সাক্ষাতেই এই দুই মহাপুরুষের মিলনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, ভবিষ্যতে পরস্পর আকর্ষণের আর কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর শনিবার ভক্ত অধরলাল সেনের শোভা-বাজার বেণেটোলার বাড়ীতে অপরাহ্লকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হয়। সেদিন অধরের বাড়ীতে শ্রীপরমহংসদেবের আসিবার কথা ছিল,

তাই ডেপুটি অধরলাল শনিবারের কাছারি সকাল সকাল বন্ধ হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ কয়েকটী ডেপুটী বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের ভক্ত, নিজে সাধুসঙ্গের আনন্দ পাইয়াছিলেন, বন্ধুগণকে সেই আনন্দের সন্ধান দিতে সেদিনকার আয়োজন। সাহিত্য ও শাসনক্ষেত্রে তখন বাংলাদেশে 'ডেপুটি যুগ' চলিতেছে। একদিকে ইংরাজি শিক্ষার নূতন উন্মাদনায় পরাধীন স্বদেশবাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারূপে রাজকর্ম্মচারীর কৌলীণ্যাভিমান, অপরদিকে সাহিত্যক্ষেত্রে লেখা ও সমালোচনার দ্বারা শিক্ষিতসমাজে সম্মান। সুতরাং তখনকার ডেপুটিগণ বাংলাদেশের সনাতন চতুর্ব্বর্ণভুক্ত না হইয়া যেন রাজকর্ম্মচারীসঙ্ঘরূপে একটী বিভিন্ন জাতি। বিদ্যাসাগর মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত শ্রীপরমহংসদেবকে গ্রহণ ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধরের ডেপুটী বন্ধুগণের সন্দিগ্ধ চক্ষু শ্রীপরমহংসদেবকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা অথবা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে শুনিতে ডেপুটীগণ ঠাকুরের অবোধ্য ইংরাজি ভাষায় সমালোচনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ব্যবহারে শ্রদ্ধার কোন লক্ষণ ছিল না, জিজ্ঞাসু মন লইয়া তাঁহারা আসেন নাই, ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের তীক্ষবুদ্ধিই তাঁহারা সমস্ত আলোচনায় প্রয়োগ করিতেছিলেন। এইরূপে সাধুকে পরীক্ষা করা অনেক বিষয়ী লোকের অভ্যাস থাকে। কিন্তু যাঁহারা সাধুর নিকট কিছু গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে নিজবুদ্ধির পরিচয় দিতে সমুৎসুক তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ বঞ্চিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। শ্রীশন্তদাস বাবাজী যখন বিষয়কর্ম্মরত উকিল, তখন তদীয় গুরু শ্রীমৎ কাঠিয়া বাবার সহিত প্রথম দর্শনের সময় সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সাধু চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কাঠিয়া বাবাকে বিষয়াসক্ত সাধারণ মনুষ্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। মাটির ঢেলা খুঁজিলে মাটির ঢেলাই দেখিতে পাওয়া যায়, কাঞ্চনের সন্ধান মিলে না। 'দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি নিয়ে গেল সবে মাটির

ঢেলা"—ইহাই মক্ষিকাধর্ম্মী মানুষের হীন প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাই ভক্ত অধরের আশা সেদিন অপূর্ণ রহিল, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমপ্রমুখ ডেপুটীগণকে তাঁহার নিজ আনন্দের লেশমাত্র অংশও তিনি প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না।

অধর ঠাকুরের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বইটই লিখিয়াছেন।' বঙ্কিম প্রথম হইতেই কৌতুকপরায়ণ, ধর্ম্মকথা শ্রবণের জন্য মনের যে সাম্য অবস্থার প্রয়োজন তাহা সেদিন তাঁহার ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মানুষ নির্জ্জনে সাধুসঙ্গ করিবার সময় যে মনোযোগ ও শ্রদ্ধা লইয়া আসে, বন্ধুবান্ধবদের দলে পড়িলে মনের সেই গম্ভীর অবস্থা কোথায় তিরোহিত হইয়া যায়। একাকী সাধুর সম্মুখে হয়ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিতেছে কিন্তু যখন দলবদ্ধ হইয়া সহকর্ম্মী বন্ধুদের সহিত আসিয়াছে তখন সাধুকে তর্কে পরাজিত করিয়া বন্ধুদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের আগ্রহেই তাহার সমস্ত শক্তি অপব্যয়িত হইতেছে। ডেপুটীপরিবৃত বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু মনও সেদিন ধর্ম্মকথা গ্রহণ করিবার উপযোগী ছিল না। ঠাকুর যখন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিম! তুমি কার ভাবে বাঁকা গো!" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন, "সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।" শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষের কর্ত্তব্য কি?" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আহার, নিদ্রা, মৈথুন।" ঠাকুর পরকালের কথা বলিলে, বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময়ের ভান করিলেন, "পরকাল! সে আবার কি?", গুরুবাক্যে বিশ্বাস ধর্ম্মলাভের একটী উপায় বলিয়া শ্রীপরমহংসদেব নির্দ্দেশ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "গুরু! তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন।" এইরূপে পুনঃ পুনঃ সাধুবাক্যের বিকৃত উত্তর প্রদান করিয়া বন্ধুসমাজে বাহবালাভ করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের লঘুপ্রকৃতি শ্রীপরমহংসদেবের নিকট ধরা পড়িয়া গেল, ধর্ম্মভাবের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা দর্শন করিয়া ঠাকুর আঘাত পাইলেন।

সেদিন তাঁহার সমস্ত কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্তি মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে অনেক সময় বুদ্ধিমান সংসারী লোকেরা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, ইহা শ্রীপরমহংসদেবের অজ্ঞাত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন মনোভাব ঠাকুর যেন দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেউ কেউ মনে করে এরা ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রছে, পাগল, এরা বেহেড হয়েছে। আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ কর্‌ছি ; টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকাল বেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে। কাক দেখ না কত উড়ুর পুড়ুর করে, ভারি স্যায়না।" এই তীব্র ভাষা হইতেই সেদিনকার সাধুপরীক্ষক ডেপুটীবৃন্দের প্রতি শ্রীপরমহংসদেবের মনোভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?," প্রচার করিতে সমর্থ বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীপরমহংসদেব আত্মপ্রশংসায় প্রীত হইবেন, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র আশা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, নিজে কিছু জানিলে অথবা শিক্ষা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা অপরকে শুনাইয়া নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার কণ্ডূয়ণ-প্রবৃত্তি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার স্বাভাবিক এবং এই দুর্ব্বলতা সর্ব্বত্যাগী সাধুর মধ্যেও আছে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন।' নিজ সাধনজীবন প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলিলেন, তিনি 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা' বলিয়া গঙ্গাগর্ভে কাঞ্চনপিপাসা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের এই অর্থহীন কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন, 'টাকা মাটি! মহাশয়, চারটা পয়সা থাকিলে গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা'বল্লে দয়া, পরোপকার, করা

হবে না!' সেই এক কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বণিকসম্প্রদায় কাঞ্চনের পূজা করিয়া মাটির ধরণীকে ভোগের অমরাবতীতে পরিণত করিবার যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই সুখ-স্বপ্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাঞ্চনের নিন্দা ইংরাজি আদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষ্ণদাস, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণ সহ্য করিতে পারিতেন না। অর্থ পরোপকারের বৃহৎ যন্ত্রস্বরূপ সত্য, কিন্তু অর্থের দ্বারা পরোপকার অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ভোগই অধিক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। কর্ম্মযোগীর নিকট অর্থ ক্রীতদাস, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্থের নিকট কত অসংখ্যব্যক্তি আপনার মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিয়াছে, তাহারও নির্ণয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্মিত প্রতিবাদের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিলেন, তাহা অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাবায় তাঁহার নিকট হইতে শুনা যাইত। 'দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো? মানুষের এতো নপর-চপর কিন্তু যখন ঘুমায় তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয় তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান দর্প কোথায় যায়।...শম্ভু ব'লেছিল, আমার ইচ্ছা যে খুব কতকগুলো ডিসপেনসারী, হাসপাতাল করে দিই, তা' হলে গরীবদের অনেক উপকার হয়।...বল্লুম, শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তা'হলে তুমি তাঁকে চাইবে, না, কতকগুলো ডিস্‌পেন্‌সারী বা হাসপাতাল চাইবে? যারা হাসপাতাল কর্ব্বে আর এতেই আনন্দ কর্ব্বে তারাও ভাল লোক, কিন্তু থাক্‌ আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, বেশী কর্ম্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও, তা না হ'লে যে-মন তোমাতেই নিশিদিন লেগে থাক্‌বে, সেই মনের বাজে খরচ হ'য়ে যাচ্ছে, সেই মনেতে বিষয়চিন্তা করা হচ্ছে।" উভয়ের মতের অনেক পার্থক্য সুতরাং আর তর্ক চলিল না।

শাস্ত্র না পড়িলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, এই মত শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই গ্রহণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, একটু এদিককার জ্ঞান না হ'লে ঈশ্বর জান্‌বো কেমন ক'রে? আগে পড়াশুনো ক'রে জান্‌তে হয়।" সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেবীচৌধুরাণীর চরিত্রে এই বিশ্বাসই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভবানীঠাকুর দেবীচৌধুরাণীকে ব্যাকরণ রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা, সাংখ্য, বেদান্ত ও ন্যায় পড়াইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। ইহা শ্রীপরমহংসদেবের বিশ্বাসের ঠিক্ বিপরীত। তিনি আনন্দমঠের গ্রন্থকর্ত্তাকে বলিলেন, "কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়্‌লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।...কিন্তু আগে ঈশ্বর তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ ক'রলে দরকার হয় ত সবই জানতে পার্‌বে। যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পারো যো সো ক'রে, তা'হলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের ক'খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান এও জান্‌তে পার্‌বে। যদু মল্লিকই সব ব'লে দেবে কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ি ঢুক্‌তে গেলে দারোয়ানেরা যদি না ঢুক্‌তে দেয় তা'হলে কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ কখানা বাগান এ সব ঠিক্ খবর কেমন করে জান্‌বে? তাঁকে জান্‌লে সব জানা যায়।...আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।" গ্রন্থপাঠ করিয়া তাঁহাকে জানিবার অধিকারী হইতে হইলে অনেকের পক্ষে ঈশ্বর লাভ করা কঠিন হইত, ভগবান দরিদ্রের নারায়ণ বলিয়া পরিচিত হইতেন না, তরুণযুবক অপেক্ষা জ্ঞানভারে মন্থরগতি বৃদ্ধই বিশ্বপিতাকে জানিবার অধিক সৌভাগ্য লাভ করিত। কিন্তু ভগবৎ-দর্শন মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং ইহা মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং ভগবৎজ্ঞান শাস্ত্রনিরপেক্ষ বরং অনেক সময়ে শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখে। গীতাপাঠ করিতে করিতে হয়ত সমগ্র গীতা কণ্ঠস্থ হইয়াছে কিন্তু জীবনে তাঁহার একটী অক্ষরও ধারণা হয় নাই, অথচ লোকসমাজে প্রয়োজন

অপ্রয়োজনে "শ্লোক ঝাড়িয়া" আপনার শাস্ত্রজ্ঞানে সকলকে বিস্মিত করিতে সর্ব্বদাই প্রয়াসী। এই সমস্ত শাস্ত্রাভিমানী লোকের নিকট ভগবান্ অক্ষরসমষ্টি মাত্র, "রসো বৈ সঃ" রূপে প্রতিভাত নহেন। এই কারণেই শ্রীবিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগাবতারগণ গ্রন্থপাঠ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেদিন অধরলালের বাড়ী ভক্তসমাগমে উজ্জ্বল। ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ইঁহার স্বচরিত ভাবপূর্ণ গানগুলি শ্রীপরমহংসদেব শুনিতে ভালবাসিতেন। কীর্ত্তন বেশ জমিয়া উঠিল, ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে নৃত্যের মধ্যে চেষ্টা থাকিত না, লঘুদেহ যেন ভক্তি-স্রোতে আপনি ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিলেই বুঝা যাইত ইহার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই, যেন তাললয়ের অনেক উর্দ্ধে অব্যক্ত প্রেমের মাধুর্য্য প্রতি পাদবিক্ষেপে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, তাঁহার ধর্ম্মজীবনে কীর্ত্তন ও নৃত্যের স্থান ছিল না, সে যুগের ইংরাজিশিক্ষিত সাধারণ লোকের মত তিনিও ইহার ভিতর অনেকটা লোকদেখান ভাব সন্দেহ করিতেন। এখনও অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট এইরূপ কীর্ত্তন "নেড়া-নেড়িদের" অনুকরণে উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের শাসনদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী গৌরব অনুভব করেন, ইংরাজিশিক্ষা যাঁহাদের মনের প্রতি অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত, তাঁহারা কীর্ত্তন শুনিয়া ভিক্ষুক বৈষ্ণবের মত ভাবাবেশে নৃত্য করিতে পারেন—ইহা কল্পনার অতীত। শিক্ষিত সমাজের এই মনোভাব কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীতগানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তি মদধারা
নাহি চাহি নাথ।

ভক্তির মাধুর্য্য হইতে যে বঞ্চিত সেই দীনের নিকট ভক্তি অনন্ত আনন্দের উৎস নহে, "উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদধারা" মাত্র। তাই বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ রাজকর্ম্মচারীগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শ্রীপরমহংসদেবকে দেখিলেন, তাঁহাদের মনের ভাব আজ অনুমানসাপেক্ষ, তথাপি সেই ভক্তি ও আনন্দের প্রবাহ তাঁহারা সেদিন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদায় গ্রহণের সময় শ্রীপরমহংসদেবকে নিজ বাটীতে একদিন যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।" ঠাকুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো! কি রকম ভক্ত সেখানে? যারা 'গোপাল গোপাল' 'কেশব কেশব' ব'লেছিল, তাদের মত কি?" তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পটী বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। কয়েকটী ধর্ম্মধ্বজী স্যাকরা ভক্তির ভান করিয়া খরিদ্দারগণকে ঠকাইত, ধর্ম্মের আচ্ছাদনের অন্তরালে ঘোর বিষয়াসক্ত মন লইয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিত। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভক্তগণের কথা বলিলেন, তাহারা সেই ভণ্ড স্যাক্‌রা শ্রেণীভুক্ত কিনা ঠাকুর জানিতে চাহিলেন। সাহিত্যসম্রাটের সহিত ঠাকুরের ইহাই শেষ কথা। সেদিন প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, সে বিরক্তিভাব কিছুতেই কাটিল না। ইহার পর উভয়ের মধ্যে আর দেখাশুনা হয় নাই।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ

উনবিংশ শতাব্দী মানবজাতির ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রাধান্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের অভ্যুদয় এই শতাব্দীতে মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষভাগে ধর্ম্মজগতে যে মহান্ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সাধারণতঃ আমারা বিস্মৃত হইয়া থাকি। ইংলণ্ডে Newman প্রমুখ সাধুগণের Oxford Movement, বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনা, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়,—এইগুলি সমস্ত জগৎ-ব্যাপী ধর্ম্মের নব নব রূপ ও আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটী উদাহরণ মাত্র। তখন ব্রাহ্মসমাজের যৌবন,—অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া সভ্যগণ প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন। দূরে দক্ষিণেশ্বরের বনরাজিবেষ্টিত মন্দিরের ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি সহায়ে ধর্ম্মের নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিতেছিলেন। কি করিয়া যে নিরক্ষর, অনাড়ম্বর শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সহিত মহাশক্তিশালী, ধন ও লোকবলে প্রদীপ্ত ব্রাহ্মসমাজের সংযোগ ও পরিচয় হইয়াছিল তাহা সত্য সত্যই ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিস্ময়কর। বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সাকারবাদী, ব্রাহ্মসমাজ নিরাকারবাদী, —প্রভেদ অত্যন্ত বিরাট ও গভীর। কিন্তু মিলনের কারণ আবিষ্কার করাও কষ্টসাধ্য নহে। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত Sir Gilbert Murray বলিয়াছেন "Dogma divides, religious experience unites" অর্থাৎ মতুয়ার বুদ্ধিতে বিরোধ কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি হইলে মিলন হয়।

এক্ষেত্রেও Dogma যাহা অসম্ভব করিয়া রাখিয়াছিল, religious experience তাহাকেই সহজ ও সরল করিয়া সংঘটিত করিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মসমাজ তথা কলিকাতার জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার মূলে রহিয়াছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র,—একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপিপাসা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন আনিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের অভিজ্ঞতা কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচার,' 'Sunday mirror' প্রভৃতি পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে লিখিতেছিলেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। নিমন্ত্রণে অথবা বিনা নিমন্ত্রণে ঠাকুর সিঁদুরিয়াপটীর মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘসা গলির জয়গোপাল সেন, বরাহনগরস্থ সিঁথি নামক পল্লীর বেণীমাধব পাল, নন্দন বাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ভক্তগণের গৃহে অথবা সমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ভক্তগণও দক্ষিণেশ্বরে ক্রমশঃ আসিতে আরম্ভ করেন। কে আগে আসিবেন, কে পরে যাইবেন, আহ্বান অথবা বিনা আহ্বানে যাইবেন কি না,—এ সমস্ত ছোট কথা সে যুগে কোন পক্ষেই উপস্থিত হইত না। তখন ইঁহাদের ভিতর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, সামাজিক শিষ্টাচার, পদগৌরবের সজ্ঞানতা, কিছুই কার্য্য করিত না, ছিল কেবলমাত্র সাধুসঙ্গের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মালোচনার তীব্র পিপাসা, সত্যের প্রতি নির্ম্মল অনুরাগ। কোথায় যাইলে আমি ছোট হইয়া পড়িব অথবা সমাজে নিন্দনীয় হইব, সে সমস্ত দুশ্চিন্তা কোন পক্ষের মনের ভিতর উদিত হইত না। এমন কি জাতিচিহ্নপরিত্যাগী এবং জাতিবিভাগ লোপ করিতে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মগণের সহিত এক পংক্তিতে পান ও আহার করিতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ কি প্রবল পার্থক্যই না এই

উভয় পক্ষের মধ্যে ছিল! ব্রাহ্মসমাজের যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন অথবা যাঁহাদের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত অথবা সমাদরে আহূত হইয়া গমন করিতেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সুপণ্ডিত, এক বিশাল ধর্ম্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া জনসমাজে সুপরিচিত; যাঁহার কাছে তাঁহারা আসিতেন বিদ্যার অহঙ্কার করিবার তাঁহার কিছুই ছিল না, তিনি কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত ধর্ম্মের বহিরঙ্গভূত কোন নিদর্শনই তিনি দেখাইতে পারিতেন না। অথচ এত বিরুদ্ধ উপাদানকে উপেক্ষা করিয়া উভয় পক্ষের শুদ্ধ মনের মিলন হইল,—ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সমাজে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ব্রাহ্মসমাজের প্রীতিবন্ধনের একটি বিশেষ কারণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতানিবাসী ধর্ম্মপিপাসু সাধারণ লোকগণ সহজেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। ব্রাহ্ম-সমাজে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্থান হয় নাই—কিন্তু ধর্ম্মের প্রথম উন্মাদনায় তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের দিকেই পরিচালিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যে সমস্ত প্রিয়পাত্র এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্র, তারক ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালীঘরে যান! যখন ঠিক্ হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না।" শ্রীরামকৃষ্ণহস্তে উত্তরকালে নরেন্দ্রের আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজির নিরাকারপ্রীতি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান তখন ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আচ্ছা তোমার সাকারে বিশ্বাস, না, নিরাকারে?" মহেন্দ্রনাথ তখনও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন, সুতরাং উত্তর দিলেন—"আজ্ঞা,

নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাক্‌হে হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তা ত ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরোনা যে এইটা কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটা বিশ্বাস, সেইটাই ধ'রে থাক্‌বে।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি হইতেই বুঝা যায় যে তিনি শিষ্যগণের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব মানিয়া লইয়াছিলেন এবং যৌবনে তাঁহাদের যে ভাব মনে স্থান পাইয়াছিল সেই ভাব ভঙ্গ করিবার প্রয়াস তিনি কখনও করেন নাই। ইহার ভিতর আরও একটা ব্যাপার নিগূঢ়ভাবে কার্য্য করিতেছিল। তখন হিন্দুসমাজে যুগসন্ধি। ধর্ম্মক্ষেত্রে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, ধর্ম্ম হইয়াছে পোষাকী জিনিষ, নিত্য জীবন-যাত্রার সহিত ধর্ম্মের সমস্ত সংযোগ সাধারণের জীবন হইতে বিলুপ্ত। অধিকাংশ হিন্দুগণ তখন ধর্ম্ম বলিতে বুঝিতেন মধ্যে মধ্যে মন্দিরে যাওয়া, পূজা দেওয়া, বড় জোর পূজা-পার্ব্বণের সময় দেবীর সম্মুখে মনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা। সুতরাং ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইবার সরসতা তাহাতে ছিল না। এমনই এক যুগে ব্রাহ্মসমাজের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ আনিয়াছিল প্রতিদিনের জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব ও আস্বাদ। ধর্ম্ম তখন দূরের জিনিষ নয়, অভিরুচিমত অথবা সময়মত পরিবার চাকচিক্যশালী পোষাক নয়, ধর্ম্ম নিত্যজীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করিবার, আস্বাদ করিবার জিনিষ। এই ধর্ম্মের ছোঁয়াচ লাগিয়া চরিত্র পবিত্র হইল, পারিবারিক জীবন ভদ্র ও শান্ত হইল, সত্য অনুভূতির জিনিষ হইল, প্রতি মানুষের ভিতর ব্রহ্ম বিরাজমান ভাবিয়া জাতি ও ধর্ম্মের অহঙ্কার দূরীভূত হইল। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া যখন নরেন্দ্রপ্রমুখ ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মনের মলিনতা তিরোহিত হইয়াছে, চরিত্রের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বীজ রোপণের জন্য ভূমি কর্ষিত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি সহায়ে এই সমস্ত বিশুদ্ধ আধার দেখিয়া আনন্দের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মসমাজকে সমাদরের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার কার্য্যের অনেকটা,—যাহাকে ইংরাজিতে Spade work বলে,—ব্রাহ্মসমাজ করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং যখন প্রথম দর্শনের দিনে নরেন্দ্রনাথ কাতরকণ্ঠে গাহিলেন—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।

—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধিত হইল, কারণ ব্রাহ্মসমাজ বহুযত্নে বহু সাধনায় এইরূপ হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন,—এখন বীজ রোপণ করিবার অপেক্ষা মাত্র। মালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বীজ রোপণ করিলেন, শ্রবণকীর্ত্তনবারি সেচন করিতে লাগিলেন, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিবার উপক্রম করিল।

ব্রাহ্মসমাজের যে সমস্ত লোক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সহিত ঠাকুরের এক নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার একটা বিশেষ কারণও ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন কবি ও সাধক। শ্রীরামকৃষ্ণের যাহাকিছু আধ্যাত্মিক ভাব ও অবস্থা উপস্থিত হইত তাহাদের ভাষা দিতেন এই ভক্তকবি ত্রৈলোক্যনাথ। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-পুস্তকে ইনি চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামে পরিচিত। কত পিপাসিত হৃদয়ে চিরঞ্জীব এখনও ভক্তিরসধারা পরিবেশন করিতেছেন, কত ভক্তহৃদয়ের মূক আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে তিনি এখনও ভাষায় মূর্ত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গোচর করিতেছেন, কত উৎসবের দিনে তিনি এখনও আনন্দের উৎসধারা সৃজন করিতেছেন তাহা ধর্ম্মসমাজের সন্ধানীব্যক্তিমাত্রেরই সুগোচর।

শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা অনেকেই দেখিতেন, কেহ কেহ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, কিন্তু তাহার পর ভাষায় প্রকাশ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইবার ক্ষমতা ভক্তগণের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। তাই "ভক্তের রাজা" শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র সভাকবি ছিলেন শ্রীত্রৈলোক্যনাথ। ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাব ও সমাধির অবস্থা যখন ত্রৈলোক্যনাথ ভাষার নৈবেদ্য সাজাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ফিরাইয়া দিতেন তখন ঠাকুর এই উপহার বড়ই উপভোগ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দিতেন ভাব, ত্রৈলোক্যনাথ দিতেন ভাষা,—এইরূপ পরস্পর আদান প্রদানের ভিতর দিয়া উভয়ের প্রীতি ও সখ্যভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথ গাহিতেন

গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার

অথবা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান করে হয়ে গিরিগুহাবাসী।

গান শুনিয়া কখনও বা ঠাকুর অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেন, কখনও বা আনন্দে নৃত্য করিতেন। আবার হয়ত গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত অবস্থান করিতেন। এইরূপ নৃত্য ও আনন্দ-সঙ্গীতে কতদিন গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া উঠিত, বহুশতাব্দী পূর্ব্বের নবদ্বীপের ভ্রম উৎপাদন করিত, ঠাকুর প্রফুল্ল হইয়া ত্রৈলোক্যনাথকে বলিতেন—"আহা! তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক্ ঠিক্। যে সমুদ্রে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায়।" গানের এত বড় সার্থকতা সচরাচর দেখা যায় না, এমন প্রশংসাবাণীও কম গায়কের ভাগ্যেই লাভ হইয়া থাকে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণও ত্রৈলোক্যনাথকে শুনাইয়া শুনাইয়া গাহিতেন

ত্বং হি কালী-তারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বং হি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বং হি জলস্থল অনিল অনল,
ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিণী।
... ...
সাকার সাধকে তুমি হে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়,
সেও তুমি নগতনয়া জননী॥

এইরূপে অরূপের রূপ ভাবার ভিতর দিয়া মূর্ত্ত হইয়া সমবেত ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিত।

ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন ভক্তের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সখ্যভাবের সম্বন্ধ ছিল। কত নির্ম্মল হাস্য পরিহাস, আনন্দকোলাহলে ঠাকুর ইহাদের সহিত সময় অতিবাহিত করিতেন তাহার নির্ণয় নাই। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণনামে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে সীমা টানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার আধ্যাত্মিক দূরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, আবার কেহবা তাঁহাকে গুরুর গৌরব শিখরে অধিষ্ঠাপিত করিয়া আপনাকে বহু নিম্নে রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন। ফল একই হইত,—শ্রীরামকৃষ্ণবেষ্টনীর বাহিরেই এই উভয় শ্রেণির ভক্তের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু যে কয়েকজন ভাগ্যবান লোককে ঠাকুর সখাভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ, পণ্ডিত শিবনাথ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্ত জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে লালপেড়ে ধুতি পরিয়া গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কৌতুক করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন,

"আজ বড় যে রং, লালপাড়ের বাহার !" শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।" কেশবচন্দ্রের সহিত সখ্যভাবে হাস্যকৌতুকের এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে। আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"বাসনা না থাক্‌লে শরীর ধারণ হয় না; আমার একটী আধটী সাধ ছিল।" তৎক্ষণাৎ ত্রৈলোক্যনাথ হাস্য করিয়া কহিলেন—"সাধ কি মিটেছে ?" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"একটি বাকী আছে।" সভাস্থলে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। 'সাধ কি মিটেছে ?'—এই কথাগুলির প্রত্যেকটী অক্ষরের ভিতর সখ্যভাবের যে মধুর রস নিহিত রহিয়াছে তাহা অনুভব করিতে বিশেষ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। কালতরঙ্গে কোথায় সেই হাসি হারাইয়া গিয়াছে তথাপি ত্রৈলোক্যনাথের তিনটী ছোট কথার ভিতর যে কোমলতা, রহস্য ও সখ্যপ্রীতি পরিস্ফুট তাহা আজিও পাঠককে আনন্দ প্রদান করিতেছে। আর একদিনের কথা। ত্রৈলোক্যনাথ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরভজনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের বহির্ভূত ছিল। অথচ নরেন্দ্র প্রভৃতি চিহ্নিত সেবক-গণকে শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার কামিনীকাঞ্চনত্যাগের মন্ত্র শুনাইতেন। ঠাকুরের কথার সময় বিভিন্ন স্তরের ভক্ত উপস্থিত থাকিতেন কিন্তু কোন কথা হয়ত কোন বিশেষ ভক্তের জীবনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইত, অপর সকলে সেই কথা শুনিয়া অনেক সময় চিন্তার গোলমালের মধ্যে পড়িয়া যাইতেন। এইরূপ একদিন কথাবার্ত্তার সময় ত্রৈলোক্যনাথ প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—"সংসারে যথার্থ্য কি জ্ঞান হয় ? ঈশ্বরলাভ হয় ?" শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"কেনগো তুমি তো সারে মাতে আছো। কেন সংসারে হবে না ?" কথাগুলি শুনিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিতও

শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ সখ্যরসের সম্বন্ধ ছিল। ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে ঠাকুর মুখের দিকে তাকাইতেন এবং শিবনাথের চক্ষুতে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত পাইয়া উৎসাহ সহকারে সেই প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচনা করিতেন। ঠাকুর শিবনাথকে বলিতেন "আমার গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে ভারী খুসী হয়। হয়ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে। আবার আমীর দেখিলে হয়ত তাকায় না।" এই সমস্ত কথবার্ত্তার ভিতর দিয়া উভয়ের অন্তরের প্রীতি ও বন্ধুভাব অনেক সময় সূচিত হইত।

কখনও কখনও রহস্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের তীব্র সমালোচনা করিতেন। একদিনের কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে। সেদিন নববিধান সমাজে যাইয়া ঠাকুর কেশবচন্দ্রের উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলিলেন —"তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখিলাম, কি মনে হইল জানো? দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখনও কখনও হনুমানের পাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে,—যেন কত ভালো, কিছু জানে না। কিন্তু তা নয়, তারা তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে,—কোন গৃহস্থের চালে লাউ বা কুমড়াটা আছে, কাহার বাগানে কলা বা বেগুণ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে উপ্‌ করিয়া সেখানে গিয়া পড়িয়া সেইগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উদর পূর্ত্তি করে। অনেকের ধ্যান দেখিলাম ঠিক্‌ সেই রকম।" কথাগুলি বাস্তবিক পক্ষে সমাজের কোন কোন সভ্যের কঠোর সমালোচনা হইলেও সখ্যরসে সিঞ্চিত হইয়া তাহারা এমনই সরস হইয়াছিল যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেইদিন খুব হাস্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের হনুমান—ভক্ত-তুলনামূলক রহস্যটী অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের দোষত্রুটির নির্ভীক্‌ সমালোচক ছিলেন। বন্ধুত্বের খাতিরে সত্য অভিমত গোপন করিয়া কথা বলা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। এইরূপে তিনি তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের অশেষ কল্যাণ

সাধন করিয়াছিলেন। অবশ্য নির্ভীক সমালোচনা শ্রবণ করিবার মত শক্তি সে যুগের ব্রাহ্মভক্তের ছিল, নিজমতের প্রতিকূল কিছু শুনিবার মত সহনশীলতাও অনেক ব্রাহ্মগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারের উপাসনা প্রচলিত বলিয়া সাকার পূজার কোন সার্থকতাই ব্রাহ্মসমাজ স্বীকার করে না। এইখানে ব্রাহ্মসমাজের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুতর মতভেদ ছিল এবং তদানীন্তন ব্রাহ্মভক্তগণকে সাকার পূজার সার্থকতা বুঝাইতে না পারিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের ভিতর হইতে সাকারবাদীদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি অন্ততঃ একজন ব্রাহ্ম আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে নিরাকারের উপাসনা হইতে সাকার উপাসনায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন,—তিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি যে ভগবানের পূজার একমাত্র পন্থা নহে তাহা ব্রাহ্মগণ বুঝিতে পারিতেন না, তাই 'যত মত তত পথ'—এই মহাসত্যের ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার তাঁহাদিগকে এইকথা শুনাইতেন, নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস আঁকড়িয়া থাকিতে উপদেশ দিতেন অথচ তাঁহারা যাহা জানেন তাহাই যে ধর্ম্মের শেষ এবং একমাত্র কথা তাহা মনে করিলে ভুল হইবে, ইহা বুঝাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাহারও ভাব ভঙ্গ করিতেন না, অধিকারীভেদে পথ বিভিন্ন, প্রথা বিভিন্ন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিখ্যাত ইংরাজ লেখিকা George Eliot কথাটি বুঝিতেন এবং বিশ্বাসে আঘাত লাগিলে কি শোচনীয় ফল হয় তাহা তিনি একটি গ্রন্থে বিশদ্‌ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "The little light he possessed spread its beams so narrowly that frustrated belief was a curtain broad enough to create for him the blackness of night." (যেটুকু ধর্ম্মের আলো সে পাইয়াছিল তাহার জ্যোতি এতই ক্ষীণ যে, বিশ্বাসে আঘাত লাগিবামাত্র তাহার জীবনে সমস্তই অন্ধকার

হইয়া গেল)। সাধারণ লোকের তো little light, ক্ষীণ আলো, একবার আঘাত লাগিলে চারিদিক অন্ধকার! তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কাহারও পথ ভুল বলিয়া মনে করিতেন না, শুদ্ধ আগ্রহশীল মনই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার এই উপদেশ ও অনুভূতির ফলে ব্রাহ্মভক্তগণের মধ্যে অনেকেই "মৃন্ময়ী" দেবীকে "চিন্ময়ী" বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও অন্ততঃ শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং এই উপাসনা পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেন। সবই তাঁহার ভাল লাগিত কিন্তু ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ ভগবানের ঐশ্বর্য্যলীলা সম্বন্ধে বারংবার উল্লেখ করিতেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক সময় বিরক্তির কারণ হইত। ভগবান গ্রহনক্ষত্র তারকা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরও কত কি সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছায় আবার সমস্ত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে,—ইহা যুক্তি তর্কের দিক্ হইতে সত্য হইলেও ধর্ম্মানুভূতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। সেই জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা ভগবানের রস-স্বরূপের উপর মনঃসংযোগ করিতে বারংবার আচার্য্যগণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্যচিন্তা করিলে বিহ্বল হইতে হয়, ভগবানের শক্তি ধারণা করিতে যাইলে মন ভীত হইয়া পড়ে, ভগবানকে একান্ত প্রিয়জন বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir Jeans লিখিয়াছেন যে সমস্ত বিশ্বের পরিকল্পনা একবার ধারণা করিলে আমাদের মন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। তিনি লিখিয়াছেন "Standing on our microscopic fragment of a grain of sand, we attempt to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. Our first impression is something akin to terror." অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের তুলনায় একটি বালুকণার

মত আমাদের এই পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি এবং উদ্দেশ্য ধারণা করিতে যাইলে আমাদের মনে ভীতির উদয় হয়। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবিলে সহজেই নিজের সম্বন্ধে ক্ষুদ্রতাবোধ আসিয়া পড়ে এবং ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় মানুষ নিজের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে ভীতি-বিহ্বল সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। অথচ নিত্য অনুভূত রসের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা মানুষের পক্ষে অনেক সহজ। তাই তিনি কাহারও পিতা, কাহারও বা প্রভু, সখা অথবা প্রিয়,—ইহাই ধর্ম্মজীবনের সহজ ও সরল পথ। "পিতা নোঽসি", —উপনিষদের এই মহাবাক্যই আমাদিগকে ভগবানের নিকটে যাইবার পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ পিতা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেও বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা এত বেশী করিয়া চিন্তা করিয়া থাকে যে "পিতা" কথাটি কেবলমাত্র মুখের কথাই হইয়া দাঁড়ায়, অনুভূতির বিষয় হয় না। বালক যেমন মহারাজাধিরাজ পিতারও ঐশ্বর্য্যের সন্ধান রাখে না, পিতার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সচেতন নয়, সেইরূপ প্রকৃত ভক্ত ভগবানের মহান্ ঐশ্বর্য্যের কোন সংবাদ রাখিতে উৎসুক হয় না,—তিনি পিতা, আমি পুত্র, ইহা জানিয়াই আনন্দে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন— "সন্তান কি তার বাপের সম্মুখে বসে, বাবার কত বাড়ি, কত ঘোড়া, কত গরু, কত বাগ্‌বাগিচা আছে—এই সব ভাবে ?"

ঐশ্বর্য্য চিন্তনের ফলে হৃদয়ের ভাব ও ভালবাসার উৎস যে কিরূপে শুকাইয়া যায় তাহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানকে বালগোপালরূপে স্নেহ করিতেন, সেবা করিতেন। সেইরূপে ছোট হইয়াই ভগবান ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইলেন এবং একত্র ভক্ষণ, শয়ন প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্যগুলিও

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে নিত্যমধুর সম্বন্ধ স্থাপিত করিল। একদিন রাত্রিতে বালগোপাল ভক্তের ক্রোড়ের নিকট শয়ন করিয়া আছেন, অদূরে বিড়াল ডাকিতেছে, গোপাল ভীত হইয়া ভক্তের আরও নিকটে আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন। আজ ভক্তের স্মৃতিভ্রংশ হইল। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনি আজ সামান্য মানব শিশুর মত বিড়ালের ডাকে ভীত হইতেছেন। এইরূপ ঐশ্বর্য্যচিন্তা যে মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল সেই মুহূর্ত্তেই বাৎসল্য রসের আনন্দ হইতে ভক্ত বঞ্চিত হইলেন, বালগোপালের দর্শন আর পাইলেন না। ঐশ্বর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না, বালগোপালও তিরোহিত হইলেন,—ভক্ত একূল ওকূল দুকূলই হারাইলেন। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে ভজে হরি
সদাই মানস পথে স্নেহাবেশ করি।
ভজিতেই ভাবসিদ্ধি বিপ্রের হইল
বাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাত পাইল।
... ...
লালন পালন করে পুত্র করি জ্ঞান
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন।
রাত্রে ক্রোড়ে করি বিপ্র করয়ে শয়ন
হাথ চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন।
একদিন রাত্রে ঘরে বিড়াল ডাকয়ে
গোপাল নিদ্রা না যায় চমকি উঠয়ে।
ক্ষণে ক্ষণে বিপ্রের গলা চাপিয়া ধরয়
'কেনে' 'কেনে' বলি সাধু বক্ষঃস্থলে লয়।
গোপাল কান্দিয়া কহে মোরে ভয় করে

অই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে।
কোলের ভিতরে দাবি ব্রাহ্মণ কহয়
না না না না ভয় নাই বিড়াল ডাকয়।
একদিন দ্বিজে কিবা দুর্দ্দৈব ঘটিল
ঐশ্বর্য্যের ভাব আসি উদয় হইল।
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদ্‌ভূত
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত।
দেবের দেবতা বিভু কালের যে কাল
ভয়ের যে ভয় হয় যমের করাল।
বিড়ালের ডাকে ঞিহো ভয় পায় কেনে
মুগধ বালক প্রায় কান্দে কি কারণে।
এতেক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেলা
ঐশ্বর্য্য ভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিলা।
ভাবান্তর বুঝি কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা
হাহাকার করি বিপ্র ভূমিতে পড়িলা। (ভক্তমাল)

ব্রাহ্মসমাজের আর একটি বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধেও তিনি ব্রাহ্মভক্তগণের নিকট বারংবার নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিশেষ করিয়া আলোচনা হইত, ব্রাহ্মগণ জীবনে এই দুই পথই অনুসরণ করিতে যত্নবান ছিলেন। শুদ্ধা ভক্তি কি জিনিব তাহা ব্রাহ্মসমাজের সেদিনে কেহই বুঝিতেন না, এমন কি হিন্দুসমাজেও কাহারও কাহারও নিকট ভক্তিমার্গ "নেড়ানেড়ির" ধর্ম্ম বলিয়া একটা ঘৃণা ও অবহেলার বস্তু ছিল। সাধারণ লোকে সকলে মিলিয়া একযোগে উপাসনা করার (congregational prayer) যে আনন্দ ও উৎসাহ আছে তাহা ব্রাহ্মসমাজ বুঝিত; ব্রাহ্মসমাজে নরনারী মিলিত হইয়া একত্র উপাসনা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই

সমবেত প্রার্থনার আনন্দরস জানিতেন, তাই নিজে সময় সময় সমাজে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিতেন, ভক্তগণকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেন—"এতো লোক একসঙ্গে ভগবানকে ডাকৃছে দেখ্‌লে উদ্দীপনা হয়।" কিন্তু এই সমবেত উপাসনার যাহাতে চরম অভিব্যক্তি, সেই কীর্ত্তনানন্দ ব্রাহ্মগণ ধারণায় আনিতে পারিতেন না। তাহার কারণ ছিল, কীর্ত্তন হইল ভক্তি-সাধনার বহিঃপ্রকাশ এবং এই ভক্তিসাধনার উপরে ব্রাহ্মগণের আস্থা ছিল না, ইহা তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মের নামে কুরুচির প্রশ্রয়মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মমনের এই ভাব উত্তরকালে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধাভক্তির নৃত্যগীত-গানকে 'ভাবোন্মদমত্ততা' 'ভক্তিমদধারা' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, তিনি এমন ভক্তিরস প্রার্থনা করিয়াছেন যাহা পাইয়া

সম্বরিয়া ভাব অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর॥

বুদ্ধির মাপে ওজন করা এমন ভক্তির কথা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে কখনও শুনা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবের শুদ্ধাভক্তি বুঝিতেন না, ভক্তিরসের অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ যে আনন্দের নৃত্য তাহাও রবীন্দ্রনাথ কখনও দেখেন নাই; তিনি বুঝিতেন জ্ঞান, সুতরাং যে ভক্তি তিনি চাহিতেছেন তাহা শুষ্ক জ্ঞান মাত্র, রসময়ী ভক্তি নহে। ভাব অশ্রুনীর থাকিবে না অথচ অন্তরে ভক্তি থাকিবে, ইহা সোণার পাথরবাটীর মত বাক্যের অপব্যবহার মাত্র।

কিন্তু ইহাই ছিল সেদিনকার ব্রাহ্মসমাজের অন্তরের কথা। ভক্তির প্রতি এইরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিরস আনয়ন করিলেন, ভক্তির স্বরূপ নিজ জীবনের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল।" শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তগণকে বুঝাইলেন "কর্ম্মযোগ বড় কঠিন।

ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।” ভক্তি হইতেই জ্ঞান হয়, ভক্তি হইলে তবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “ভক্তিপথে অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুণি লাগবে।” এক কথায় ভক্তিতেই ভক্তের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তগণকে মুখের কথা, অন্তরের বিশ্বাস ও নিজ জীবনের সাধনার দ্বারা বারংবার বুঝাইলেন। বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মভক্তগণ সিঁদুরিয়াপটীর মণি মল্লিকের বাড়িতে উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শুনিলেন, নৃত্য দেখিলেন, সমস্ত জিনিষটা যেন হৃদয়ে গভীর ছাপ রাখিয়া যাইল। স্বামী সারদানন্দ এখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, “অপূর্ব্ব দৃশ্য! সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে।…আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনও বা ঐরূপে পশ্চাতে হঠিয়া আসিতেছেন।…সে এক অপূর্ব্ব নৃত্য! তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই। তিনি যেন আনন্দসাগর ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ সংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। …সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ত কথাই নাই, অন্য ব্রাহ্মভক্ত সকলের অনেকেও সেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর সুকণ্ঠ আচার্য্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারা সহায়ে—‘নাচ্ রে আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে,’—ইত্যাদি সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন।” সেদিন ব্রাহ্মভক্ত, হিন্দুভক্ত, শাক্ত, বৈষ্ণব ছিলেন, বালক, যুবক, বৃদ্ধ ছিলেন, পণ্ডিত ও মূর্খ ছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও নৃত্য হইয়াছিল একমাত্র ব্রাহ্মভক্তগণকে উদ্দেশ করিয়া, একমাত্র ব্রাহ্মভক্তগণের

চিত্ত স্পর্শ করিবার জন্য। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে তখনকার দিনের ব্রাহ্মগণ অনেকেই ভক্ত ও বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের চেষ্টা সফল হইল,—ব্রাহ্মসমাজ ভক্তিবাদ গ্রহণ করিল। ভক্তিরস প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে সমবেত কণ্ঠে কীর্ত্তন আসিল, কীর্ত্তনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে আনন্দ নৃত্যও দেখা দিল। সবিস্ময়ে সাধারণ দর্শকগণ একদিন দেখিলেন কর্ম্মবীর, পরমগম্ভীরপ্রকৃতি শ্রীআনন্দ মোহন বসু হাততালি দিয়া ব্রহ্মনামসহ নৃত্য করিতে করিতে নব নির্ম্মিত ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিতেছেন! এইরূপে ভক্তিঠাকুরাণী ব্রাহ্মহৃদয় অধিকার করিয়া ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আপনার আসন স্থাপিত করিলেন।

কিন্তু তুইটী বিশুদ্ধ চরিত্র পাশাপাশি থাকিলে যেমন পরস্পরকে প্রভাবান্বিত অবশ্যই করিয়া থাকে সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ব্রাহ্মসমাজকে দিয়াছিলেন তেমনই অনেক জিনিষ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন,—এমন জিনিষ পাইয়াছিলেন যাহা হয়ত জগতে অন্য কাহারও নিকট তিনি আশা করেন নাই। প্রথমেই দেখা যায় যে সেযুগে অহেতুকী প্রীতির বন্ধন শ্রীরামকৃষ্ণের অধিক সংখ্যক লোকের সহিত ছিল না,—শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভক্তের কাঙ্গাল, তাঁহার এই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইত ব্রাহ্মভক্তগণ। তাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অসুস্থ হইলে ঠাকুর ঠন্‌ঠনিয়ার শ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিকট ডাব ও চিনি পূজা দিয়া কেশবচন্দ্রের সুস্থতা কামনা করিয়াছিলেন। ঘটনাটী সামান্য হইলেও ইহার ব্যঞ্জনা অত্যন্ত গভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বা অপরের ব্যাধি আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিতেন না, কিন্তু সাধারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেশবচন্দ্রের জন্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা বড় সহজ বন্ধুপ্রীতি নহে। রাখালের অসুখের সময় একবার এইরূপ পূজা মানত করিয়াছিলেন কিন্তু রাখাল ছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র, রাখালের সহিত অন্য কাহারও তুলনা

হয় না। তাই আমরা দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ব্রাহ্মভক্তগণের ছিল সর্ব্বমলিনতা বর্জ্জিত, আনন্দময়, অহেতুকী সম্বন্ধ। তাঁহাদের সাহায্যে যে আনন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ পাইতেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ দান, সেই দান গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত, তিনি নাচিতেন, গাহিতেন, চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিকীরণ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মভক্তগণ তাঁহাদের রচিত অনেক জীবন্ত সঙ্গীত শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইতেন এবং সেই সঙ্গীত-প্রসূত ভাবলহরী ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণহৃদয়ে উথিত হইয়া তাঁহাকে বিমল আনন্দ প্রদান করিত। 'মন চল নিজ নিকেতনে,' 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী', 'চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে', 'গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার', 'জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য, পরাৎপর তুমি সারাৎসার', প্রভৃতি গানগুলি ব্রাহ্মসমাজের প্রাণের কথা ছিল এবং এই সমস্ত গান শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মোহিত হইতেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিয়া যাইত। বিশেষ করিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উনিশ বৎসর বয়সে রচিত একটী গানের কথা এইখানে উল্লেখযোগ্য।

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ
তোমারি রচিত ছন্দ, মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ ল'য়ে,
আমিও দুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি,
গায় যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর, শ্যামপুকুর বাটীতে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান নরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। "কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি"—এই পংক্তিটী বিশেষ করিয়া

শ্রীরামকৃষ্ণের মনে লাগিয়াছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। এই সমস্ত শুদ্ধভাব ও অনুভূতিপ্রসূত গানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের অমূল্য দানরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, ভক্তেরা একটা বিভিন্ন জাতি ইহা হাতে-কলমে ব্রাহ্মভক্তগণই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে প্রমাণিত করিয়াছিলেন। যে পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে শূদ্রবংশসম্ভূতা রাণী রাসমণির চাউল ও তরকারী গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, শূদ্র প্রতিগ্রাহী হইলে ধর্ম্মে পতিত হইবেন বলিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ জাতিচিহ্নবিহীন ব্রাহ্মগণের সহিত পরমানন্দে পান-ভোজন করিতেন। এই ব্রাহ্মভক্তগণ ইহ জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সত্য অনুভূতি—"ভক্তেরা একটা আলাদা জাত"—প্রমাণ করিয়াছিলেন, ঠাকুরের মনে এই বিশ্বাস কার্য্যের দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, সেই অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ধর্ম্মের নামে "ঢলাঢলি" দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, বহুবিধ কামনা লইয়া তাঁহার নিকট বিষয়ী লোককে আসিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মভক্তগণ শুদ্ধাচারে ধর্ম্মসাধন করিয়া পরমহংসদেবকে প্রীত করিয়াছিলেন, সর্ব্ববিধ স্বার্থবর্জ্জিত বিশুদ্ধ সাধুসঙ্গলিপ্সা লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সত্য-প্রচারের উৎসাহ ও অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পঞ্চমতঃ, ব্রাহ্মভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের মনে তাঁহার অতীতের নিরাকার সাধনার স্মৃতি সর্ব্বদাই জাগরিত রাখিতেন। তাই ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গরূপে যেমন দেব-দেবীর মন্দির দেখিলেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম করিতেন তেমনই ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে আসিলেও করযোড়ে প্রণাম করিতেন, আবার কীর্ত্তনের শেষে যখন "ভাগবত, ভক্ত, ভগবান" নামোচ্চারণ করিয়া প্রণাম জানাইতেন তখন সময় সময় বলিতেন, "আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও প্রণাম।" ইহার কারণ এই ছিল যে "আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীরাই" শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অতীতের

ব্রহ্মসাধনাকে সর্ব্বদা এমনই জাগরূক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে শ্রীভবতারিণীর অনুক্ষণ দর্শন, স্মরণ, মননও ঠাকুরের সেই নিরাকার প্রীতিকে চাপা দিতে অথবা ভুলাইতে পারে নাই। এমনই অনেক বিষয় ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তগণের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন —"ব্রাহ্মসমাজ ও সঙ্ঘকে নিজ অলৌকিক সাধনলব্ধ ভাব ও আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ সমূহ প্রদান করিতে যাইয়া ঠাকুর অনেক কথা স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছিলেন।" পরমভক্ত, মহাপণ্ডিত স্বামীজির এই কথা অনুধাবন করিলে মহাকবির এই অমূল্য বাণী মনে পড়ে

গ্রহণ ক'রেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

ব্রাহ্মসমাজ ঠাকুরের দান গ্রহণ করিয়াই ঠাকুরকে ঋণী করিয়াছিল, সেই ঋণের দায় ভক্তসমাজ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ অপূর্ব্ব সম্বন্ধ ছিল। যে ধর্ম্ম প্রাণবান্, যে ধর্ম্ম গতিশীল, সেই ধর্ম্মের পরমভক্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তা সে ধর্ম্ম সাকারবাদীর ধর্ম্মই হউক, নিরাকারবাদীর ধর্ম্মই হউক, হিন্দুধর্ম্ম অথবা খৃষ্টান ধর্ম্মই হউক,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানুষের হৃদয়ে আগুণের ছোঁয়াচ লাগাইবার উজ্জ্বল দীপশিখা শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত সাধু এবং তাঁহার নিজের ভাষায়—'সাধু জগৎগুরু।' এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রভাবের একমাত্র রহস্য। যাঁহার ভিতরে আলো আছে তিনি নিজেকেও আলোক দেন, অপরকেও আলোকিত করেন, তিনি যে কথা বলেন তাহা আলোর ভিতর দিয়া আসে বলিয়া সে কথা ঝাপ্‌সা অথবা অস্পষ্ট হয় না। সিটীকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ব্রাহ্মভক্ত শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন যে, মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী,—"হে মাঘোৎসবের দেবতা"—বলিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবামাত্র মৈত্র মহাশয়ের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত সেই স্মৃতি

মৈত্র মহাশয়ের অন্তরে পুলকের সৃষ্টি করিত। 'হে মাঘোৎসবের দেবতা', —কথাগুলি কিন্তু কিছুই অদ্ভুত অথবা নূতন নহে কিন্তু যিনি সেই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তিনি সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে মাঘোৎসবের দেবতাকে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অনুভূতিপ্রসূত কথাগুলি সহজেই শুদ্ধমনে পুলকের সঞ্চার করিয়াছিল। নিজের ভিতরে বস্তু না থাকিলে শুধু মুখের কথায় অপরের হৃদয় স্পর্শকরা সম্ভবপর নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অচপল জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মভক্তগণ—'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'—দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইতেন। সেই যুগে বিপরীত পথগামী সাকারবাদীর ধর্ম্মস্রোত ও নিরাকারবাদীর ধর্ম্মপ্রবাহ তাই বিধিবহির্ভূত উপায়ে সম্মিলিত হইয়া যে প্রবল শুদ্ধভাবরাশির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার শীতল জলে অবগাহন করিয়া গৃহী ও সন্ন্যাসী, হিন্দু ও ব্রাহ্ম, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই শীতল হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর কে ব্রাহ্ম, কে হিন্দু, কেহ খোঁজ লয় নাই, সাকার-নিরাকার একাকার হইয়া গিয়াছিল। মূল কথা সেই এক—"Dogma divides, religious experience unites" অর্থাৎ মতুয়ার বুদ্ধিতে বিরোধ, কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি হইলে মিলন সহজেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম্মবাদ

ধর্ম্মজীবনে কর্ম্মের স্থান ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমত ও আদর্শ কি ছিল তাহা জানিবার কৌতূহল সাধারণ পাঠকের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য, দেহরক্ষার জন্য আহার সংগ্রহ প্রভৃতি অপরিহার্য্য ব্যাপারগুলিও অনেক সময় কর্ম্মের সংজ্ঞার ভিতর আসিয়া পড়ে। কিন্তু এইগুলি পশু ও মনুষ্যের মধ্যে সাধারণ, সুতরাং কর্ম্মকে এত ব্যাপকভাবে স্বীকার না করিয়া সাধারণতঃ মানুষের যে সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টাগুলিকে কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাদান, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জনসাধারণকে অন্নদান, ব্যাধিক্লিষ্ট নরনারীর রোগনিরাময়ের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, সভাসমিতি আহ্বান করিয়া বক্তৃতাদ্বারা নিজসম্প্রদায়ের দলপুষ্টিসাধন— ইহাই বর্ত্তমান জগতে স্থূলভাবে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বন্ধনস্বরূপ অথবা মুক্তিপ্রদ, ব্রাহ্মীস্থিতির অবস্থায় কর্ম্মকরা সম্ভবপর কিনা, সর্ব্বত্যাগী সাধুগণের পক্ষে ধর্ম্মজীবনের অঙ্গরূপে কর্ম্ম আচরণীয় অথবা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য,—এই সমস্ত বিষয়ে সাধুদিগের মধ্যেও বিশেষ মতভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতারও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বহুকাল যাবৎ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন গীতায় শ্রীভগবান জ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু অপর শ্রেণির ভাষ্যকারগণ কর্ম্মই ধর্ম্ম—ইহা গীতার মর্ম্মার্থ—বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে শ্রীভগবান বলিতেছেন 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' (আত্মজ্ঞানীর ইহ জগতে কর্ম্মানুষ্ঠানের

কোন প্রয়োজন নাই) আবার সেই আত্মজ্ঞানীগণকে 'সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' (সকল জীবের কল্যাণে রত) ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। স্থূলদৃষ্টিতে গীতায় কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের পরস্পর বিরোধী এইরূপ শ্লোকের অভাব নাই, একমাত্র যিনি সংস্কারবর্জ্জিত সাম্প্রদায়িকবুদ্ধিবিরহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গীতাপাঠ করিয়াছেন এই মহান্ গ্রন্থ দয়া করিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং সেই ভাগ্যবান মানুষের সর্ব্বসংশয় তিরোহিত হইয়াছে। অন্যথায় জ্ঞানও কর্ম্মের সংঘর্ষ ও বিতণ্ডার কুজ্ঝটিকায় এই মহান ধর্ম্মগ্রন্থও ক্ষতবিক্ষত।

কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস লইয়া মতবিরোধ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, এমন কি কর্ম্মের প্রধান রঙ্গভূমি ইউরোপেও এই মতভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল, ফরাসী পণ্ডিত Comte ও জার্ম্মাণ পণ্ডিত Schopenhaur এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই মতভেদের কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পণ্ডিতগণের সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডার মূলে 'সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' কথাগুলির অর্থ বিভিন্নতাই নিহিত রহিয়াছে। যিনি কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বভূতের কল্যাণে রত হওয়া কি সম্ভবপর? সাধারণতঃ মানুষ মনে করে যে হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে যে যোগী আত্মচিন্তায় নিমগ্ন তিনি যত মহান্ হউন না কেন তিনি স্বার্থপর; তিনি জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, সুতরাং এরূপ যোগীগণকে 'সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' বলা যায় না। এই মতবাদী লোকেরা কল্যাণ বলিতে স্থূলদেহের নানাবিধ কল্যাণ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু নিভৃতকন্দরনিবাসী যোগী অথবা সত্যসন্ধী নিষ্ক্রিয় মহাপুরুষ উভয়েই নিজ জীবন ও সাধনার দ্বারা অনুক্ষণ জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে। বরং স্থূলকর্ম্মের ফল ক্ষণস্থায়ী, বিশুদ্ধ মন ও আত্মার প্রভাব কল্পকল্পান্তরেও অক্ষয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। উনবিংশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে Amiel নামে জনৈক পণ্ডিত তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন "The man who has, however imperceptibly, helped in the work of the universe, has lived; the man who has been conscious, in however small a degree, of the cosmical movement, has lived also. The plain man serves the world by his action and as a wheel in the machine; the thinker serves it by his intellect and as a light upon its path. The man of meditative soul, who raises and comforts and sustains his travelling companions, plays a nobler part still, for he unites the other two utilities."

(যদি কোন লোক, যত অদৃশ্যভাবেই হউক না কেন, সংসারচক্রের গতিতে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবন সার্থক। যদি কোন লোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালন শক্তিকে স্বল্প পরিমাণেও অনুভব করিয়া থাকেন তাঁহারও জীবন সার্থক। সাধারণ লোক বৃহৎ যন্ত্রের একটী অংশরূপে আপন কর্ম্মের দ্বারা জগতের সেবা করিয়া থাকেন, মনীষিগণ নিজ বুদ্ধিশক্তির দ্বারা জগতের পথে আলোক সম্পাত করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু যে নিত্যযুক্ত সাধু সংসার পথযাত্রীগণকে সান্ত্বনা প্রদান ও আত্মধর্ম্মপালন করিতে সাহায্য করেন তাঁহার জীবন উপরোক্ত দুইজনের অপেক্ষাও অধিকতর সার্থক, কারণ তাঁহার জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে সেই উভয়বিধ কর্ম্মের সার্থকতা বর্ত্তমান রহিয়াছে)।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে বস্তুসর্ব্বস্ব এই বিংশশতাব্দীতে জড়বস্তুর মহান্ বেদী ইউরোপ হইতে সময় সময় এই একই অভিমত প্রচারিত হইতে শুনা গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির জনৈক অধ্যাপক লিখিয়াছেন

"Human beings are both ends in themselves and instruments of production……A man who is attuned to the beautiful in nature or in art, whose character is simple and sincere, whose passions are controlled and sympathies developed, is in himself an important element in the ethical value of the world; the way in which he feels and thinks actually constitutes a part of welfare……Efforts devoted to the production of people who are good instruments may involve a Failure to produce people who are good men."

(অর্থাৎ মানবজীবনের দ্বিবিধ সার্থকতা আছে—একদিকে জীবনেই জীবনের সার্থকতা, অপরদিকে সমাজের কল্যাণকর কর্ম্মে জীবনের সার্থকতা। যে ব্যক্তির জীবন প্রকৃতি অথবা কলাসৃষ্টির সৌন্দর্য্যের সহিত একসুরে গ্রথিত, যাঁহার চরিত্র সহজ ও সরল, যিনি আপন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার উদার মনুষ্যপ্রীতি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে স্বতঃস্ফূরিত, তাঁহার জীবনের মধ্যেই জগতের নৈতিক উন্নতির বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাঁহার চিন্তাপ্রণালী অথবা অনুভূতি সর্ব্বদাই জগতের কল্যাণসাধন করিতেছে।……কিন্তু যদি কর্ম্মী মানুষ-সৃষ্টির দিকে মানবজাতির সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা হয় তাহা হইলে হয়ত সাধুপ্রকৃতির মানুষ সৃষ্টির পক্ষে তাহা অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।)

একদিন একটী মৃত অশ্বের কঙ্কাল দেখিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মনে এই সন্দেহের উদয় হইয়াছিল—তাঁহারও জীবন কি একদিন এই কঙ্কালের মত মৃত্যুর পরিহাসমাত্রে পরিণত হইবে? এই অশ্ব একদিন গাড়ি টানিয়াছিল, পৃষ্ঠে আরোহীকে বহন করিয়াছিল, ঘাস জল খাইয়া অশ্বজীবন

রক্ষা করিয়া কত কাজ সে করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার সমস্ত জীবন ও কর্ম্মের পরিণতি এক বিচিত্র কঙ্কাল! কিন্তু মহাকবির সন্দেহ নিরসন হইল, তিনি বুঝিলেন তাঁহার কবিজীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে যে সত্যের আভাষ তিনি পাইয়াছেন, যে আনন্দ তিনি অনুভব করিয়াছেন তাহা মৃত্যুর ক্ষুদ্র গণ্ডী পরিবেষ্টিত নহে, সেই আভাষ ও অনুভূতির মধ্যেই তাঁহার জীবনের অখণ্ড সার্থকতা।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে॥

এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী সুন্দর ঘটনার বর্ণনা আছে। ধ্রুব তপস্যা করিতেছেন, শ্বাসরোধ করিয়া ধ্যানের দ্বারা ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া কঠোর সাধনায় নিরত। ধ্রুবের শ্বাসরোধে সমস্ত পৃথিবী ও দেবগণের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল,—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবৎ, ৪র্থ স্কন্ধে, ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যদি সাধনার প্রবলশক্তিতে জগতের শ্বাসরোধ হইতে পারে তাহা হইলে সেই শক্তিতে অথবা সৎসঙ্কল্পী মনের দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণও সম্ভবপর, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ অথবা মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। সুতরাং হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম না করিলেও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে যোগী ও সন্ন্যাসীগণের দ্বারা জগতের কল্যাণ অহঃরহঃ সাধিত হইতেছে, ইহাই শাস্ত্র ও সত্যনিষ্ঠ সাধুগণের অভিমত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্ম্মকে ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে কখনই স্বীকার করেন নাই। তিনি কর্ম্মযোগীগণকে এক বিভিন্ন স্তরের লোক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেন। "হাঁ, থাক্ আলাদা আছে, যারা

কর্ম্ম করতে আসে।” এই ‘থাক্’, নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ সত্ত্বগুণী সন্ন্যাসী অপেক্ষা হীন, সুতরাং যাঁহারা প্রকৃতিপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করে তাহারা “সকল কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ” করুক্, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যসাধন কর্ম্মনিরপেক্ষ। তিনি পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, কালীদর্শন করিতে কালীঘাটে যাইয়া রাস্তায় কেবল কাঙ্গালী বিদায় করিতেই যেন সময় অতিবাহিত না হইয়া যায়, বরং “যো সো করে একবার কালীদর্শন করে লও, তারপর যত কাঙ্গালী বিদায় করতে ইচ্ছা হয় কোরো।” “ইচ্ছা হয়”—এই কথাগুলির ভিতর নিগূঢ় অর্থ নিহিত রহিয়াছে। যদি কালীদর্শন সত্য সত্যই হইয়া থাকে তাহা হইলে মনে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য অপর কাহারও স্থান থাকেনা, “কোনো শূন্য রাখিওনা আর কারো তরে”—ইহাই সাধকের প্রার্থনা—এবং দেবীর কৃপা হইলে প্রার্থনা না করিলেও হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে এমন কোন ছিদ্র থাকে না যাহার ভিতর দিয়া অপর কেহ প্রবেশলাভ করিতে পারে। তাই শ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছেন কালীদর্শনের পর কাহারও যদি “ইচ্ছা হয়” তাহা হইলে কাঙ্গালী বিদায় করিতে পারে।

ধর্ম্মবিষয়ে শ্রীপরমহংসদেবের আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে পূজা আরাধনার বাহ্যপ্রকাশও তিনি অনুমোদন করিতেন না। তিনি বলিতেন “নমস্কার মানসেই ভাল। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার?” “পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়।” তাঁহার সমস্ত শিক্ষাই এইরূপ অন্তর্মুখী ছিল। জনৈক উপাসকের কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “উনি তো মার্কামারা।” স্থূলপূজা, স্থূল ধর্ম্মচিহ্ন কর্ম্মেরই অনুরূপ। এইরূপ ধর্ম্মলিঙ্গী মানুষের পূজা হয়ত বিশ্বপতি গ্রহণ করেন না, কারণ এইরূপ পূজা সাধারণতঃ অহঙ্কারের নামান্তর মাত্র। ভক্তমালে দেবকীনন্দন নামে এইরূপ পূজকের এক বিচিত্র বর্ণনা আছে।

"স্নান আদি করে সদা সন্ধ্যাদি বন্দনা।
হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন,
দশন উপরি করি চৌকীর আসন।
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া
দেবীপূজা করে এক বড়াই করিয়া।"

সর্ব্বদেশে ভক্ত ও জ্ঞানীগণের মধ্যে এইরূপ লোকপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী পূজকের নিন্দা আছে। সিমোমুরা নামে জনৈক জাপানী চিত্রকর এক পূজকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পূজক যেন বুদ্ধের ধ্যানে উপবিষ্ট অথচ চতুর্দ্দিকে তাহার প্রচ্ছন্ন রিপুসকল ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু এই সমস্ত রিপু বাহিরেই আছে। পূজাগৃহের ভিতরে তাহার সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা বড় রিপু বসিয়া আছে—ইহার মূর্ত্তি শ্রীবুদ্ধের মত—কিন্তু ঠিক্ শ্রীবুদ্ধ নয়, কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্ররূপ ধরিয়া এই সাধককে বঞ্চিত করিতেছে। এই রিপু আধ্যাত্মিক অহমিকা—দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া পূজক আপনার প্রবৃত্তির পূজা করিতেছে। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সভাসমিতি আহ্বান করাও শ্রীরামকৃষ্ণ হীনকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সভাসমিতির প্রয়োজন হয় না, ধর্ম্মের সৌরভে ভক্ত ভ্রমরের মত আপনা আপনিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

হরিভক্তি ছাপাইলে ছাপা নাহি যায়
মৃগমদ গন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায়।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। গোস্বামী প্রভু তখন তদীয় গুরুকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া সাধন-ভজনে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। একদিন জনৈক পীড়িত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাহার আত্মীয়স্বজন গোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃপা করিয়া রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধক বিজয়কৃষ্ণ রোগীর কাতর

চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রতি করুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র রোগী ব্যাধিমুক্ত হইয়া গেল। সকলে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইলে গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ভৎ'সনা করেন—ঈশ্বরলাভ সাধুর উদ্দেশ্য, ব্যাধি নিরাময় করা সেই উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী, আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যয় মাত্র। শিষ্য বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন তিনি রোগীর ব্যাধিশান্তির জন্য কোন প্রার্থনা করেন নাই, এমন কি একটী সান্ত্বনাবাক্যও উচ্চারণ করেন নাই; অথচ কিরূপে অপরাধী হইলেন! গুরু বলিলেন সাধুকে বাক্য অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনার দ্বারা কর্ম্ম করিতে হয় না, ইচ্ছামাত্রই কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ইচ্ছার সহিত মানবইচ্ছার সম্মিলনেই যে আধ্যাত্মিক শক্তির স্বাভাবিক পরিণতি সেই সাধনপ্রসূত ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে মধ্যপথে বিপরীতমুখী করিয়া মানবসেবায় নিযুক্ত করিলে যেমন একদিকে সেই কিশোর আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে তেমনই জগতের প্রকৃত কল্যাণসাধনেরও আশা সুদূরপরাহত হইয়া আপন উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়। নিজ ইচ্ছাস্রোতকে ভগবদ্ইচ্ছার সহিত মিলিত করাই মানবজীবনের সার্থকতা, যতক্ষণ ইচ্ছা স্বতন্ত্র রহিয়াছে ততদিন মানুষ জীবনের উদ্দেশ্যসাধন হইতে বহুদূরে পড়িয়া আছে। ইংরাজ কবি Tennyson বলিয়াছেন "Our wills are ours to make them thine" (আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার সহিত একীভূত করিতে হইবে) এবং একবার এই উদ্দেশ্য সফল হইলে ইচ্ছাশক্তি যে রূপ গ্রহণ করে তাহা দার্শনিক পণ্ডিতের ভাষায় "Will that wills nothing" (ইচ্ছা যাহা কিছুই ইচ্ছা করে না)। তখন 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' কারণ সেই ব্রহ্মভূত ব্যক্তি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান যে অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রবাহ ঠিক্ পথেই চলিয়াছে, ব্যাধি ও সুস্থতা, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা, অজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য সকলই নিজ নিজ স্থানে রহিয়াছে, অপ্রয়োজনে তাহারা কেহই আসে নাই,

সাধুর স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি পরিচালনার দ্বারা কোনটাকে অকালে স্থানভ্রষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। নিজ প্রয়োজন সাধিত হইলে তাহারা আপনা আপনিই কোথায় তিরোহিত হইয়া যাইবে। আত্মদর্শনবঞ্চিত সংসারী ব্যক্তিই এই বিভিন্ন অবস্থার অধীন, সুতরাং সে নিজের অথবা অপরের এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই সংগ্রাম করিতেছে। ইহার জন্যই শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব শিষ্যের উদ্দেশ্যবিচলিত দৃষ্টিকে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং ঠিক্ একই কারণে শ্রীপরমহংসদেব কর্ম্মকুশলব্যক্তিগণকে শুদ্ধভক্তবৃন্দের নিম্নস্তরে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অন্নদান, ব্যাধিশান্তি, শিক্ষালয়স্থাপন সংসারীর কর্ম্ম, কারণ তাহার পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও ইচ্ছাশক্তি নিখিল শক্তিসিন্ধুর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইবার প্রতিকূল, সুতরাং তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে লোকহিতৈষণার পথে পরিচালিত করিয়া অপেক্ষাকৃত শুদ্ধকরাই তাহার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর আদর্শ। আদর্শ ক্ষুদ্র কিন্তু ইহার উচ্চস্তরের আদর্শ ভোগনিরত, মায়াবদ্ধ সংসারীর পক্ষে গ্রহণ করা সহজ নহে।

মহাপুরুষ শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজীও বিভিন্নক্ষেত্রে এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নিরন্তর ভজনসাধন অপেক্ষা কর্ম্ম হীনস্তরের বস্তু ইহা তিনি বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। তদীয় শিষ্য শ্রীসন্তদাস বাবাজী লিখিয়াছেন—"একদিন একটী ব্রজবাসী চাকর একপদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কোন মন্ত্রজপ করিতেছিল। তাহা টের পাইয়া তাহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবেন মনে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি করিতেছ?" সে বলিল "মহারাজ, আমি ভজন করিতেছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "আরে! ভজন্‌কা ঘর বহোত্ দূর হ্যায়, ভজন আব্ তেরিসে নেহি বনেগা, আব্ তু কাম করতা যা।" ইহা হইতে বুঝা যায় সেই চাকর তখনও ভজনের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে বলিয়া কর্ম্মের নিম্নভূমিতে বিচরণ করাই

তাহার পক্ষে সহজ ও যুক্তিযুক্ত। আর একদিনের ঘটনা। শ্রীসন্তদাস বাবাজী প্রথম প্রথম যোগ অভ্যাস করিতে যাইয়া দেখিলেন কুণ্ডলীশক্তি হৃদয়প্রদেশে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। তদীয় গুরুদেবকে এই বাধা অপসারণের জন্য নিবেদন করিলে শ্রীকাঠিয়া বাবাজী তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে যদি তোমার হৃদয়ের এই গাঁট আমি ছাড়াইয়া দিই, তবে তোমার দ্বারা আর কোন কার্য্যই হইবে না; তোমার সংসারে অনেক কার্য্য করিতে হইবে। সময়ানুসারে ইহা ছাড়াইয়া দিব।" শ্রীকাঠিয়া বাবাজীর এই কথাগুলির অর্থ সহজেই অনুমেয়। শ্রীসন্তদাস বাবাজীর জীবনের কর্ম্ম আরও বাকী ছিল এবং যদি গুরুকৃপাবশে "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" হইত তাহা হইলে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" আপনাআপনিই হইয়া যাইত, তাঁহার কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি আর থাকিত না। কর্ম্ম ধূমমিশ্রিত অগ্নির ন্যায়; সুতরাং ইহার প্রকাশিকা শক্তি এবং আবরিকাশক্তি উভয়ই বর্ত্তমান। সর্ব্বদা স্মরণমননের দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া থাকার যে আনন্দ তাহা কর্ম্মের মধ্যে সুলভ নহে।

এমন ক'রে মুখোমুখি
সাম্‌নে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ ক'রে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের কীর্ত্তিসৌধ বেলুড়মঠ এই বিষয়ে সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামীজি কর্ম্মযোগী ছিলেন, তাঁহার আত্মশক্তি প্রকাশের মূলে ছিল কর্ম্ম-

প্রেরণা, লোকহিতৈষণা। তাই আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার স্বহস্তরোপিত ক্ষুদ্রবীজ আজ কালক্রমে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মহাবৃক্ষরূপে পরিণত; ধর্ম্মপিপাসু অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়স্বরূপ, সংসার-দগ্ধ জীব তাহার সুশীতল ছায়ায় শান্তি লাভ করিতেছে। কিন্তু তথাপি নানাশাখায় পল্লবিত এই বনস্পতির ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত ভক্তিজ্ঞান-পরিশুদ্ধ নিষ্ক্রিয় আত্মার কোন প্রকাশ অথবা নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আজ শ্রীপরমহংসদেবের নামে দেশবিদেশে যে সমস্ত মঠ অথবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে লোকৈষণা, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, যাহার প্রেরণা বর্ত্তমানযুগে স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষে আনিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম, তৈলচিত্র অথবা মর্ম্মরমূর্ত্তি মহাসমাদরে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বত্রই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শিরে ধারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ধন্য হইয়াছে অথচ সবগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাঁহারই জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা যেন ঠিক্ ইংরাজশাসনপ্রণালী—সম্রাটের নামে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে কিন্তু সমস্ত রাজশক্তি পরিচালনার মূলে রহিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী, যিনি সম্রাটের আদর্শ অথবা আদেশের অধীন নহেন। রাজা শান্তিবাদী হইতে পারেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়ত রাজার নামেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিলেন, রাজা যুদ্ধ কামনা করেন, প্রধানমন্ত্রী একটা সন্ধি স্থাপন করিয়া যুদ্ধ শেষ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা দেশে দেশে দিকে দিকে যে অসংখ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহায় কয়েকটী মাত্র আমরা উল্লেখ করিব। বেলুড়ের বিশ্ববিখ্যাত মঠ, মজঃফরপুর সহরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম', কলিকাতার উপকণ্ঠে গৌরীপুরে 'শ্রীরামকৃষ্ণমিশন'*—একই আদর্শে, একই প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে। মজঃফরপুর আশ্রমের

*বর্ত্তমানে অন্যত্র অপসারিত।

চিকিৎসাবিভাগে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রোগীর সংখ্যা ৪৯৩৪৫, পরবৎসরে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৭৮১২ হয়; আশ্রমের তত্ত্বাবধানে তখন রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছিল, মঠের ভিতরে বালকবালিকাগণ শিক্ষালাভ করিতেছিল। এই সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে মঠাধ্যক্ষ স্বামীর যে সময়ক্ষয় ও পরিশ্রম হইয়া থাকে তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। গৌরীপুরের শ্রীরামকৃষ্ণমিশন যুবকদিগকে কলিকাতার কলেজে ইংরাজিশিক্ষা প্রদানের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, মোটর বাসে করিয়া ছেলেরা কলিকাতায় যাতায়াত করে, আশ্রমের ভিতর বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহাতে মৎস্যের চাষ হইয়া আশ্রমের ব্যয়ের কিয়দংশ নির্ব্বাহ হয়, হাঁস রাখিয়া তাহার ডিম্বের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আশ্রমের ব্যয়নির্ব্বাহের অন্যতম উপায়। বেলুড়মঠের ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে মঠের অধীনে চিকিৎসাবিভাগে যে সমস্ত হাসপাতাল আছে তাহার মধ্যে চারটী প্রসূতি-দিগের জন্য, ইংরাজিশিক্ষার স্কুল ও কলেজ, কৃষি, শিল্প, হোমিওপ্যাথি, ইঞ্জীনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনুন্নত শ্রেণীদিগকে ম্যাজিকলণ্ঠন ও গ্রামোফনের সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে মিশনের প্রচারকার্য্য ;—ইহাই বেলুড়মঠের বহুবিধ কর্ম্মসূচির মধ্যে অন্যতম। উল্লিখিত বর্ষে মঠের আয় চৌদ্দলক্ষ টাকারও অধিক এবং ব্যয় আয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। আয় ও ব্যয়ের গুরুত্ব মঠের পার্থিব কর্ম্মসমূহের বহুমুখিতার সম্যক্ নিদর্শন। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম শ্রীপরম-হংসদেব কখনও ধর্ম্মজীবনের অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নাই, নানাস্থানে নানাবিধ কথোপকথন উপলক্ষ্যে জীবনের এইরূপ আদর্শের প্রতি তিনি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, হাসপাতাল স্থাপন জীবনের উদ্দেশ্য নহে, স্কুল কলেজের শিক্ষাকে 'চালকলাবাঁধা' বিদ্যা বলিয়া উপহাস করিতেন, কৃষিকার্য্য শিক্ষাদেওয়া মঠের কর্ত্তব্য-শ্রেণিপরিগণিত

হওয়া দূরের কথা, ভাগিনেয় হৃদয় দেশে কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য একটি এঁড়ে বাছুর সংগ্রহ করিয়াছিল শুনিয়া মহামায়ার প্রভাব দেখিয়া ঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সঙ্ঘবৃদ্ধির জন্য নোটীশ দিয়া লোক ডাকিয়া প্রচার-কার্য্যের প্রতি যাঁহার চিরদিন ঘৃণা ছিল, ধর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের সহজমিলনও যিনি আশঙ্কার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার পতাকার নিম্নে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের সুখপ্রসবের ব্যবস্থাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া দ্বারে দ্বারে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন, ইহা তাঁহার অনুমোদিত কর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করাও কঠিন। এই সমস্ত বিরাট্ কর্ম্মের জন্য যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহার হিসাব রাখার জন্য ব্যাঙ্ক, আপিষ, কর্ম্মচারী প্রভৃতির সংস্পর্শ ও তত্ত্বাবধান অপরিহার্য্য। ইহা ধনী ব্যবসায়ী অথবা জমিদারের পক্ষেই শোভা পায়। শ্রীপরমহংসদেব মাছ অথবা হংসডিম্বের ব্যবসার দ্বারা দক্ষিণেশ্বরের ভক্তমণ্ডলীর নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতেছেন অথবা ব্যাঙ্কের জমাটাকা ও সুদের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন, ইহা এক অসম্ভব চিত্র।

এইরূপে সংগৃহীত অর্থ লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করার একটা অসুবিধা ও নিষ্ফলতাও পরিলক্ষনীয়। যে সন্ন্যাসী কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গরূপে দেশবিদেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় অর্থদান ও শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা কর্ম্ম করিতেছেন তিনি নিজের ইচ্ছামত অর্থব্যয় করিতে পারেন না, কারণ মঠাধ্যক্ষের ব্যবস্থার দ্বারা তাঁহার দানশক্তি নিয়ন্ত্রিত। এই হিসাব-করা, ওজনকরা ক্ষুদ্র দান কর্ম্মীকে কখনই আনন্দপ্রদান করিতে পারে না,—মনের স্বচ্ছন্দগতি প্রতিমুহূর্ত্তে আদেশের অঙ্কুশে সঙ্কুচিত। গৃহী হয়ত কখনও মনের উচ্ছ্বাসে হস্তমুষ্টি রিক্ত করিয়া দান করিয়া ফেলিতে পারে, নিঃশেষে দানের আনন্দ পাইতে পারে, কিন্তু মঠের অঙ্গীভূত সন্ন্যাসী দানের এই স্বাধীনতা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত। এইরূপ দানে মনের মুক্তি নাই, কর্ম্মের বন্ধনমাত্র আছে। যিনি মঠাধ্যক্ষ, এরূপ কর্ম্ম তাঁহার

পক্ষেও কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তিনি অর্থদানের আদেশ দিয়াছেন সত্য কিন্তু প্রত্যক্ষদানের মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার যে আনন্দ তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত। এইরূপ দানকার্য্যে মনের স্বচ্ছতা অপেক্ষা আবিলতার সম্ভাবনাই অধিক। একদিনের ঘটনা। ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন। "নীচে একজন বৈষ্ণব গান গাহিতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণবকে কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছু দিতে গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি দিলে? একজন ভক্ত বলিলেন—তিনি দু-পয়সা দিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—চাক্‌রী করা টাকা কিনা! অনেক কষ্টের টাকা—খোসামোদের টাকা! মনে করেছিলাম, চার আনা দিবে।" গৃহীর টাকা বহুকষ্টে অর্জ্জিত সুতরাং অনেক হিসাব করিয়া দান করিতে হয়—এ দানে আনন্দ কোথায়! কিন্তু কোন বৃহৎ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের ভিক্ষালব্ধ সঞ্চিত অর্থের প্রতি ঠিক্ এইরূপ মমতাই আসে, কারণ সেই অর্থও কষ্টার্জ্জিত, সুতরাং অনেক বুঝিয়া তাহা খরচ করিতে হয়। সঞ্চিত অর্থ হইলেই তাহার উপর মমতা আসিবে—সে অর্থ গৃহীরই হউক অথবা সন্ন্যাসীরই হউক, সে অর্থ পাঁচ টাকাই হউক অথবা পাঁচ লক্ষ টাকাই হউক। মনের আনন্দে বে-হিসাবী, নিঃশেষে দান করিবার শক্তি গৃহী অথবা সন্ন্যাসী কাহারও নাই।

ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে এখন যে সমস্ত মঠ কার্য্য করিতেছে তাহাদের সকলগুলিই যে আদর্শে পরিচালিত তাহার মূলে রহিয়াছেন বর্ত্তমানযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ। গুরু ও শিষ্যের ঈশ্বরলাভের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কিন্তু এই মহান্ কর্ম্মযোগী ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে কর্ম্মসঙ্কল্প গ্রহণ করেন নাই, তখন জ্ঞান ও ভক্তিলাভই তাঁহার জীবনে বাঞ্ছনীয় ছিল। পিতৃ-বিয়োগের পর সংসারের অনটন ও দুঃখকষ্টের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া নরেন্দ্র

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন—"দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম,—মা ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।" পরম স্নেহাস্পদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বল্‌ছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী, ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন।" অর্থস্বাচ্ছল্য ভিক্ষা করিবার জন্য, গুরুর নির্দ্দেশমত নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন "সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী; সত্য সত্যই জীবিতা, এবং অনন্তপ্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম—মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও।" শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল "জগৎসংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা—ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন।"

যাহার নিজের সুখদুঃখ বোধ আছে সে জগৎসংসারের দুঃখ দেখিলেও ব্যথিত হয়। সেদিন নরেন্দ্রনাথ নিজের সংসারদুঃখ দূর করিবার জন্য জগন্মাতার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু নিজ দুঃখ অথবা জগতের দুঃখ দূর করিবার শক্তি তিনি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, ভক্তি ও জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই একই প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ তিনবার তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইল, চেষ্টা করিয়াও অর্থ স্বাচ্ছল্য প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছাশক্তি, প্রেরণাশক্তি তখন নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কার্য্য করিতেছে, সুতরাং কর্ম্ম তাঁহার প্রার্থনীয় বস্তু হইল না, ভক্তি ও জ্ঞান প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। কিন্তু শ্রীপরমহংসের অন্তর্দ্ধানের পর নরেন্দ্রের চরিত্রে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়।

তাঁহার কোমল প্রাণ সংসারীজীবের দুঃখদহনে তাপিত হইতে লাগিল, তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন—'এতো দুঃখ, ভগবানকে ডাকি কখন !" এই উক্তিই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপের উপর আলোকসম্পাত করিতেছে। ভগবানকে তিনি ডাকিতেন কিন্তু সে ডাকা নিজজীবনে অথবা জগতে ভক্তি ও জ্ঞানধারা প্রবাহিত করিবার জন্য নয়, সে ডাকার মধ্যে দুঃখক্লিষ্ট মনের আর্ত্তনাদ ছিল, নালিশ ছিল, স্বদেশবাসীকে জড়তার অন্ধকার হইতে কর্ম্মের দীপ্তালোকে আনিয়া তাহাদের শরীর, মন ও বুদ্ধিকে বলিষ্ঠ করিবার প্রার্থনা ছিল। মহামান্য তিলকের ভাষায় নরেন্দ্র ছিলেন—"Patriot Saint."। সুতরাং Life of Sri Ramkrishna পুস্তকে লিখিত সিদ্ধান্ত—"Ramkrishna and Narendranath became as one soul"—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনধারার বিরোধী বলিয়া মনে হয়। এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের কথা—"তুই আমি কি আলাহিদা ? এটাও আমি, ওটাও আমি।"—তাঁহার স্নেহ ও আশার কথা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি চাহিয়াছিলেন আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টি করিতে কিন্তু বিভিন্ন উপাদানে গঠিত নরেন্দ্রচরিত্রের নিকট তাঁহার সেই সৃষ্টির ইচ্ছা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—দুইজন শ্রীপরমহংস-সৃষ্টি সে যুগে আর হয় নাই।

দুইজন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সৃষ্টি হইলনা, সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর ছিলনা। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রস্রবণ বিভিন্ন ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, বীজ যেমন সেইরূপ বৃক্ষই অঙ্কুরিত হইয়াছে, সব বীজ শ্রীরামকৃষ্ণবৃক্ষরূপে পরিণত হয় নাই। সব সন্ন্যাসীই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু নিজ নিজ সংস্কার ও প্রবৃত্তিমত কেহ বা হাসপাতাল, কেহ বা প্রসূতিসদন, কেহ বা স্কুল-কলেজ লইয়া আছেন—অনন্ত আকাশ সকলের উর্দ্ধে কিন্তু যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি ততদূরই উঠিতে পারিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্ত্ব, রজ ও তম গুণাতীত, সাধারণ লোক এই ত্রিগুণের অধীন সুতরাং কর্ম্মপ্রবৃত্তি সাধারণ লোককে সহজেই মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ছিল অন্যরূপ। সে আদর্শের জ্যোতিঃ আজ কালক্রমে ক্ষুণ্ণ,—বেলুড়ও সে আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই। জগতের সমস্ত ধর্ম্মের এই একই ইতিহাস।

"In every age the Prophet has always asked for the unattainable, always pointed to a higher level than human nature could breathe in, always insisted on a measure of self-renunciation which Saints in their prayers send forth the soul's lame hands to clutch—in their ecstasy of aspiration hope that they may some day arrive at. But alas! they reach it—never."

(অর্থাৎ প্রতিযুগের ধর্ম্মগুরু জগৎবাসীগণের নিকট অতি কঠোর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, যে অতীন্দ্রিয়রাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন তাহা সাধারণ মানুষের অগম্য, ত্যাগের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা যোগীগণের জীবনেও পালন করা সুকঠিন, যোগীরা সে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছেন যদি কখনও তাহা জীবনে বাস্তবতায় পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে উচ্চ আদর্শের নিকট তাঁহারা কখনই পৌছিতে পারেন না।) শ্রীবিবেকানন্দ নিজে ইহা জানিতেন এবং তাই তাঁহার নিজস্ব সরল ও সহজ ভাষায় একদিন বলিয়াছিলেন—"তোরা মনে ক'রেছিস বুঝি প্রত্যেকে এক একটা রামকৃষ্ণপরমহংস হবি? রামকৃষ্ণ-পরমহংস জগতে একটাই হয়।"

তাই আমরা দেখিতে পাই বেলুড় যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণআদর্শ নহে, তাহা শ্রীবিবেকানন্দের আদর্শ, সে আদর্শ ধর্ম্মজীবনে কর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদর্শিত ভক্তি ও

জ্ঞানের আদর্শ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসী যে কাজ করেন তাহা ভোগপ্রয়াসী গৃহীর অপেক্ষা অনেক সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর অতি সামান্য কর্ম্মও সুন্দর—গৃহীর কর্ম্ম অপেক্ষা অনেক সুন্দর। দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারীর সময় বেলুড়ের সন্ন্যাসীগণ যে কার্য্য করেন তাহাতে কোন ছিদ্র থাকে না, গৃহীর কর্ম্মের মত তাহাতে অর্থের অপচয় অথবা অপব্যবহার নাই, বিরোধ নাই, কর্ম্মের কলরব নাই। এমন অনেক উদাহরণ আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করিয়া দেখিলেন যে মন্দিরে অনেক ধূলা জমিয়াছে,—প্রভু নিজহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া ধূলা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য সকলেও সেই কাজে লাগিল। কাজ অতি তুচ্ছ কিন্তু তথাপি দেখা গেল প্রভুর পরিষ্কৃত ধূলারাশি অপর সকলের অপেক্ষা অধিক, শ্রীঅঙ্গ ধূলিধূসরিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই গুণ্ডিচামন্দিরে ধূলা আবার জমা হইল, একদিনের শ্রীহস্তের কর্ম্ম চিরদিনের ধূলাকে দূর করিতে পারিল না। মৃত লাজারসের ভগ্নী তাহার ভ্রাতার শোকে যিশুখৃষ্টের নিকট রোদন করিতেছিল, সংসারীর দুঃখ দেখিয়া যিশুখৃষ্টের মন দ্রব হইল—Jesus wept (যিশুখৃষ্ট রোদন করিলেন)। সংসারের প্রভাব এতই অধিক যে মোহপাপমুক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকেও রোদন করাইল, যিশুখৃষ্ট লাজারসকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। 'Jesus wept'—দুইটি ক্ষুদ্র কথার মধ্যে কি সুন্দর চিত্র লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন! সেই প্রেমবিকশিত মুখ বাহিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে—ইহার চিত্র কোন চিত্রকর আজ পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। লাজারস তখন বাঁচিয়া উঠিল কিন্তু অমর হইতে পারিল না, একদিন তাহাকে মরিতে হইয়াছিল, যিশুখৃষ্টের দয়াও তাহার চিরদিনের মৃত্যুকে দূর করিতে পারিল না। কর্ম্মের এমনই সঙ্কীর্ণতা, এমনই নিষ্ফলতা। লক্ষ লক্ষ

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলেও জগতের ব্যাধি দূর হইবেনা, অসংখ্য বিদ্যা প্রতিষ্ঠানও মানুষের অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারিবে না, দুর্ভিক্ষ মহামারী, যুদ্ধ সহস্র চেষ্টাতেও নিবারিত হইবেনা, মানুষের ভিতর যে প্রচ্ছন্ন পশু আছে তাহা কর্ম্মের সমস্ত শক্তিকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিবে। তাই মনে হয় সন্ন্যাসীর কর্ম্মদান অপেক্ষা ভক্তি ও জ্ঞানদান মহান্, এদান অক্ষয়, এদানের ব্যর্থতা নাই, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে ভ্রমিতে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে জীব একবার এই ভক্তিলতাবীজ লাভ করিলে জন্মজন্মান্তরেও অক্ষয় বটরূপে ইহা মানবকে শীতল ছায়া প্রদান করিয়া থাকে। এই ভক্তি ও জ্ঞান সন্ন্যাসীর সাধনার বস্তু, ইহাই ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী জীব সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ভিক্ষালাভ করিবার আশা করিয়া থাকে।

শ্রীপরমহংসদেবের আদর্শ তাঁহার অসংখ্য ভক্তের মধ্যে কেবলমাত্র একজন নারী দুইহস্ত প্রসারিয়া সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অঙ্গুলির ছিদ্র দিয়া সেই মহান্ আদর্শের কণামাত্রও গলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয় নাই। এই মহীয়সী নারী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে "গোপালের মা" নামে পরিচিত। "গোপালের মা" শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, নিজের মন বা বুদ্ধি বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। এই অপূর্ব্ব আত্মনিবেদনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে শুদ্ধ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নারীদেহ ঠাকুর একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শ্রীপরমহংস সাধারণতঃ কোন স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতেন না,—ভাব অবস্থায় তো নহেই—এমন কি বহুক্ষণ নারীর অবস্থান-জনিত ঘরের বায়ুভার পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিত। কিন্তু তিনি স্বচ্ছন্দে গোপালের মার হস্ত হইতে অন্নভক্ষণ করিতেন, ভাবের অবস্থায় গোপাল হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিতেন। একদিন ঠাকুর গোপালের মাকে বলিলেন, "তুমি এখনও জপ কর কেন? তোমার তো

খুব হয়েছে।” নামজপ করাকে ঠাকুর কর্ম্মসংজ্ঞা দিতেন না, কিন্তু গোপালের মা উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় নিত্যযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, সুতরাং ঠাকুরের মতে তাঁহার পক্ষে জপ করারও প্রয়োজন ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বিস্মিত হইয়া গোপালের মা বলিলেন, “জপ কোর্‌ব না? আমার কি সব হয়েছে?”

ঠাকুর—সব হ’য়েছে।

গোপালের মা—সব হয়েছে?

ঠাকুর—হাঁ, সব হয়েছে।

গোপালের মা—বল কি? সব হয়েছে?

ঠাকুর—হাঁ, তোমার আপনার জন্য জপ, তপ, সব করা হ’য়ে গ্যাছে, তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাক্‌বে বলে ইচ্ছা হয় তো করতে পার।

গোপালের মা—তবে এখন থেকে যা কিছু কোরবো সব তোমার, তোমার, তোমার।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া গোপালের মা থলি মালা সব নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপালের মার মধ্যে এই কথাবার্ত্তাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরউজ্জ্বল ও চিরস্মরণীয়। দেখা যাইতেছে এই নারী নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই। তাঁহার দেহ, মন, আত্মা একসুরে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদিত হইয়াছিল। ইহাই Our will is ours to make it thine (আমাদের ইচ্ছাকে ভগবদ্ ইচ্ছার সহিত একীভূত করাই জীবনের উদ্দেশ্য)। আপন প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব লোপ করিয়া এমন করিয়া নিঃশেষে নিজেকে দান করিবার সৌভাগ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর কোন শিষ্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না—এমন কি নরেন্দ্রের জীবনেও নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর অপর কেহই এই দুর্লভ আশ্বাসবাণীর

অধিকারী হন নাই—"সব হয়েছে।" এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে হইলে যে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন তাহা অপর কাহারও ছিল না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে অসংখ্য দ্বাদশ দল, শতদল, ও সহস্রদল পদ্মের মধ্যে এই একটীমাত্র অখ্যাত ও অজ্ঞাত পদ্ম শ্রীপরমহংসদেবের আদর্শ জীবনে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মভূত হইয়া, এমন কি তপ, জপ, আরাধনার প্রয়োজন নিরপেক্ষ হইয়া, সর্ব্বদা শ্রীগুরুচরণে যুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়াছেন। সুতরাং "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে", গীতার এই উক্তি শ্রীপরমহংসসঙ্ঘে একমাত্র এই নারীর জীবনেই সফল হইয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শুষ্ক শাস্ত্রচর্চ্চা

প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন আছে কি না এই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অভিমত জানিবার কৌতূহল আমাদের মনে উদিত হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, পণ্ডিত হইলেই খাঁটি লোক এমন কি ধার্ম্মিক হওয়ার সম্ভাবনা, সেইজন্য অনেকেই ধর্ম্মজীবনের সোপানরূপে শাস্ত্রঅধ্যয়ন করিয়া থাকেন। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী নিষ্কামকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীপরমহংসদেব ধর্ম্মজীবনে শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না, এমন কি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা ধর্ম্মজীবনের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন। ঈশ্বরপুত্র যিশু কখনও শাস্ত্রপাঠ করেন নাই এবং তাঁহার আদর্শে প্রতিষ্ঠাপিত St. Franciscan প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিতে শাস্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে পণ্ডিতচূড়ামণি হইয়াও অপরকে অধিক গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীপরমহংসদেব শাস্ত্রবচন অপরের মুখে অনেক শুনিয়াছিলেন কিন্তু আয়োজন করিয়া বিধিপূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠ তিনি কখনও করেন নাই। নিজেকে তিনি কৌতুক করিয়া "মুর্খোত্তম" বলিতেন। একবার জনৈক আসামনিবাসী ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আসাম কোথায়? বর্ত্তমান জগতে কোন ভারতবাসী 'আসাম কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সাধারণ লোকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন না, নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া লোকে তাঁহাকে উপহাস করিয়া থাকে। একদিন ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বহুজনাকীর্ণ প্রাঙ্গণ দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন, "এ কি পাড়া! এখানে দেখ্ছি কেউ নাই।" অথচ

সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা পাড়াপ্রতিবাসী অনেকে উপস্থিত ছিলেন তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ "কেউ নাই" দেখিলেন। মানুষকে তিনি পাণ্ডিত্যের কষ্টিপাথরে বিচার করিতেন না। তাঁহার কষ্টিপাথর ভক্তিধাতুনির্ম্মিত ছিল। পাণ্ডিত্যাভিমানী কোন লোক শাস্ত্রবিচারের কুণ্ডূয়নগ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভীত হইতেন। একদিন এক যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পঞ্চদশী পড়েছ?" যুবক উত্তর দিল, পড়া দূরের কথা সে ঐ শাস্ত্রগ্রন্থের নামও শুনে নাই। ঠাকুর বলিলেন "বাঁচলাম। আজকালকার ছোঁড়ারা কোন কাজ কর্ব্বেনা কেবল শাস্ত্র পড়ে তর্ক কর্ব্বার জন্য ব্যস্ত।" শাস্ত্রপাঠ করিয়া ধর্ম্মজীবনের সোপানরূপে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমত এই সমস্ত ঘটনাবলী হইতে সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, এবিষয়ে শাস্ত্র, সাধু ও গৃহী সকলেরই একমত, কিন্তু মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য কি, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা গিয়া থাকে। গ্রামবাসী নিরক্ষর সাধারণ গৃহী মনে করে যে বিষয়ভোগকরাতেই জীবনের সার্থকতা। কেহ যদি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে এই "অল্পভোগী" মৃত ব্যক্তির জন্য তাহারা শোক প্রকাশ করে। দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতের উপভোগ্য বস্তু আস্বাদন করাই তাহাদের নিকট চরম সার্থকতা। অপর কেহ কেহ মনে করেন কর্ম্ম করাই জীবনের উদ্দেশ্য— নিষ্কাম হইলে ভাল, সকাম হইলেও ক্ষতি নাই। মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া কর্ম্মবিমুখ হইয়া বসিয়া থাকা জড়ত্বের পরিচায়ক, কর্ম্মেই মনুষ্যত্বের সম্যক্ অভিব্যক্তি। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির ধারণা যে বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়া লৌকিক এবং পারলৌকিক জ্ঞান অর্জ্জন করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য—পাণ্ডিত্য এবং সংস্কৃতিই জীবকে মনুষ্যপদবাচ্য করিয়া থাকে। বিভিন্ন স্তরের লোকে এইরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধনকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সাধুগণ বলিয়াছেন যে মনুষ্যজীবনে গোবিন্দভজন

করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধন ভোগনিরপেক্ষ, কর্ম্ম নিরপেক্ষ এবং শাস্ত্রনিরপেক্ষ। ইংরাজ মনীষীদের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 'To know God and glorify Him is the purpose of life' অর্থাৎ ভগবানকে জানা এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। সাধু বলিতেছেন

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ-নন্দন
অভয় চরণারবিন্দরে।
মনুষ্য দুর্ল্লভ দেহ সৎসঙ্গে সেবহ
হরিপদ নিতি রে॥
শীত আতপ, বাত বরিখন,
এদিন যামিনী জাগিরে।
বৃথায় সেবিনু কৃপণ দুরুজন;
চপল সুখলব লাগিরে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীগণ, আত্ম নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

আহার, নিদ্রা ও ভয় মানুষ এবং পশুর একই প্রকার কিন্তু পশু ঈশ্বরভজন করিতে পারেনা, মানুষ পারে, এইখানেই মনুষ্য ও পশুর মধ্যে প্রভেদ। সুতরাং মনুষ্যদেহে গোবিন্দভজনেই মনুষ্যজন্মের একমাত্র সার্থকতা। এই কষ্টিপাথরে রাখিয়া শাস্ত্রালোচনা ও পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের বিষয় আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে।

শাস্ত্র পাঠাদির দ্বারা পাণ্ডিত্য অর্জ্জনকরা উপায় হইতে পারে কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু

ঈশ্বরলাভের জন্য শাস্ত্রপাঠ উপায় কিনা তাহাও সন্দেহ। বহুগ্রন্থপাঠের দ্বারা অর্জ্জিত পাণ্ডিত্য সাধারণতঃ নানা দোষের আকর। প্রথমতঃ দেখা যায় যে পাণ্ডিত্য হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং অহঙ্কার-কলুষিত হৃদয়ে ঈশ্বরের শুভ্রজ্যোতি কখনই প্রতিফলিত হইতে পারে না। একমাত্র সাধন-ভজনের দ্বারা পরাবিদ্যা অর্জ্জন করা যায়, অপরা বিদ্যা ধর্ম্মজীবনের অন্তরায় স্বরূপ। উপনিষৎ বলিয়াছেন

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ

(যাহারা অবিদ্যা পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান ও শাস্ত্র-কুশল বলিয়া অভিমান করে, সেই সকল মূঢ়, অন্ধেরই দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায়, অতিশয় কুটিলগতি সহকারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।)

ঈশ্বরবোধ বর্জ্জিত পার্থিবজ্ঞানই অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যা হইতে পাণ্ডিত্যের অভিমান আপনি আপনিই উদ্ভূত হয়। পাণ্ডিত্যাভিমানী জীব ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে অন্ধ এবং অন্ধেরই ন্যায় তাহারা পথভ্রান্ত হইয়া সংসারে বাস করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডিত্যের একটা কণ্ডূয়ন আছে যাহা পণ্ডিতকে স্থির অথবা মৌন হইয়া বসিতে দেয় না। এই কণ্ডূয়নের বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিত সর্ব্বদাই তাঁহার জ্ঞান জাহির করিবার জন্য উৎসুক, দেশ, কাল অথবা পাত্র বিচার করিবার শক্তিও অনেক সময় তাঁহার থাকে না। এই জিহ্বা-কণ্ডূয়ন নানাবিধ আধ্যাত্মিক দোষের আকর বলিয়া যোগীগণ অনেক সময় মৌনব্রত অবলম্বন করেন এবং সাধনমার্গগামী লোককে জিহ্বা সংযত করিতে উপদেশ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীতৈলঙ্গস্বামী, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীসান্তদাস বাবাজী প্রভৃতি সাধুগণ সময় সময় এই মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া জিহ্বাদমনের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীতুলসীদাস বলিয়াছেন—"ঐসী মিঠি কুছ্ নেহি, জৈসী মিঠি চুপ্।" মৌনের মত ধর্ম্ম পথের সহায়ক আর কিছুই নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থেও জিহ্বাকে সংযত করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলে জিহ্বা সংযত হওয়া দূরের কথা সাধারণতঃ জিহ্বাকে পরিচালনা করিয়া নিজ শক্তির পরিচয় দিবার জন্য মানুষ ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীজীব গোস্বামী পাণ্ডিত্যের শক্তি দেখাইয়া জিগীষার লোভ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে অসামান্যরূপে পাণ্ডিত্যকণ্ডূয়ন দমন করিবার শক্তির একটীমাত্র উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সাতদিন ধরিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত ব্যাখ্যান করিয়া শুনাইলেন, পণ্ডিতচূড়ামণি মহাপ্রভু নিঃশব্দে শুনিয়া যাইতেন, মুখে কোন বাক্য নাই, প্রতিবাদ নাই, পাণ্ডিত্যের এমন বিকৃত উদ্গারণ দেখিয়াও নিজ পাণ্ডিত্যের স্বচ্ছ স্রোতে সেই মলিনতা ধৌত করিবার কোন প্রয়াস নাই। পাণ্ডিত্যবিষ দমনের এইরূপ অসাধারণ শক্তি একমাত্র ভগবানেই সম্ভব। ভক্তমালে ইহার অপূর্ব্ব বর্ণনা আছে।

এতো কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাখানে
সাতদিন ধরি প্রভু বসিমাত্র শুনে॥
... ...
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌন করি রহ।
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥

তৃতীয়তঃ পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞানকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং যতই পাণ্ডিত্যের স্ফূরণ হইতে থাকে ততই ঈশ্বর হইতে দূরে যাইয়া পড়েন। ইহার ফলে মানুষ শাস্ত্রউদ্গারণকারী যন্ত্ররূপে পরিণত

হয়, নিজে শাস্ত্র অনুভূতি বর্জ্জিত হইয়া অপরকে নীরস বাক্যের আবর্জ্জনায় অন্ধ করিয়া ফেলে। তাই শ্রীতুলসীদাস বলিয়াছেন "পোথি পড়ি পড়ি জগমুয়া পণ্ডিত ভয়া ন কোয়"—গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে জীবন শেষ হইল, তথাপি কেহ পণ্ডিত হইতে পারিল না। রাধাস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমহারাজ সাহেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আজকাল কা জ্ঞানী বিলকুল্ বাচক হ্যায়, অভ্যাস বেগর্ তো কুছ্ কর্ত্তে নেহি। জ্ঞানকে গ্রন্থ পড়্ কর্ জ্ঞানী বন্ বইঠ্ তা হ্যায়।" জ্ঞানের গ্রন্থ পড়িয়াই লোকে জ্ঞানী হইয়া পড়ে, সাধন ভজন নাই, ঈশ্বরের অনুভূতি নাই, শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার শক্তি নাই। চতুর্থতঃ জ্ঞানপথাবলম্বী সাধুগণের হয়ত শাস্ত্রপাঠে কিছু সাহায্য হইতে পারে কিন্তু ভক্তিপথগামী লোকের পক্ষে বহু গ্রন্থপাঠ মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া ভক্তিলাভের অন্তরায় হইয়া উঠে। ধর্ম্ম-জীবনে জ্ঞানের পথ সুগম নহে, ভক্তিই সাধারণ মানুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণীয়। কিন্তু অধিক গ্রন্থ পাঠ করিলে নানাবিধ সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং সংশয়াচ্ছন্ন মন ভগবানের সন্নিধি হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সাধারণতঃ শাস্ত্রপাঠের এই সমস্ত দোষাবলী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও ধর্ম্মজীবনে মহীয়ান্ হইয়াছেন এরূপ লোক বিরল, একমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তদীয় অনুচর সপ্তগোস্বামীগণকে শাস্ত্রপাঠ কলুষিত করিতে পারে নাই, ভক্তিসাধনার হানি করিতে পারে নাই, শাস্ত্রালোচনার কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ আত্মার জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

শাস্ত্রপাঠের দোষ আমরা আলোচনা করিয়াছি, শাস্ত্রপাঠ করিয়াও অসামান্য শক্তিসম্পন্ন কেহ কেহ ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন স্বীকার করিয়াছি কিন্তু এরূপ পণ্ডিত-সাধু অতীব বিরল তাহাও নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মজীবনের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন এরূপ সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীবুদ্ধ,

শ্রীযিশুখৃষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীতৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা, শ্রীগম্ভীর-নাথজী, যবন শ্রীহরিদাস, শ্রীরামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধুগণ শাস্ত্রাধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করেন নাই, প্রতিমুহূর্ত্ত ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া ধর্ম্ম-জীবনে মহীয়ান্ হইয়াছিলেন। উপনিষদের উজ্জ্বল সত্য তাঁহারা নিজের জীবন দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

(এই আত্মাকে বহু বেদপাঠ সহায়ে, অথবা বুদ্ধিবৃত্তি সহায়ে, কিংবা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারায় জানা যায় না। যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহা লাভ করেন, তাঁহারই সকাশে এই আত্মা প্রকাশিত হন।)

এই সকল সাধুরা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন যে শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করা ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র কিন্তু ভগবানকে লাভ করিলে জ্ঞানের অভাব কখনই অনুভূত হইতে পারে না। সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন একবার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে সহস্রদল পদ্মের মত জ্ঞানমুকুল আপনা আপনিই বিকশিত হইয়া উঠে, সাধকের চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না। ধ্রুব যখন ভক্তিসাধনার শক্তিতে শ্রীভগবানের দয়ার অধিকারী হইয়া তাঁহাকে নিজসমীপে আকর্ষণ করিলেন তখন বৈকুণ্ঠনিবাসী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীহরিকে স্বজনপরিত্যক্ত অসহায় বালকের ইষ্টদেবরূপে সম্মুখে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া ধ্রুবের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা সেই নিরক্ষর বালকের ছিল না। অথচ বাত্যাবিক্ষুব্ধ অসীম সিন্ধুর মত ভাবোদ্বেলিত প্রাণ ভাষার কূল পাইবার জন্য মুহুর্মুহুঃ গুমরিয়া উঠিতেছে শ্রীনারায়ণ তাহা বুঝিতে পারিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীহরি তখন শঙ্খের দ্বারা ধ্রুবের গণ্ডস্থল স্পর্শ করিলেন, ছন্দোবদ্ধ ভাষায় স্তবকুসুমরাশি একে একে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সে সৌন্দর্য্যের বন্যায় প্রভু ও দাস উভয়েই প্লাবিত হইয়া গেলেন। সেইদিন ইষ্টদেবের স্তব করিবার জন্য ধ্রুবকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় নাই, পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় নাই।

এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমত দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ছিল। তিনি বলিতেন বিবেকবৈরাগ্যবিহীন পণ্ডিত শৃগাল-কুক্কুরের মত অধম। কখনও বা বলিতেন শকুনি আকাশে অনেক উর্দ্ধে উড়িয়া যাইলেও তাহার দৃষ্টি যেমন ভাগাড়ে নিবদ্ধ সেইরূপ বিবেকবুদ্ধিবর্জ্জিত পণ্ডিতের মন সর্ব্বদাই কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত। তাঁহার নিকট এরূপ পাণ্ডিত্যের কোন মর্য্যাদা ছিল না। তিনি জানিতেন ব্রহ্মদর্শন হইলে সকল জ্ঞানের স্ফূরণ আপনা আপনিই হয়, শাস্ত্রপাঠ করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয় না। "এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা বোলে মনে করোনা যে তার জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ফুরায় না। ······মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।" দেবীদর্শনলাভ করিলে জ্ঞান স্বতঃস্ফূরিত হইয়া উঠে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিনের ঘটনা। সেদিন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কথা। শ্রীপরমহংসদেবের পণ্ডিতভীতি এবং বিশ্বজননীর জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া দেওয়ার কথা তাঁহার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ঠাকুর—"ওগো, দেখছইতো এখানে ও সব (লেখাপড়া) কিছু নেই। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, পণ্ডিত দেখা কর্‌তে আস্‌বে শুনে বড় ভয় হলো। এই তো দেখ্‌ছ, পরনের কাপড়েরই হুঁস থাকে না, কি বল্‌তে কি বলব ভেবে একেবারে জড়সড় হলুম। মাকে বল্‌লুম—দেখিস্ মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর মাস্তর কিছুই জানি না, দেখিস্। তার পরে একে বলি 'তুই

তখন থাকিস্', ওকে বলি 'তুই তখন আসিস্', তোদের সব দেখ্‌লে তবু ভরসা হবে।' পণ্ডিত যখন এসে বস্‌লো তখনও ভয় রয়েছে, চুপ ক'রে বসে তার দিকেই দেখ্‌ছি তার কথাই শুনছি, এমন সময় দেখ্‌ছি কি—যেন তার (পণ্ডিতের) ভেতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে। শাস্তর মাস্তর পড়্‌লে কি হবে, বিবেক বৈরাগ্য না হলে ও সব কিছুই নয়। তার পরেই সড় সড় করে (নিজ শরীর দেখাইয়া) একটা মাথার দিকে উঠে গেল, আর ভয় ডর সব কোথা চলে গেল! একেবারে বিভ্‌ভুল হয়ে গেলাম্। মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যেন একটা কথার ফোয়ারা বেরুতে লাগল—এমনটা বোধ হতে লাগল! যত বেরুচ্চে তত ভেতর থেকে যেন কে ঠেলে ঠেলে যোগান্ দিচ্ছে! ওদেশে (কামারপুকুরে) ধান মাপবার সময় যেমন একজন রামে রাম, দুইয়ে দুই করে মাপে আর একজন তার পেছনে বসে রাশ (ধানের রাশি) ঠেলে দেয়, সেইরূপ। কিন্তু কি যে সব বলেছি তা কিছুই জানি না। যখন একটুক্ হুঁস হল তখন দেখছি কি যে, সে (পণ্ডিত) কাঁদছে, একেবারে ভিজে গেছে! ঐ রকম একটা আবস্থা (অবস্থা) মাঝে মাঝে হয়। কেশব যেদিন খবর পাঠালে, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে, একজন সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ছে, সেদিনও ভয়ে কেবলই ঝাউতলার দিকে (শৌচে) যাচ্ছি! তারপর যখন তারা এলো আর জাহাজে উঠ্‌লুম, তখন এই রকমটা হয়ে গিয়েছিল! আর কত কি বলেছিলুম! পরে এরা সব বল্লে, "খুব উপদেশ দিয়েছিলেন।" আমি কিন্তু বাপু কিছুই জানিনি।"

পণ্ডিত শাস্ত্রালোচনায় পরাজিত হইয়া বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে চোখের জলে অহমিকা, পাণ্ডিত্যাভিমান সমস্ত ভাসিয়া যাইয়া একান্ত আত্মনিবেদনের এমন গৌরবমণ্ডিত পরাজয় বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই।

ভক্তিই জীবনের মূল বস্তু, তিনি ভক্তের ভগবান বলিয়া জগতে পরিচিত, তাঁহাকে পণ্ডিতের ভগবান্ কেহই বলে না! সরলবিশ্বাসী মূর্খের পক্ষে তাঁহার দর্শনলাভ সুলভ, পাণ্ডিত্যের কোলাহল হইতে তিনি বহুদূরে,—ইহা ইউরোপীয় কোন কোন মনীষীও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। একজনের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। Anatole France ফরাসীদেশের বিখ্যাত লেখক, এক সময়ে তিনি Nobel Prize লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তি বিষয়ে তাঁহার একটি সুন্দর গল্প আছে। ফ্রান্সে একজন বাজীকর বাস করিত। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নানাবিধ বাজির কৌশল দেখাইয়া কায়ক্লেশে সে জীবিকা অর্জ্জন করিত। শস্য যখন প্রচুর হইত তখন গ্রামবাসীরা তাহার খেলা দেখিয়া শস্য অথবা পয়সা দিত, যখন গ্রামবাসীদের অবস্থা স্বচ্ছল থাকিত না তখন বাজীকরের আয়ও কমিয়া যাইত। তথাপি বিবাহ করে নাই বলিয়া অনটনের মধ্যেও মনের স্ফূর্ত্তিতে সে দিন অতিবাহিত করিত; অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ভগবানের নিকট নালিশ করিত না। একদিন বাজি দেখাইবার জন্য তাহার থলিটী স্কন্ধে লইয়া রাজপথ দিয়া কোন গ্রামের অভিমুখে যাইবার সময় একজন মঠনিবাসী সন্ন্যাসীর সহিত তাহার পরিচয় হইল। সন্ন্যাসীর জীবন নিশ্চিন্ত, সর্ব্বদাই দেবী Virgin Maryর সেবায় তাঁহারা জীবন যাপন করেন ইহা শুনিয়া বাজীকর মঠে আশ্রয়লাভ করিবার প্রার্থনা জানাইল এবং সন্ন্যাসী তাহাকে সরল বিশ্বাসী দেখিয়া সঙ্গে করিয়া নিজ মঠে লইয়া যাইলেন।

মঠের মন্দিরে দেবী Virgin Maryর মূর্ত্তি উচ্চবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। নিয়মমত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সন্ন্যাসীগণ সেই মন্দিরে সমবেত হন এবং পূজা আরাধনা সমাপ্ত হইলে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু অন্য সময়েও সন্ন্যাসীগণ দেবীর সেবাকার্য্যে উদাসীন নহেন। কোন সন্ন্যাসী হয়ত নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া পাথরে দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছেন, পাথরের গুঁড়ায় তাঁহার দেহ পরিব্যাপ্ত, চোখে গুঁড়া লাগিয়া চক্ষু ফুলিয়া

রক্তবর্ণ হইয়াছে তথাপি সেবার বিরাম নাই, অনুক্ষণ বাটালি হস্তে প্রস্তর খোদাই করিয়া প্রতিমা গঠন করিতেছেন। কেহ বা চিত্রকর, সর্ব্বদা দেবীর মূর্ত্তি চিত্রফলকে অঙ্কিত করিতেছেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ বা কবি, অবসরকালে দেবীর গুণকীর্ত্তন করিয়া কবিতা রচনা করিতেছেন। কেহ বা সর্ব্বদাই ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত দেবীর লীলা অনুশীলন করিতেছেন। এইরূপে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তাঁহারা দেবীর সেবায় নিযুক্ত, প্রত্যেকেই মনে করেন তাঁহার সেবাই শ্রেষ্ঠ, দেবীর প্রসাদ তিনি অবশ্যই লাভ করিবেন। নিরক্ষর বাজীকর শিক্ষিত ও ক্রিয়াকুশল সন্ন্যাসী-গণের এইরূপ সেবা দেখিয়া দিন দিন বড়ই মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এই মহামহিমময়ী, শত শত শিক্ষিত ভক্তবৃন্দসেবিতা দেবীর নিকট এই মূর্খের পূজা অতি অকিঞ্চিৎকর; লজ্জায় সে প্রতিদিন ম্রিয়মান হইতে লাগিল অথচ দেবীকে সেবা করিবার জন্য তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, উপায়ের অভাবে অবরুদ্ধ ভক্তি ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া উঠিতেছে। মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী বাজীকরের এই বিমর্ষভাব লক্ষ্য করিলেন, আশ্বাস দিলেন যে ভাগ্যদোষে সে কলাবিদ্যা অথবা শাস্ত্রাধ্যয়ণ হইতে বঞ্চিত সুতরাং তাঁহার পূজা অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মত দেবীর আদরণীয় না হইলেও প্রার্থনার দ্বারা ক্রমশঃ সে মেরীর সেবক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। কিন্তু বাজীকরের মন শান্ত হয় না; লজ্জা ও দীনতায় শির অবনত করিয়া সে মঠের মধ্যে জীবনের গ্লানি বহন করে।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন মঠাধ্যক্ষ লক্ষ্য করিলেন বাজীকর আর বিমর্ষ নহে; একটা আনন্দ তাহার মুখমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। মঠাধ্যক্ষ বিস্মিত হইয়া বাজীকরের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন বাজীকর প্রত্যহ অপরাহ্নকালে সকলের অজ্ঞাতে রুদ্ধদ্বার দেবীমন্দির খুলিয়া একাকী প্রবেশ করে এবং কিয়ৎক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া আসে। নির্জ্জন মন্দিরে

প্রবেশ করিয়া বাজীকর কি করে তাহা দেখিবার জন্য মঠাধ্যক্ষ একদিন নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলেন। মন্দিরের একপার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া তিনি দেখিলেন বাজীকর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাহার বাজীর যন্ত্রাদিপূর্ণ থলিটী এক নিভৃত স্থান হইতে বাহির করিয়া দেবীর বেদীর নিম্নভূমিতে দাঁড়াইয়া অশেষ যত্ন সহকারে দেবীকে বাজী দেখাইতে আরম্ভ করিল। তাহার গৃহস্থজীবনে গ্রামবাসীরা তাহার একটী বাজীর বড়ই প্রশংসা করিত—সে হাতের উপর ভর রাখিয়া পা দুইটী উপরে তুলিয়া এক হাত দিয়া কতকগুলি লৌহ-গোলক ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিত এবং পদদ্বয়ের দ্বারা তাহা পুনরায় ধরিয়া ফেলিত। এই ক্রীড়াটী দেখাইবামাত্র গ্রামবাসীরা চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজতখণ্ড তাহার দিকে নিক্ষেপ করিত। বাজীকর জানিত যে ইহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া। মঠাধ্যক্ষ দেখিলেন এই বাজীটী Virgin Mary-র সম্মুখে বাজীকর অনেকক্ষণ দেখাইল এবং যখন ক্রীড়া শেষ হইল তখন তাহার মুখ হইতে পরিশ্রমজনিত স্বেদবিন্দু অবিরল ধারে নির্গলিত হইতেছে। মঠাধ্যক্ষ ভাবিতেছেন বাজীকর নিশ্চয়ই পাগল হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে বিস্মিত হইয়া দেখিলেন দেবী মেরী তাঁহার বেদী হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া প্রসন্নবদনে বাজীকরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজ বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া বাজীকরের স্বেদবিন্দু স্নেহসুকোমল হস্তে মুছাইয়া দিলেন। দেবীকর-স্পর্শে বাজীকর সুস্থ ও উজ্জ্বল হইয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইল। মঠাধ্যক্ষ বুঝিলেন—ভক্তিতে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর!

ভগবান ভক্তাধীন, শাস্ত্র বা পাণ্ডিত্যের অধীন নহেন, সেই জন্যই ভক্তকে ভগবানের অধিক করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করা হইয়াছে। তিনি ভক্তপদচিহ্ন হৃদয়ে বহন করেন, গোবর্দ্ধনধারণশক্ত বিশাল হস্তে তিনি ভক্তের স্বেদবারি অপনোদন করিয়া থাকেন, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তের ক্ষুদ্রহৃদয়ে বাস করিতে ভালবাসেন। "সকলের চেয়ে

বড় পৃথিবী, তার চেয়ে বড় সাগর, তার চেয়ে বড় আকাশ। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করিয়াছিলেন। সেই বিষ্ণুপদ ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে। তাই ভক্তের হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।" ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত অভিমত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিভূতিশক্তি

সাধকজীবনে বিভূতি বা সিদ্ধাই লাভ এক স্বাভাবিক পরিণতি। এই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমতের বৈশিষ্ট্য সাধু এবং সংসারী উভয়েরই প্রণিধানযোগ্য। সাধকজীবনে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই কতকগুলি অসাধারণশক্তি আপনাআপনিই সাধকের মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই একই শক্তি প্রয়োগ ভেদে বিভূতি অথবা সিদ্ধাই নামে সাধুসমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। যদি ভজনসাধনের অনুকূল কোন অবস্থা সৃষ্টির জন্য এই শক্তির বৈধ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে তাহাকে বিভূতি বলা হইয়া থাকে কিন্তু যদি হীন অথবা স্বার্থদুষ্ট কোন উদ্দেশ্যে এই শক্তির অপব্যবহার করা হয় তাহা হইলে সেই একই শক্তি সিদ্ধাই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। ভগবানের শক্তি অনন্ত। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে ভজনজীবনের প্রারম্ভে এই অনন্তশক্তির মধ্যে প্রথমেই ঐশ্বর্য্যশক্তির সহিত পরিচয় হয়, বিশ্বপিতার কৃপাশক্তি সাধক-জীবনের চরম লক্ষ্য হইলেও সেই কৃপাশক্তি সহজে সাধুর নিকট আভাসেও প্রকাশিত হয় না। ভগবানের এই ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রকাশ সাধনজীবনের এক প্রধান অন্তরায়। ভক্ত কৃপাশক্তির ভিখারী। সাধনভজন পরিপক্ক হইলে ভগবানের কৃপাশক্তির সহিত ভক্তের নিত্যসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, প্রকৃত সাধক ভগবানের ঐশ্বর্য্যশক্তির বিশেষ সন্ধান রাখেন না। তাই সাধনজীবনের প্রারম্ভে ঐশ্বর্য্যশক্তিই ভক্তকে ভাল করিয়া নাড়াচাড়া দেয়, দুর্ব্বলচিত্ত ভক্ত এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাতেই আপনাকে হারাইয়া ফেলে, সাধনপথে অগ্রসর হইয়া কৃপাশক্তির পরিচয় তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠেনা। তাই দেখা যায় ব্যাধি আরোগ্য করিবার

শক্তি, দূরদৃষ্টিলাভ, বিরক্তিভাজন লোকের ক্ষতি করিবার ক্ষমতা, ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন লোককে বশীভূত করিয়া নিজ অতৃপ্তবাসনার সফলতা প্রভৃতি বহুবিধ অলৌকিকশক্তি ক্রমশঃ সাধককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ বিভূতিশক্তি প্রকাশিত হইলে লঘুপ্রকৃতি ব্যক্তির স্বভাবতঃই অহঙ্কার এবং চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখন এই সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা মানবসমাজে কারণ অথবা অকারণে জাহির করিবার কণ্ডূয়ন দুর্ব্বলচিত্ত সাধককে অধিকার করিয়া বসে। যেমন বিশ্ব-প্রয়োজন বিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষার্থী ছাত্র প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিয়া যাহা কেবলমাত্র সেইটুকুই লিখিয়া ক্ষান্ত হয় না, যাহা সে জানে তাহার সমস্তটাই তাহার উত্তরমালার ভিতর প্রবেশ করাইবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকে সেইরূপ নবীন সাধকও অপ্রয়োজনে অথবা নিজ প্রবৃত্তিবশে অযথা প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া সাধনার্জ্জিত সমস্ত বিভূতিগুলিই জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া সুলভ গৌরবলাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। যখন বিভূতির এইরূপ অপব্যবহার হয় তখন তাহা সিদ্ধাই নামে সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। হয়ত কোন সাধুর হস্তমুষ্টির ভিতর হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল, কেহবা সূত্রখণ্ড ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুষ্টিমধ্যে সুস্বাদু চিনিতে পরিণত করিলেন, কেহ বা অগ্নির উপর দিয়া অক্ষতপদে হাঁটিয়া যাইলেন, কোন সাধু দর্শকগণের ইচ্ছামাত্রই যে কোন খাদ্যদ্রব্য শূন্য হইতে আহরণ করিলেন। সাধারণ গৃহীলোকেরা এই শক্তিপ্রকাশে মুগ্ধ হইয়া সাধুর শরণাপন্ন হয়, তাহারা বুঝিতে পারে না যে এই বিভূতিলাভ ও ঈশ্বরলাভ পৃথক্ বস্তু, বিভূতিলাভ হইলেও ঈশ্বরলাভ সাধুর অনেক দূরের বস্তু অথবা দুর্ল্লভ বস্তুও হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ বিষয়ী লোক এই ম্যাজিকশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিজে আধ্যাত্মিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধুর সাধনপথে মহাবিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সমস্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি রোধ করিয়া ফেলে। অতি

বৃহৎ আধার না হইলে সাধারণ সাধকের পক্ষে এই সমস্ত বিভূতি শক্তি নীরবে আত্মসাৎ করা অত্যন্ত কঠিন। সাধনপথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেই বিনা প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য নিরপেক্ষভাবে এই বিভূতিশক্তি লাভ হইয়া থাকে, তখন সাধু সাবধানে তাহাকে অবহেলা করিয়া নিজের দৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরলাভের প্রতি নিবদ্ধ না রাখিলে সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী। অপব্যবহারে 'হারাইয়া লাভেমুলে' কত সাধকের সমস্ত আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে সাধনজীবনের ইতিহাসে তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুদিন কঠোর সাধনভজনের ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিবার ফলে বিভূতিলাভ করিয়াছিলেন। এই ঐশ্বর্য্যময়ীশক্তি তাঁহার জীবনে বহুক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহার নিকটতম শিষ্যগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে শ্রীরামকৃষ্ণ এই শক্তিকে সাধনজীবনের প্রবল অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন এবং অপক্ক যোগিগণ এই শক্তিকে যেরূপ বিস্ময় ও সমাদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন ঠাকুর তাহা কখনই করেন নাই। কিন্তু বিভুতিশক্তি তাঁহার ছিল,—যদিও সেই শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত আধ্যাত্মিক বলপ্রয়োগে সর্ব্বদাই আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন। একদিন শ্রীপরমহংসদেব নরেন্দ্রকে পঞ্চবটী-তলে আহ্বান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"দেখ্, তপস্যাপ্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতি সকল অনেককাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির যাহার পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ঠিক্ থাকে না তাহার ঐ সকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি মাকে বলিয়া তোকে ঐ সকল প্রদান করি, কারণ মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে।" নরেন্দ্র অবশ্যই গুরুর অন্তঃকরণের ইচ্ছা বুঝিয়া ঐ শক্তির দান গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। কিন্তু সাধন-বৃক্ষমূলে, নিভৃত সময়ে গুরুশিষ্যের এই পরমবিশ্বস্ত কথাবার্ত্তা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ঠাকুরের মধ্যেও বিভূতিশক্তির বিকাশ হইয়াছিল।

ইহাও বুঝা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভূতি সকলকে আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরায় বলিয়া মনে করিলেও ভজনসাধনের অবশ্যম্ভাবী প্রথমফলস্বরূপে এই বিভূতি-সকল তাঁহার নিকট স্বতঃই আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিভূতিশক্তিকে তিনি কত নিম্নস্তরের সিদ্ধি বলিয়া মনে করিতেন তাহা তাঁহার নিজের কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। "…সিদ্ধাই চাইবার যো নেই। প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল—'মার কাছে একটু ক্ষমতা চেও।' কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখ্‌লাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের রাঁঢ় কাপড় তুলে ভড়্ ভড় ক'রে হাগ্‌ছে। তখন হৃদের উপর রাগ হলো—কেন সে সিদ্ধাই চাইতে শিখিয়ে দিলে।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সমগ্রজীবনে বিভূতিশক্তিকে বিষ্ঠার মতই মিথ্যা ও ঘৃণিত বলিয়া মনে করিতেন এবং বারংবার সেই কথাই উপদেশ এবং সতর্কতারূপে শিষ্যগণের নিকট প্রকাশিত করিতেন।

কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অনেকক্ষেত্রে তাঁহারা জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় অথবা অননুসন্ধানে এই বিভূতিশক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপক্ষেত্রে সাধুদের কোন অপরাধ হয়না, সুতরাং এই বিভূতিশক্তির অপব্যবহার না হওয়ায় ইহা অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। নিজের অহঙ্কারপ্রসূত বিভূতিশক্তির যে প্রকাশ তাহাই ক্ষতিকর; নিঃস্বার্থমনে অপরের উপকারের জন্য দীনবৎসল সাধুগণ যে শক্তির ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা কখনই সাধুর আধ্যাত্মিক জীবনের কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। শ্রীপরমহংসদেবের জীবনেও এরূপ অনেক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। দয়াপরবশ হইয়া রোগীকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুর শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য করিয়াছিলেন, অধর সেন কয়েকদিন অনুপস্থিতির পর আসিবামাত্র ঠাকুর তাহাকে বারংবার বলিলেন—"সময় থাকতে ভগবানকে ডেকে নিতে হয়" এবং ইহার পর ছয়মাসের মধ্যেই অধরের মৃত্যু ঘটিল, স্বামী বিবেকানন্দের অল্পবয়সে মৃত্যুর সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দ্রুতগতিতে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সতর্ক হইতে

ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, গুরুতর ফৌজদারী মকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া মথুর শরণাপন্ন হইলে তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—এইরূপ অনেক ঘটনার ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় এবং কখনও বা অজ্ঞাতসারে এই বিভূতিশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাধুগণের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দয়াপরবশ হইয়া অথবা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সাধুগণ বিভূতিপ্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অনেকক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীনরোত্তমদাস গাম্ভীলা গ্রামে শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে অসুস্থ হইয়া গঙ্গাযাত্রা করিয়াছেন,—তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ শ্রীনরোত্তম ও তদীয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণের উপর বিশেষ বিরক্ত, কারণ শ্রীনরোত্তম শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রপ্রদান করিয়াছিলেন। কটুকথা বলিয়া মনের বিষ উদ্গীরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণ গঙ্গানারায়ণকে বলিলেন—"কি গো চক্রবর্ত্তী, তোমার গুরুর বাক্‌রোধ হইয়াছে না কি? এখন অন্তিমকালে তাঁহার কৃষ্ণনাম করা উচিত। কই মুখ দিয়া তো কোন কথাই বাহির হইতেছেনা! ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেই এইরূপ দশা হইবে তাহা আমরা আগেই জানি।" গঙ্গানারায়ণের দুঃখের সীমা নাই। একদিকে মৃত্যুশয্যাশায়িত তাঁহার গুরুদেবের অবমাননায় ক্রোধ, অন্যদিকে স্বগ্রামবাসী এই সমস্ত পাষণ্ড ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক অবনতির চিন্তায় মর্ম্মান্তিক দুঃখ। যুগপৎ ক্রোধ ও দুঃখের সংঘর্ষে যখন গঙ্গানারায়ণ জড়ের মত অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে শ্রীনরোত্তমদাস প্রাণত্যাগ করিলেন। পাষণ্ড ব্রাহ্মণগণের আনন্দের সীমা নাই।—"ব্যাটা যেমন ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিয়াছিল তেম্‌নি বাক্‌রোধ হইয়া মরিল।" গঙ্গানারায়ণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নিজ মৃত গুরুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"প্রভু, কত পাষণ্ড উদ্ধার করিয়াছ। এই বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণগণ সাধুনিন্দা করিয়া

নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। তুমি ইহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া দণ্ডবিধান কর।" শিষ্যের এই কাতর ক্রন্দন মৃত শ্রীনরোত্তমদাস শ্রবণ করিলেন, জীবনের সমস্ত চিহ্ন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিল, তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুশয্যা ত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন এবং শরণাগত ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। করুণাবিগলিত হইয়া এই বিভূতিপ্রকাশ শ্রীনরোত্তমদাস মহাশয়ের জীবনে এক অপূর্ব্ব ঘটনা।

শ্রীভক্তমালগ্রন্থে সীতানাম্নী এক বৈষ্ণবীর এইরূপ বিভূতিপ্রকাশের কাহিনী বর্ণিত আছে। এক বণিক সীতার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য যেমন চেষ্টা করিল অমনি সেই দেহপ্রসূত দারুণ অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এইরূপ বিভূতিপ্রকাশের দ্বারা হরিভক্তিমতী নারী নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে

তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া
এক ভিতে বসি রহে কৃষ্ণে মন দিয়া।
বণিক্ চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে
আগুনের উল্কা হেন লাগয়ে শরীরে।
নিকটে যাইতে নারে পোড়য়ে শরীর
দূরে পলাইলা মূঢ় হইয়া অস্থির॥

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটী ঘটনা। শ্রীগম্ভীরনাথজীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই সাধুর অসাধারণ যোগশক্তি ছিল অথচ বাক্যে অথবা কার্য্যে তাহার বহিঃপ্রকাশ হইত না। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—বাবা গম্ভীরনাথ পলকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে সমর্থ,—এতই বিভূতিশক্তি শ্রীগম্ভীরনাথজী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজ ঐশ্বর্য্যশক্তি গোপন করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট এই

যোগীও কথনও কখনও প্রয়োজনমত বিভূতিশক্তির প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীগম্ভীনাথজীর জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "একবার মন্দিরে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ। যতলোক নিমন্ত্রণে যোগদান করিবার সম্ভাবনা তাহা হিসাব করিয়া দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আহারের সময় দেখা গেল যে যতজন ব্রাহ্মণের জন্য'আয়োজন করা হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহাদের উপর এ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল তাঁহারা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।...তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া বাবাজীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া এ বিষয় নিবেদন করিলেন। তিনি সঙ্কট অবস্থা বিবেচনা করিয়া একখানা নূতন চাদর খুলিয়া দিলেন এবং সেই চাদর দ্বারা খাদ্য-সামগ্রী আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া একদিক্ হইতে পরিবেশন করিতে আদেশ করিলেন। শেষে দেখা গেল যে সকলে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া যাওয়ার পরেও কতক পরিমাণ জিনিষ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

আর একবার আমের দিনে শুধু আমের নিমন্ত্রণ। সে দিনও লোকের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতরূপে এত অধিক হইয়াছিল যে যত আম গৃহে আছে তাহাতে তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান অসম্ভব। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। মহাপুরুষ তখন ধীরভাবে আদেশ করিলেন যে সমস্ত আম এই খাটের নীচে আনিয়া রাখ। আম আনীত হইলে তিনি তাহা একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেন এবং এক পার্শ্ব হইতে খরচ করিতে বলিলেন। সেদিনও সকলের তৃপ্তির সহিত প্রচুর পরিমাণে ভোজনের পরও অনেক আম অবশিষ্ট রহিল।"

আর একবার, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই বিষয়ীবিলাসক্ষেত্র কোলাহলমুখরিত কলিকাতা নগরীতে শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী তদীয় বিভূতিশক্তির অপূর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীসন্তদাস বাবাজী মহাশয় তখনও দীক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই, তখনও তিনি হাইকোর্টের উকিল।

শ্রীতারাকিশোর রায় চৌধুরী। তিনি শ্রীরামদাসের নিকট বৃন্দাবনে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেছেন কিন্তু ভবিষ্যৎ গুরুর প্রতি স্থির বিশ্বাস এখনও আসে নাই, এখনও ইংরাজি শিক্ষিত মন সাধুকে পরীক্ষা করিতেছে। শ্রীরামদাস তাঁহাকে প্রভাতে উঠিয়া ভগবৎচিন্তন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু অভ্যাসের অভাববশতঃ তারাকিশোর চেষ্টা করিয়াও প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতে পারিতেন না। একদিন শেষরাত্রিতে মশারি টাঙ্গাইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন হঠাৎ একটি ছোট ঢিল গায়ে লাগিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং "উঠ" কথাটি তিনি সুস্পষ্টই সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলেন। "আমি তখনই উঠিলাম এবং ঢিলটী হাতে করিয়া লইলাম কিন্তু জানালার বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; আরও দেখিলাম যে মশারির কোন স্থানে কোন ছিদ্র হয় নাই। ইহাতে ঢিল কিরূপে মশারির ভিতরে আসিয়া আমার গায়ে পড়িল তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।......তৎপরে আর এক দিবস খোলা ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষরাত্রে অতি মৃদুস্বরে কেহ আমার নাম করিয়া দুই তিনবার ডাকিল। অবাক হইয়া চিন্তা করিতে করিতে ছাদে বেড়াইতে লাগিলাম।......শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি আমার আস্থা যে জন্মে নাই তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।" তারাকিশোরের ভাবী গুরুদেব যে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে চিহ্নিতদাস করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারই জন্য ঐশ্বর্য্যশক্তির সহায়ে শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আসিয়া তারাকিশোরের দেরীতে শয্যাত্যাগের কু-অভ্যাস ছাড়াইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শিষ্য গড়িয়া লইতেছিলেন তাহা তখন তারাকিশোরের অজ্ঞাত ছিল। তারাকিশোরের জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনাটী ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেয়। শ্রীতারাকিশোর লিখিয়াছেন, "এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি ; শেষরাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র দেখিলাম যেন আকাশভেদ

করিয়া শ্রীযুক্তবাবাজী মহারাজ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি আমার সম্মুখে ছাদের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই একটী মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে উপদেশ করিলেন। মন্ত্রোপদেশ করিয়া তিনি আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।" যিনি এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, তখন হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া তিনি বুদ্ধির উৎকর্ষে সহস্র সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন। সুতরাং মিথ্যা বা ভ্রান্তির সন্দেহ হইতে পারে না; তাঁহার এই সুস্পষ্ট উক্তি হইতে বুঝা যায় যে শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় এই শিষ্যের কল্যাণের জন্য নিজের বিভূতিশক্তি বারংবার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ফলও অভিমতই হইয়াছিল। "আমি মনে করিতে লাগিলাম যিনি এখানে (বৃন্দাবনে) থাকিয়াও সহস্র মাইল দূরস্থিত কলিকাতায় আমাকে দৃষ্টি করিতে সমর্থ এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রবোধিত ও দীক্ষিত করিয়াছেন তিনি অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহার নিকট আমার আত্মসমর্পণ করিতে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই।" এইরূপে বিভূতিপ্রকাশের ফলে শ্রীতারাকিশোরের মনের গ্লানি ও সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছিল এবং তিনি শ্রীরামদাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া উত্তরকালে হিন্দুসমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ কত উদাহরণ আছে। কিন্তু সাধারণ জীব সাধুদের নিকট নিজের চিরন্তন উন্নতির উপায় প্রার্থনা করিতে জানে না, সাধুকে প্রসন্ন করিয়া এমনই অকিঞ্চিৎকর বস্তু প্রার্থনা করিয়া বসে যে অবশেষে সমস্ত জীবন অনুতাপ করিতে হয়। শ্রীপরমহংসদেব এইরূপ নিষ্ফল মনোবৃত্তিকে বলিতেন—"Queenএর কাছে লাউ কুমড়া প্রার্থনা করা।" শ্রীভাগবতে বহুস্থানে সাধুপ্রশস্তি করা হইয়াছে এবং তদুপলক্ষ্যে সাধু গণের সমস্তগুণের

মধ্যে "দীনবৎসলতাই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সাধবো দীনবৎসলাঃ—ইহাই বারংবার বলা হইয়াছে। সাধুরা কৃপাপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ কিন্তু মানুষ চাহিতে জানেনা, মানুষ অনেক সময়েই নিজের পরমার্থ বুঝে না, সুতরাং সাধুর নিকট "লাউকুমড়া" চাহিয়া বসে এবং তাহাই পায়। অথচ সাধুদের দর্শনমাত্রেই কল্যাণ হইয়া থাকে ইহা শ্রীভাগবতে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবৎমুখী মন লইয়া মানুষ যদি সাধুদর্শন করে তাহা হইলে তাহার মনুষ্যজীবনের কৃতার্থতা অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

> ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ
> তে পুনস্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।

[জলময় তীর্থসকল অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীগণ অথবা মৃত্তিকা ও শিলানির্ম্মিত দেব বিগ্রহ মনুষ্যকর্ত্তৃক বহুকাল সেবিত হইলে তবে ফলপ্রদান করেন, সহজে ফলপ্রাপ্তি হয় না, কিন্তু সাধুর দর্শনমাত্রেই পরমার্থতা লাভ হইয়া থাকে।]

ইহার অর্থ সহজেই অনুমেয়। সাধুগণ যেমন একদিকে অনন্ত বিভূতিসম্পন্ন, তেমনই অন্যদিকে দীনবৎসল। সুতরাং একবার তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেই অশেষ ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রীপরমহংসদেবের নিকট কেহ বা শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কেহ বা মকর্দ্দমায় জয় চাহিয়াছেন, কেহ বা অর্থের উৎকোচ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্যবসাবাণিজ্যে দশগুণ অর্থপ্রাপ্তির মনোভাব গোপন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা শ্রীপরমহংসদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃত্বের প্রতিফলিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ বৃথা প্রার্থনাই সাধারণতঃ শ্রীপরমহংসদেবকে বিরক্ত করিত। তিনি ভক্তসমাগম ভালবাসিতেন, কিন্তু বিষয়ীসমাগম ভয় করিতেন। কর্ম্মবিপাকে যে সমস্ত বিষয়কীট ব্যাধি, মকর্দ্দমা, মৃত্যু প্রভৃতি ঘোর অশান্তি ভোগ করিতেছে

তাহাদের দেখিলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভয় হইত—"তাহারা বিষয় বিষমতৃষ্ণা শান্তির কারণে" তাঁহার নিকট আসিত না, এই তৃষ্ণা উপভোগ করিবার উপযোগী শরীর ও মন প্রার্থনা করিত। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরের সিংহদ্বার দিয়া প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ি প্রবেশ করিতে দেখিয়া শঙ্কিত বালকের মত শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিলেন, "তামাক খাইতে যাইতেছি" বলিয়া বিষয়ীর উত্তপ্ত সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের বারেণ্ডায় পদচারণ করিতেন, পাছে বিষয়ীজীবের শোকতাপ জর্জ্জরিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া দয়াপরবশ হইয়া বিভূতিপ্রকাশ করিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই আপনাকে সাবধানে বিষয়ীস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন, "এক একবার গা কাঁপে পাছে ঐ সব শক্তি এসে পড়ে। এখন যদি সিদ্ধাই হয়, এখানে ডাক্তারখানা হাসপাতাল হয়ে পড়বে। লোক এসে বলবে—আমার অসুখ ভাল করে দাও।"

এইরূপ বিষয়ীর অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনার একটী বিশিষ্ট উদাহরণ দেওঘরের শ্রীবালানন্দ স্বামীর গুরুদেবের জীবনে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সাধু একবার তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে বরোদারাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরোদা রাজমহিষী যমুনাবাঈ এই সাধুর পথিমধ্যে ভক্তপ্রদত্ত শাকপরিপূর্ণ ঝোলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ আমার ভাগ্য বড়ই সুপ্রসন্ন। সাধুমহারাজের ঝোলা বড়ই ভারি দেখাইতেছে। আজ আমি নিশ্চয়ই অনেক প্রসাদ পাইব।" সাধু উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তুমি আন্দাজ ঠিকই করিয়াছ। আজ বহুৎ মিলেগা। ক্যা মাংতে হুঁ।" সাধু এই মহিলার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কল্পতরু হইয়াছেন—"আজ বহুৎ মিলেগা। ক্যা মাংতে হুঁ।"—আজ এই ভক্তিমতী নারী যাহাই প্রার্থনা করিবেন তাহাই তিনি পাইবেন, আজ সাধুর কিছুই অদেয় নাই। মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের এমন শুভমুহূর্ত্ত সচরাচর আসে না কিন্তু এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের অর্থ এই মলিনবুদ্ধি নারী

গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রাণী যমুনাবাঈ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহারাজ, আঙ্গুর অনেকদিন খাই নাই, কিছু আঙ্গুর প্রসাদ পাইলে সুখী হই।" তখন আঙ্গুরের সময় নহে; সুতরাং রাণীর এই সাধুপরীক্ষাস্পৃহা ও কৌতুকপ্রিয়তা দেখিয়া সন্ন্যাসী হাসিলেন এবং তাঁহার ঝোলা হইতে একগুচ্ছ সুপক্ক আঙ্গুর বাহির করিয়া শ্রীযমুনাবাঈকে প্রদান করিলেন। রাণী সেদিন বুঝিতে পারিলেন না তুচ্ছ "লাউকুমড়া" প্রার্থনা করিয়া তিনি আপনাকে কিরূপ শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত করিলেন, ভবিষ্যতে তাঁহার বুদ্ধির উদয় হইয়া তাঁহাকে অনুতপ্ত করিয়াছিল কি না তাহা অবশ্য জানা যায় নাই। ইহাই শ্রীপরমহংসদেবের "Queenএর কাছে লাউকুমড়া চাওয়া।" বিষয়ী মানুষ সাধুদর্শন চাহে না, সাধুদর্শন হইলেও তাহার সম্যক্ ফলগ্রহণ করিতে অসমর্থ।

কিন্তু অপক্কযোগীগণ এই বিভূতিশক্তি পাইলেই চঞ্চল হইয়া উঠেন, এই শক্তি প্রয়োগ করিবার কণ্ডূয়ন সাধকের সমস্ত বুদ্ধিবিবেচনাকে মলিন করিয়া দেয়। নরেন্দ্র তাঁহার সাধনজীবনের প্রারম্ভে শক্তি অনুভব করিবামাত্র তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য জনৈক ভক্তকে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সেই ভক্তের মনে ও শরীরে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রকে স্নেহসূচক ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!" এইরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তদীয় শিষ্য শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে বিভূতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের তখনও মনের উপর প্রভুত্ব আসে নাই, এরূপ অপক্ক অবস্থায় বিভূতিলাভ হইলে ব্রহ্মচারী সংসার "ছারখার" করিয়া ফেলিবেন। বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার দর্শন করিলেই আমরা সাধুগণের এই সতর্কতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি। এ্যাটম্ বোমা, বিষাক্তগ্যাস, জাহাজধ্বংসী শক্তিশেল প্রভৃতির অপপ্রয়োগ আজ মানুষকে শঙ্কিত ও দুঃখজর্জ্জরিত করিয়া

তুলিয়াছে। মানুষের হাতে বুদ্ধিপ্রসূত শক্তি আসিয়াছে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল মনকে শাসন করিবার আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনও জাগরিত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বিজ্ঞ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক—President of the British Association of Science—বিজ্ঞানের ঠিক্ এই উপদ্রব আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন—"The command of Nature has been given into man's hands before he knows how to command himself."

[মানুষ নিজেকে সংযত করিবার পূর্ব্বেই প্রকৃতির উপর শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে।]

তাহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা আমরা নাগাসাকী ও হিরোসিমা নামক দুইটী জাপানী সহরের বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি।

শ্রীপরমহংসদেবের বিভূতিশক্তি ছিল, তাহার অনেক পরিচয় সময় সময় পাওয়া যাইত, কিন্তু তিনি এই শক্তির বহিঃপ্রকাশকে ভয় করিতেন, এই শক্তিকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। এই শক্তির যথাযথ ব্যবহারও তিনি কখনও কখনও করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বিষয়ই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পণ্ডিত মহাশয়ের অসাধারণ শাস্ত্র জ্ঞান ছিল, বক্তৃতা ও লোকশিক্ষার সময় এই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন, কিন্তু আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধন ভজন তখনও বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। বস্তু ছিল কিন্তু তাহার সম্যক্ স্ফুরণের জন্য কোন প্রচেষ্টা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি সহায়ে ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া একদিন পণ্ডিতজীকে বলিলেন, "ওগো পণ্ডিত, তোমায় দেখলুম। তুমি বেশ লোক। গিন্নী যেমন রেঁধে বেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুর ঘাটে গা ধুতে, কাপড় কাচতে যায়, আর হেঁসেল ঘরে

ফেরে না,—তুমিও তেমনি সকলকে তাঁর কথা বোলে কোয়ে যে যাবে, আর ফিরবে না"। পণ্ডিত শশধর এই উৎসাহবাণীর অর্থগ্রহণ করিলেন, "সে আপনাদের অনুগ্রহ" বলিয়া এই খ্যাতনামা পণ্ডিত চূড়ামণি সেই নিরক্ষর পরমহংসের পদধূলি বারংবার গ্রহণ করিলেন এবং ভাবের আতিশয্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই বিভূতি প্রকাশের ফল হইল, পণ্ডিত মহাশয় অবশেষে প্রচারকার্য্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যাপীঠে তপস্যার জন্য গমন করেন এবং মহাকবির বর্ণিত সাধক জীবনের চরম উৎকর্ষ তাঁহার শেষজীবনে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন।

সভা যেদিন ভাঙ্গবে সেদিন
শেষের গান কি যাব গেয়ে,
হয়ত সেদিন কণ্ঠহারা
মুখের পানে রব চেয়ে।

এইরূপ "কণ্ঠহারা" হইয়া বিশ্বজননীর মুখের পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিবার সৌভাগ্য জগতে অল্পসংখক ভক্তেরই হইয়া থাকে। পরম সত্যবাদী শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত আশ্বাসবাণী,—"আর ফিরবে না" অর্থাৎ "করমবিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ" আর হইবে না—এই দুর্ল্লভ আশীর্ব্বাদ তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে প্রাপ্ত হন নাই।

এইরূপ বিভূভিশক্তি থাকা সত্ত্বেও পাছে সাধারণের নিকট শক্তির প্রকাশ হয় এই ভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীর মত লালপেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতেন, চটীজুতা পায়ে দিতেন, 'মার্কামারা' সাধুকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন, সাধনজীবনের প্রারম্ভে নিজ বক্ষস্থল ভাবোজ্জল কান্তিময় হইলে দেবীর নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যাহাতে শারীরিক এই বিভূতিপ্রকাশ ভিতরে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কামনা বাসনা জর্জ্জরিত বিষয়ী মানুষ তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া মনের

বাসনা জানাইত এবং এইরূপে সংক্রামিত বিষয়ীর কলুষস্পর্শ ঠাকুরের সূক্ষ্মশরীরে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন তিনি নিজচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার স্থূলদেহের ভিতর হইতে সূক্ষ্মদেহ বাহির হইয়া আসিল এবং সেই সূক্ষ্মদেহের পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য ক্ষত। ঠাকুরের এই দিব্যদর্শনই বিভূতিশক্তির অর্জ্জন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার সতর্ক অভিমতকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে।

———

বিংশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরলোকতত্ত্ব

মৃত্যুর পর মানুষ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, পুনর্জ্জন্ম হয় কিনা, পুনর্জ্জন্ম হইলে কি প্রকার শরীর গ্রহণ করিতে হয়—এই সমস্ত প্রশ্ন স্বভাবতঃই মানুষের মনে উদিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করিতেন তাহা জানিবার জন্য তৎকালীন ভক্তগণ ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেন। এই সমস্ত কৌতুহলাবিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও একজন। কিন্তু সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিবার চেষ্টা করিতেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন মৃত্যুর পরের সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইলে মানুষকে তৎপূর্ব্বে জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, জন্মের স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যু। মৃত্যুর পরের অবস্থা বুঝিতে হইলে মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য বুঝিয়া দেখা অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মের উদ্দেশ্য জানিতে বারংবার উপদেশ দিতেন; তাঁহার ইহাই বিশ্বাস ছিল মনুষ্যজন্ম যে যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে জানে তাহার নিকট পরজন্মের কথা গৌণ। শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন ভগবৎ-দর্শনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রকথিত সুনির্দ্দিষ্ট পথই অবলম্বন করুক, অথবা কেবলমাত্র কাতর ক্রন্দন করিয়া আত্মনিবেদনের অচিহ্নিত পথই গ্রহণ করুক, যে কোন উপায়ে একবার ভগবৎদর্শন হইলে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। কিন্তু সাধারণ বিষয়ী লোক ভোগবিলাসে অনুরক্ত, জীবনের উদ্দেশ্যসাধন

হইতে তাহারা অনেকদূরে অবস্থিত, সুতরাং যতই জীবনসূর্য্য মৃত্যুর অস্তাচলগামী হইয়া পড়ে ততই দেহত্যাগের পর কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহার চিন্তা বিষয়-কলুষিত মনকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করে। তখন সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই এই প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর বিষয়ী লোক আশা করে, মনের প্রচ্ছন্ন প্রদেশে এই বাসনাই লুক্কায়িত থাকে যেন বিষয়ভোগ করিয়াও পুনরায় দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মলাভ হইতে তাহারা বঞ্চিত না হয়। বিষয় ভোগ চলিতে থাকুক, পুনঃ পুনঃ মনুষ্যজন্মও হউক—ইহাই বিষয়াসক্ত মনের নিগূঢ় প্রদেশের আশা ও প্রার্থনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিষয়ীর মনের গোপন সংবাদ জানিতেন, সাধারণ জীবের বাসনা-কলুষিত জীবনের সন্ধান তিনি রাখিতেন, তাই মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম কিভাবে হইয়া থাকে তাহার উত্তর দিতে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিতেন না। কারণ বিষয়ীজীব মৃত্যুর পর কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার সত্য উত্তর পাইলে সাধারণ মানুষ শঙ্কিত হইয়া উঠিবে, ধর্ম্মে যে সামান্য রুচির উদয় হইতেছিল তাহাও নৈরাশ্যের মধ্যে হারাইয়া যাইবে, পরজন্মের জ্ঞান অশেষ মোহ ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তিবলে বুঝিতে পারিতেন যে দক্ষিণেশ্বরে যাহারা আসিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণের আবেগে আসিত না, বিষয়ভোগের অবসর কালে নানাবিধ সামাজিক কর্ম্মের মধ্যে সাধুদর্শনও কর্ত্তব্যবিশেষ মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিত, ভগবৎ আলোচনা অধিকক্ষণ শ্রবণ করা তাহাদিগের পক্ষে পীড়াদায়ক হইত। সুতরাং শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন—"যাদের প্রথম মানুষজন্ম তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।" কে জানে সে যুগের দক্ষিণেশ্বর যাত্রীর ভিতর কতজনের প্রথম মানুষ-জন্ম! সুতরাং যাহাদের মনের গতি স্বভাবতঃই ভোগের দিকে তাহাদের নিকট জন্মান্তরের সংবাদ বৃথা সময় ক্ষেপণের অন্যতম উপায় মাত্র। তাই জন্মান্তরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইতেন, উৎসাহ সহকারে উত্তর

দিতেন না, ক্বচিৎ উত্তর প্রদান করিলেও তাহা বিষয়ীর প্রীতিকর হইত না।

একদিনের কথা। কাটোয়ানিবাসী জনৈক বৈষ্ণব আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেই চিরন্তন প্রশ্ন করিলেন—"মশায়, আবার জন্ম কি হয়?" প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর জানাই উচিত ছিল তথাপি বৈষ্ণব এই বৃথা প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার প্রশ্নকর্ত্তার সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত ধর্ম্মচিহ্নের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিষয়াসক্ত মনটীকে দেখিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে যেন সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিলেন—"গীতায় আছে, মৃত্যু সময় যে যা চিন্তা ক'রে দেহত্যাগ ক'র্ব্বে তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ ক'রতে হয়। হরিণকে চিন্তা ক'রে ভরতরাজার হরিণ জন্ম হয়েছিল।" এই উত্তর সেই বৈষ্ণবলিঙ্গধারী প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি সাবধানতার বাণীমাত্র। ঠাকুরের উত্তরের মর্ম্মগ্রহণ বৈষ্ণব করিতে পারিলেন না, পুনরায় বলিলেন—"এটী যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে তো বিশ্বাস হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইলেন—"তা জানিনা বাপু! আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছিনা—আবার মলে কি হয়!" ক্ষণকাল পরে ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিলেন—"তুমি যা বল্‌ছ এ সব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, এই চেষ্টা করো। ভক্তিলাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ।......জন্ম জন্মান্তরের খবর!"

কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা শ্রীতুলসীদাস কথিত "বেদিয়া খিঁচে ডোরি"র মত।

"কুদ্‌কে সাগর উতারা, কোহি কিয়া মিৎ
কোহি উখ্ড়া গিরি দরখৎ, কোহি শিখায়া নীৎ।
ক্যা কহঙ্গা সীতানাথকো, মেয়নে কিয়া চোরি
সোহি কুল উদ্ভব হো কর, বেদিয়া খিঁচে ডোরি॥"

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে একজন বেদিয়া একটী বানরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে দ্বারে দ্বারে লইয়া ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছে। ক্লান্ত ও অবসন্ন বানর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলে বেদিয়া তাহার গলদেশের রজ্জু ধরিয়া টান মারিতেছে। বানর মনে মনে ভাবিতেছে যে তাহারই বংশোদ্ভব কোন পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কোন বানর শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল, কেহ বা জগৎকে নীতিশিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সেই বংশোদ্ভব হইয়াও আজ কর্ম্মবিপাকে তাহার গলদেশে সাধারণ বেদিয়া রজ্জু বন্ধন করিয়া পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু এই বানরের যে চৈতন্য ক্ষণকালের জন্যও উদিত হইয়াছিল অনেক মানুষের তাহাও হয় না, ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন মন একবারও উর্দ্ধে উঠিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মের কথা স্মরণ করে না, নিজ জীবনের উদ্দেশ্য পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয় না। শ্রীপরমহংসদেব জানিতেন যে বাসনার ক্ষয় না হইলে পুনর্জ্জন্মের কথা জিজ্ঞাসা করা ব্যর্থ প্রশ্নমাত্র, ইহার কোনই সার্থকতা নাই। বাসনার রাশি যতদিন মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে ততদিন পুনর্জ্জন্মের সংবাদ নিষ্প্রয়োজন এবং সেই প্রশ্নের সাধুকথিত যথাযথ উত্তর বাসনা-পীড়িত বিষয়ী জীবের পক্ষে ভীতিপ্রদ ও নৈরাশ্যকর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়াছিলেন দেহ ও আত্মা পৃথক্ বস্তু, দেহ বিনাশ-শীল, আত্মা অবিনশ্বর। তাঁহার অগ্রজ শ্রীরামকুমারের পুত্র অক্ষয়কে শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহ করিতেন। যুবক অক্ষয়ের মৃত্যুকালে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন।—"অক্ষয় মলো—তখন কিছু হ'ল না। কেমন ক'রে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম। দেখ্‌লুম—যেন খাপের ভেতর তরোয়াল-খানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার ক'রে নিলে; তলোয়ারের কিছু হ'লনা—যেমন তেমন থাক্‌ল—খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হলো, খুব হাসলুম, গান ক'রলুম, নাচলুম।" সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টি সহায়ে

শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মার শুভ্রতা ও নিত্যতা অবলোকন করিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন, স্নেহাস্পদ ভ্রাতুস্পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক তখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেহধারণ করিলেই মানুষকে কতকগুলি দুর্ব্বলতার অধীন হইতে হয়, অনেক সময় দেহের স্থূলতা ভজন সাধনের ফলস্বরূপ দিব্যদৃষ্টিকে আবৃত করিয়া ফেলে। এই ক্ষেত্রে শ্রীপরমহংসের তাহাই হইয়াছিল। অক্ষয়ের মৃতদেহ দগ্ধ করা হইল। "তার পরদিন ঐখানে (কালীবাড়ির বারেণ্ডায়) দাঁড়িয়ে আছি আর দেখ্‌ছি কি—যেন প্রাণের ভিতরটায়, গামছা যেমন নেংড়ায়, তেম্‌নি নেংড়াচ্ছে—অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এম্‌নি ক'চ্ছে। ভাব্‌লুম, মা, এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়! তাই দেখাচ্ছিস্‌ বটে ?"

স্থূলদেহের এই শুদ্ধবুদ্ধিআবরিকা শক্তির শ্রীরামকৃষ্ণ এক অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন যে দেহধারণ করিলে স্বয়ং ভগবানকেও তৎকালে দেহধর্ম্মের অধীন হইতে হয়। "হিরণ্যাক্ষ বধ কর্ব্বার জন্যে বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হলো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে, তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বল্লেন, এ কি হলো, ঠাকুর যে আস্‌তে চাননা। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটী নিবেদন করলে। শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজেদি ক'রলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে স্থূলদেহের যে মায়িক আকর্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার চিত্র সজীব হইয়া পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে

যে জনৈক লোকের মৃত্যু হইলে তাহার ভগ্নীর শোক দেখিয়া স্বয়ং যিশুখৃষ্ট শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে রোদন করিয়াছিলেন—"Jesus wept"। কিন্তু এই যিশুখৃষ্টই ক্রুশবিদ্ধ হইয়া স্বীয় মৃত্যুর সম্মুখে অবিচলিত চিত্তে বলিয়াছিলেন—"Father, forgive them, for they know not what they do." [পিতঃ, ইহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন, ইহারা এতই জড়বুদ্ধি যে পাপের দায়িত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি ইহাদের নাই।] যখন "Jesus wept" তখন যিশুখৃষ্ট দেহধর্ম্মের অধীন, কিন্তু নিজ মৃত্যুর সম্মুখে তিনি দেহাতীত শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মা, তাই ক্রুশবিদ্ধ দেহের ভীষণ যন্ত্রণায় তিনি উদাসীন। একই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মার অবিনশ্বরতা দর্শন করিয়াও অক্ষয়ের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধুগণ এই শোকমোহের অধীন হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র, স্বীয় সাধনবলে তাঁহারা শীঘ্রই সেই শুদ্ধবুদ্ধি আবরণী মোহকে দূরীভূত করিয়া পরমাত্মার সহিত পুনরায় যোগস্থাপন করিয়া আনন্দলাভ করেন। কিন্তু বিষয়ী জীবের মোহ গভীর ও চিরস্থায়ী। তাই মৃত্যুভয় শঙ্কিত জীব মৃত্যুর পরের সংবাদ লইবার জন্য এত উৎসুক। মলিনতার আচ্ছাদনে আবৃত জীবাত্মা স্বভাবতঃই ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠে, সে জানে যে বিষয়াসক্ত জীবন সে যাপন করিতেছে তাহার ফল কখনই শুভ হইতে পারে না। তাই পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর পরের সংবাদ জানিবার জন্য বিষয়ী জীবের এত কৌতুহল হয়। কিন্তু যে লোক জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতেছে, ভগবৎ চিন্তনে যাহার সময় অতিবাহিত হইতেছে তাহার নিকট জীবন মৃত্যুর পার্থক্য কিছুই নাই, অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তিমাত্র। সেই লোকের নিকট মৃত্যুর বিভীষিকা নাই, সুতরাং মৃত্যুর পরের অবস্থা জানিবার জন্য কোন উৎকট আকাঙ্ক্ষাও তাহার মনে উদিত হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমস্ত কৌতুহলী মানবের মিথ্যা কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য কোন উৎসাহ প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে যে কোন কোন সাধুচরিত্র মানবও তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিতেন এবং সেরূপ ক্ষেত্রে বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নিজ অভিমত সময় সময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনটী ক্ষেত্রে তিনি পরলোক সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিলেই তাঁহার সমগ্র অভিমতটাকে পাওয়া যাইবে। প্রথমটী ভক্তপ্রবর মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মার গতি সম্বন্ধে ঠাকুরের বিশ্বাস, দ্বিতীয়টী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রশ্নের উত্তর, তৃতীয়টী শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ইহলোক ত্যাগের পর পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা বর্ণন।

মথুরানাথ অসামান্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে বহুবর্ষ যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন, এই অনন্যসাধারণী সেবা মথুরানাথকে ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছিল। সুতরাং মথুরা-নাথের মৃত্যুর পর জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মথুরের (মৃত্যুর পর) কি হল মশায় ? তাকে নিশ্চয়ই আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না ?" মথুরের সাধন ভজন ছিল না কিন্তু এমন একনিষ্ঠ সেবক শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আর দ্বিতীয় কেহই পরিদৃষ্ট হইত না, সুতরাং সেবার দ্বারাই মথুর মুক্তিলাভ করিবেন ইহাই তখনকার সাধারণ ভক্তগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একদিন ভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ়তার সহিত ঠিক্ এইরূপ কথাই শুনাইয়াছিলেন।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি

[হে কৃষ্ণ, তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী আমরা তোমার দাস, এবং এই দাসের সেবাবৃত্তির দ্বারাই আমরা তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়াকে জয় করিব।]

কিন্তু মথুরের সম্বন্ধে ভক্তের প্রশ্নের ঠিক্ মনোমত উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাওয়া যাইল না। শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—"কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি; ভোগবাসনা ছিল।" স্বামী

সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে "এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।" এই সম্বন্ধে ২।১টী বিষয় আমাদের পরিলক্ষণীয়। "ভোগবাসনা ছিল", সুতরাং মুক্তি নাই। অপূর্ব্ব সেবা করিলেও মথুরানাথ রজোগুণের অধীন হইয়া জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। এই রজোগুণস্পৃষ্ট মন অশেষ বাসনার নিবাসভূমি সুতরাং বাসনাপীড়িত জীবের পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিয়াছেন

তোমার আগুণ উঠুক্ হে জ্বলে,
কৃপা করিও না দুর্ব্বল ব'লে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই
পুড়ে হোক্ ছাই বাসনা॥

দুঃখের উত্তাপে, সাধন ভজনের বিশুদ্ধ অগ্নিতে বাসনাবৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায় এবং তখন পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতিলাভ হইয়া থাকে। জমিদার মথুরের সংসারদুঃখ ছিল না, ভজন সাধনের কৃচ্ছ্রতাও মথুর কখনও অভ্যাস করেন নাই। "এই বলিয়াই ঠাকুর অন্যকথা পাড়িলেন" —এই কথাগুলিও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরলোক অথবা পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে বিষয়ীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসিতেন না। কারণ সহজেই অনুমেয়—বিষয়ী জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, এমন কি কর্ম্মফলে পশুযোনিতেও জন্ম হইতে পারে ;— ইহা শুনিলে বদ্ধজীব সহজেই হতাশ হইয়া পড়িবে। বরং বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যতটুকু ভগবৎচিন্তা করে ততটুকুই তাহার লাভ। শ্রীভাগবত বলিতেছেন—অমোঘা ভগবৎসেবা—যতটুকু করা যায় ততটুকুই অমোঘ, ততটুকুই সার্থক।

আর একবার জনৈক বিষয়ী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ঐরূপ প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া অনুরূপ অভিমত প্রকাশ

করিয়াছিলেন। বিষয়ী ভক্তটী জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?" প্রশ্নটীই বিষয়ীর ভীত মনের পরিচয় দিতেছিল— "পাপের শাস্তি?" আকণ্ঠ যাহারা পাপের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছে তাহারা অন্ধ, পাপের শাস্তি হয় কিনা তাহাও জানেনা, প্রশ্ন করে—ভীতমন ভগবানের অমোঘ বিধানকেও সহজে মানিয়া লইতে চাহেনা। তাই ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"পাপের শাস্তি?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"তোমার ও সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কি না—তাতে কি হয়— এ সব খবর!" বিষয়ীজীবকে সহজ উত্তর দিতে ঠাকুরের সেই চিরাভ্যস্ত অনিচ্ছা—পাছে নিরাশ হইয়া সংসারকীট ভগবানের নিকট হইতে আরও দুরে সরিয়া যায়! কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন— "পরলোকের কথা বোল্‌ছ? গীতার মত, মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই ত জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাতদিন অভ্যাস কর্‌তে হয়; তা হলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে,—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বল্লুম—এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার? তারপর আবার বল্লুম,—যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত কর্‌তে হবে।"

পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ অখণ্ডজীবনের এক নিগূঢ় রহস্য ভক্তগণের নিকট একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন— "সরকারী লোক—আমাকে জগদম্বার জমিদারীর যেখানে যখনই গোলমাল হইবে সেখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।" একবার ঠাকুর উত্তর পশ্চিম কোণ ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রায় দুইশত বৎসর পরে তিনি পুনরায় ইহজগতে ঐ দিকে আবির্ভূত হইবেন। ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন—"জানি আর একবার আসতে হবে।" সুতরাং গ্রাম-

বাসীর চলিত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন—"কোম্পানীজ্ঞানিত লোক।" সুতরাং পৃথিবীর যেখানেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে সেইখানেই সরকার বাহাদুর এই সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিয়া পুনরায় দুষ্টের দমন ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবেন। সরকারী লোকের সাধারণ জীবের ন্যায় মুক্তি নাই। তাঁহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া বিশ্বজননীর চিহ্নিত সেবক, চিরদিন বিশ্বলীলায় তাঁহারা সহায়ক, সুতরাং মুক্তি বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা ইঁহাদিগের নাই। কিন্তু সাধারণ জীবের এবং সরকারী লোকের পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে মহৎ পার্থক্য সহজেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিষয়ী জীব অনিচ্ছায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, জীবন্মুক্ত পুরুষ ভগবদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায়, আনন্দে, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষয়ীজীব কর্ম্মবশে অসহায় হইয়া পশুযোনিও প্রাপ্ত হইতে পারে, লীলাসহায়ক ভক্তগণ শুদ্ধ আচার সম্পন্ন পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যদেহগ্রহণের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন। জীব কর্ম্মবশ, ভক্ত আত্মবশ, জীব দুঃখী, ভক্ত আনন্দময়। জীব ও ভক্ত উভয়েরই পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে কিন্তু এইখানেই তাঁহাদের বিশেষ পার্থক্য।

একবিংশতিতম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময়দেহ

সাধারণতঃ মানুষ সাধুদিগের আত্মার ভাস্বর দীপ্তিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যায় যে তাঁহাদের শরীরের প্রতি সম্যক্ মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু সাধুমাত্রেই সাধনভজনের পরিপাকে এমন একটী অবস্থায় উপনীত হন যে তখন তাঁহার শরীর ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ভিতরের চিন্তা বাহিরের শরীরকে অধিকার করে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবীফলরূপে দেহের উপর সেই চিন্তা প্রবাহের পলি পড়িয়া যায়। ইংরাজ মনীষী কারলাইল কোন মহৎ লোকের জীবনী লিখিবার সময় তাঁহার একখানি চিত্র সম্মুখে রাখিয়া দিতেন। এক একবার সেই চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিতেন এবং সেই দৃষ্টিপ্রসূত চিন্তাধারাকে ধীরে ধীরে লিপিবদ্ধ করিতেন। এমন কি চোর ডাকাত অথবা ইন্দ্রিয়সেবী লোকের শরীরও তাহাদের অসৎচিন্তাসম্ভূত কর্ম্মের চিহ্ন স্বভাবতঃই বহন করে, বিশেষ করিয়া মানুষের মুখের উপর এই প্রভাব অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। সাধুদিগের প্রতি রোমকূপ, প্রতি অণুপরমাণুর উপর আধ্যাত্মিক চিন্তার শক্তি কার্য্য করিয়া যায় এবং তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মুখ অথবা চক্ষু দেখিলেই ভগবৎচিন্তনের প্রভাব সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। সাধুর সাধনভজনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক এই পরিবর্ত্তন একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, ইহার পশ্চাতে এক অলঙ্ঘ্য বিধি কার্য্য করিয়া থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ সম্বন্ধে বুঝিবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় স্বতঃই মনের মধ্যে উদিত হয়। সাধারণ মানুষের চক্ষে ঐশীশক্তিতে সমুজ্জ্বল আত্মাই সাধুজীবনের একমাত্র

পরিলক্ষনীয় বস্তু কিন্তু রসপিপাসু ভক্ত, দেহ ও আত্মার মিলনক্ষেত্রে শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়া লিখিয়াছেন—

দেহে আর মনে প্রাণে হ'য়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।
... ...
তোমারি মিলন-শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে আর প্রাণে আমি এ কী অপরূপ।

তাই সাধুর দেহ ও আত্মা দৃষ্টতঃ পৃথক বস্তু হইলেও ইহারা বস্তুতঃ অপূর্ব্ব মিলনের রঙ্গভূমি ইহা মনে রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহের কথা আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ আকৃতি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত ছিল, কোন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যেরূপ কোন একটা অসাধারণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ কিছু শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে পরিলক্ষিত হইত না। প্রথম যৌবনে তাঁহার দেহের রং দুধে আলতায় গোলার মত ছিল,—ইহা শ্রীরামকৃষ্ণমহিষী ভক্তসন্তানগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কঠোর সাধন ভজনের পরে যে আধ্যাত্মিক দীপ্তি তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থলকে অধিকার করিয়াছিল তাহাও শ্রীবিবেকানন্দ, মহেন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি শিষ্যগণ দেখেন নাই। শিষ্যগণের আগমনের সময় ঠাকুরের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সাধারণ ভাষায় ফর্সা বলা যাইতে পারে। আবার এই শ্যামবর্ণ কখনও কখনও ভাবপ্রবাহের সময় গৌরবর্ণে পরিণত হইত কিন্তু তাহা সাময়িক মাত্র। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে একদিন পাণিহাটীতে রাঘব-পণ্ডিতের সমাধিমন্দিরে যাইবার পথে কীর্ত্তনের সময় ঠাকুরের "উজ্জ্বল

গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ-সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।" ললাটের প্রশস্ততা ঠাকুরের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং মহৎভাগ্য সূচিত করিত। মস্তকের সম্মুখস্থ কেশরাশি কপালের সমস্ত স্থানে সমানভাবে পড়িত না, একগুচ্ছ কেশ ললাটের মধ্যস্থলে যেন একটু লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। ললাটের দুই পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত বিরল কেশ, মধ্যস্থলে দীর্ঘতর কেশগুচ্ছ,—দেখিতে অনেকটা বিশ্ববিজয়ী নেপোলীয়নের ললাটবিন্যস্ত কেশরাশির অনুরূপ। ভ্রূযুগল বেশ টানা, সুন্দর ছিল, চক্ষের পক্ষ্মরাজিতে কেশের প্রাচুর্য্যবশতঃ চোখ দুইটীকে যেন একটু ঢাকা বলিয়া মনে হইত, অনেক সময় ঠাকুরের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এই আয়ত পক্ষ্মরাজির অন্তরাল হইতে কতকটা মৃদু হইয়া ভক্তগণের মুখের উপর নিবদ্ধ হইত। চক্ষু দুইটী ছিল বিস্তৃত এবং তাহার ভিতরের তারকা আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহের সময় বিদ্যুৎ রেখার মত চঞ্চল-দীপ্তি প্রকাশ করিত। কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ চক্ষের দৃষ্টি অন্য কোথায় চলিয়া যাইত,—সাধারণ লোকে অন্যমনস্ক হইলে যেমন দেখায়, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। নাসিকার অগ্রভাগ ছিল কথঞ্চিৎ স্থূল এবং ভাবময়ী কথাবার্ত্তার সময় নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত হইত। কর্ণ দুইটীর লক্ষ্য করিবার কোন বিশেষত্ব ছিলনা। সম্মুখের একটী দাঁত ভাঙ্গা ছিল,—একবার সমাধি অবস্থায় পড়িয়া যাইয়া এই দাঁতটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা, তখনও বিশেষ বিশেষ শিষ্যগণ আসিতে আরম্ভ করেন নাই। ঠোঁট দুইটী ঈষৎ পুরু ছিল। মুখমণ্ডলে দাড়ি ছিল এবং এই দাড়ি বড় হইলে নাপিতের দ্বারা ছাঁটাইয়া লইতেন। সমগ্র মুখমণ্ডল বড়ই সুন্দর ছিল,—বর্ণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ভাব, মনীষার অপূর্ব্ব সমন্বয়ে এই মুখ সময় সময় অসাধারণ ভাব প্রকাশ করিত, তখন ভক্তগণ এই মহাপুরুষের ভিতরের কথা ভুলিয়া গিয়া মুখের সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কণ্ঠস্বর ছিল গভীর, কথাগুলির উচ্চারণ

হইত অতি সুস্পষ্ট কিন্তু ভাবের আতিশয্যে কথাপ্রবাহ সময় সময় বাধা-প্রাপ্ত হইত এবং তাঁহাকে তখন তোতলা বলিয়া মনে হইত। কিন্তু গান গাহিবার সময় এই তোতলামির লেশমাত্র থাকিত না, তখন সুর ও ভাবের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকিত। গানের শক্তি ঠাকুরের অসাধারণ ছিল, এমন কি মধুরকণ্ঠ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ম্লান হইয়া যাইত। স্কন্ধদ্বয় ছিল ঈষৎ উন্নত,—শরীরের দৃঢ়তা ও মনের বীরত্ব-ব্যঞ্জক। কণ্ঠের বড় অস্থি দুইটী দেখা যাইত, যদিও ঠাকুরকে কৃশ বলিয়া কখনই মনে হইত না। যৌবনে প্রশস্ত বক্ষঃস্থল ও ক্ষীণ কটীবন্ধ তাঁহার স্বাস্থ্যের পরিচয় দিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ভাষায় বক্ষের এই 'আয়তন' তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সূচিত করিত। শিষ্যগণ যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার বক্ষচর্ম্ম কথঞ্চিৎ শিথিল। শ্রীরামকৃষ্ণের হাত দুইটী আজানুলম্বিত এবং অপূর্ব্ব কোমল ছিল, বিশেষ করিয়া অঙ্গুলিগুলি সুদীর্ঘ বলিয়া সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সাধারণ বাঙ্গালীর বলিষ্ঠ শরীরেও হস্তদ্বয়ের প্রকোষ্ঠের অস্থি শরীরের অনুপাতে ক্ষীণ দেখা যায়,—এই বিষয়ে ইংরাজদের স্থূল প্রকোষ্ঠের সহিত বাঙ্গালীর ক্ষীণ প্রকোষ্ঠের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠ দুইটী বেশ প্রশস্ত ও সুগঠিত ছিল। পদদ্বয়ের পেশীসমূহ দৃঢ় ও মাংসল ছিল। তাঁহার শ্রীচরণ দুইটীর বর্ণনা কোথাও লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ দুইটী দেহের সমস্ত অবয়ব অপেক্ষা ফর্সা ছিল, অঙ্গুলিগুলি মাটির উপর সমানভাবে সুবিন্যস্ত হইয়া পড়িত, কেবলমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী মাটি হইতে যেন ঈষৎ উচ্চ হইয়া থাকিত। সমগ্র দেহটী ছিল নাতিহ্রস্ব ও নাতিদীর্ঘ। সর্ব্বোপরি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আচ্ছন্ন করিয়া যে অপূর্ব্ব লাবণ্য, করুণা ও ঐশীগৌরব অহঃরহঃ বিরাজ করিত তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপবিষ্ট

অবস্থার যে ফটো সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় গৃহীত হইয়াছিল সুতরাং ঠিক্ জীবন্ত প্রতিকৃতি তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহ সাধন ভজনের ফলে চিন্ময় হইয়াছিল কিন্তু তথাপি শিষ্যগণের শিক্ষার সময় তিনি দেহ ও আত্মা পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করিতেন,—এই দেহই শ্রীরামকৃষ্ণ নহে, ইহার ভিতরে যে শুদ্ধ আত্মা বিরাজ করিতেছে তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত রূপ ও স্বভাব। শিষ্যগণ পাছে নিজ নিজ দেহ ও আত্মার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেহকেই 'আমি' বলিয়া ভুল করে,—এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই শিষ্যগণের নিকট দেহ ও আত্মার পার্থক্যবাচক শব্দ ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথের গান শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাসিতেন এবং একদিন মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"তোর গান শুন্‌লে (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের মত ফোঁস করে যেন ফণা ধ'রে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।" কখনও কখনও ঠাকুর বলিতেন যে যেমন নারিকেলের ভিতরের শাঁস শুষ্ক হইয়া যাইলে খোল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায় এবং খোল ও শাঁস একই আধারভুক্ত হইলেও এই 'খোড়ো' নারিকেলটাকে হাত দিয়া নাড়িলে ভিতরের শুষ্ক অংশটা ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়ে ও শব্দ করে, ঠিক্ সেই ভাবেই ভিতরের আত্মা ও বাহিরের শরীরের পৃথক্ সত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ অহঃরহঃ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য দেহ ও আত্মাকে এইরূপে পৃথক্ করিয়া রাখিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যে চিন্ময় হইয়া গিয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সেই চিন্ময় দেহ ও চিন্ময় আত্মার মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য ছিলনা। এইরূপে যে দেহের প্রতি অণু পরমাণু ভগবৎ চিন্তনের দ্বারা চৈতন্যময় হইয়া গিয়াছে তাহাকে তন্ত্রে 'ভাগবতী তনু' বলা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"যে শরীরে ভগবানের আনন্দ লাভ হয় আর সম্ভোগ

হয় সেইটা কারণ শরীর,—তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু।" এই স্থূল শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা চিন্ময় ভগবৎসত্তা কিরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শরীর, ভাগবতী তনু দ্বারা সেই চিন্ময়রূপ দর্শন হয়।" সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রেমের শরীরকেই ভাগবতী তনু বলে এবং সেইরূপ চিন্ময় দেহ-প্রাপ্ত হইলেই শ্রীভগবানের সাকার রূপ অথবা নিরাকার রূপ এই চক্ষুর দ্বারা সাক্ষাৎ দর্শনলাভ সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ ভাগবতী তনুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীভাগবতে আছে। শ্রীধ্রুব মহাশয় ভগবৎ চিন্তনের দ্বারা এমনই উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হইলেন যে সেই দেহ ত্যাগ না করিয়াই সশরীরে পরলোকগমন করিতে সমর্থ হইলেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম-গ্রন্থেও দেখা যায় যে যিশুখৃষ্ট তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দেহ লইয়াই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যে সাধারণ পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে বিভিন্ন, ইহা যে ভাগবতী তনু, তাহার প্রমাণ তাঁহার জীবনের অসংখ্য ঘটনা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন এই চিন্ময় দেহ ও চিন্ময় আত্মা সমাধি অবস্থায় একাকার হইয়া যাইত, জাগ্রত অবস্থায় দেহ ও আত্মার যে পার্থক্য একটী ক্ষীণ রেখায় বিরাজ করিত তাহাও যখন ভাবতরঙ্গে পুঁছিয়া যাইত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ শ্রীচরণ ভক্তগণের মস্তকে অথবা বক্ষে ন্যস্ত করিতেন। এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বক্ষেও এই অবস্থায় ঠাকুর নিজ পদ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে মানুষ ভক্ত অথবা আগন্তুক দর্শন করিলে, বয়স অথবা জ্ঞানের বিচার না করিয়াই জোড়হস্তে নমস্কার করিতেন সেই মানুষই নিজ পদদ্বয় অপরের বক্ষ এবং মস্তকে স্থাপন করিতেছেন,—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যবহার আর কি হইতে পারে! চিন্ময় দেহ না হইলে সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা একেবারেই

অসম্ভব। ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন—"কয়েকদিন পরে তারক (স্বামী শিবানন্দ) আবার এলো তখন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে,—এর ভিতর যিনি আছেন।"……"গোপাল সেন বলে একটী ছেলে আসতো,—অনেকদিন হল। এর ভিতর যিনি আছেন, গোপালের বুকে পা দিলে।" একদিনের কথা। কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের কঠিন পীড়া, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন। মহেন্দ্রলাল জ্ঞানমার্গের উপাসক ছিলেন, ভক্তি অথবা ভাবের কার্য্য তিনি বুঝিতে পারিতেন না, অনুমোদন করিতেন না। ঠাকুর যে অপরের বক্ষ অথবা মস্তকে নিজ পাদস্পর্শ করাইতেন ইহা মহেন্দ্রলালের ভাল লাগিত না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন—"ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) বুকে পা দিলুম; এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি,—সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি!" ঠাকুর আশা করিয়াছিলেন মহেন্দ্রলাল তাঁহার কথাগুলির অর্থ উপলব্ধি করিবেন, আর দোষারোপ করিবেন না। মহেন্দ্রলাল কিন্তু সে ইঙ্গিত গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন—"তারপর সাবধান হওয়া উচিত।" শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় ক'রে)—"আমি কি ক'রবো? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁস হয়ে যাই। কি করি, কিছুই জানতে পারিনা।" ডাক্তারের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। যাহাদের দেহ জড়-পদার্থমাত্র তাহাদের দেহাভিমান বর্ত্তমান থাকিবেই এবং সেই সমস্ত লোকের পক্ষে জড়-পদার্থের অতিরিক্ত চিৎশক্তির কার্য্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। এই ক্ষেত্রেও ঠিক্ তাহাই হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরূপ কার্য্যও তখনকার দিনে অধিকারী ব্যতীত অপর সকলের নিকট অন্যায় এবং দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইত। জগাই—উদ্ধারের সময় 'বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য গোসাঞি'। এমন কি যে অদ্বৈত গোস্বামীর বয়স মহাপ্রভু হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক

ছিল সেই লোকপূজ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মস্তকে শ্রীচৈতন্য পদদ্বয় রক্ষা করিয়াছিলেন।

সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়॥

এইরূপ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে চিন্ময় দেহ জাগতিক নিয়ম ও শিষ্টাচারকে পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনুর প্রমাণস্বরূপ আরও অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভারতবর্ষে গুরুজনের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শ করিবার অনেক বিধি নিষেধ আছে। সর্ব্ব অবস্থায় এবং সর্ব্বসময়ে সাধুকে প্রণতিজ্ঞাপন করা চলে কিন্তু সাধু অঙ্গ সর্ব্ব সময় স্পর্শ করার অধিকার বিষয়ীজীবের নাই। দুইটি দেহ বিপরীত ধর্ম্মী,—একটী চিন্ময় অপরটী জড়,—সুতরাং এই দুই শরীরের সংযোগ অনেক সময় প্রীতিকর অথবা কল্যাণকর হয় না। বিপরীত বিদ্যুৎবাহী দুইখণ্ড মেঘের সংযোগ যেমন আকাশে উৎপাতের সৃষ্টি করে, চিন্ময় ও পিণ্ডময় দেহের সংস্পর্শ সেইরূপ অনেকসময় শারীরিক যন্ত্রণা এবং মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। একদিনের এক বিচিত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতেছে। সেদিন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ৪ঠা জুন, সন্ধ্যা হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বসিয়া ভগবৎচিন্তন করিতেছেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও রাখাল মেজেতে বসিয়া আছেন। মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেকবৎসর বাবুদের বাড়িতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল-ছিল না, কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর, পতিত পাবন, তাহার সহিত অনেক পুরাণো কথা কহিতেছেন।.....ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরের পায়ে হাত

দিয়া প্রণাম করিল।...বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটী জালা ছিল—এখনও আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে, যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল, গঙ্গাজল লইয়া সেই স্থান ধুইতে লাগিলেন।...... দাসী জীবন্মৃতা হইয়া বসিয়া আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করুণামাখা স্বরে বলিতেছেন—'তোরা অমনি প্রণাম কর্‌বি।' এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন 'একটু গান শোন্'। তাহাকে গান শুনাইতেছেন।" জড়দেহের সংস্পর্শে চিন্ময়দেহের এত যন্ত্রণা!

আর একদিনের ঘটনা হইতেও এই চিন্ময়দেহ সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় দারুণ ক্ষত, রোগের তীব্র যন্ত্রণা, সাধারণ তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করাও অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন তাঁহার নিজের সূক্ষ্ম শরীর স্থূলশরীর হইতে বাহিরে আসিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন— "দেখ্‌লুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাব্‌ছি কেন এমন হোল? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে,—যা তা ক'রে এসে যত লোক ছোঁয়। আর তাদের দুর্দ্দশা দেখে মনে দয়া হয়, সেইগুলো নিতে হয়। সেই সব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হ'য়েছে। সেই জন্যই তো (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে। নইলে এ শরীরে কখন কিছু অন্যায় করেনি,—এতো ভোগ কেন?" স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন —"আর কখনও ঠাকুরের দেবশরীর স্পর্শ করিব না।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার ভাগবতী তনুর পরিচয় সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার দেহ চিন্ময় বলিয়াই জড়দেহের স্পর্শ তিনি

সহ্য করিতে পারিতেন না এবং এই স্পর্শ হইলেই জড়দেহের সূক্ষ্ম পাপবীজ সংক্রামিত হইয়া চিন্ময় দেহকে ব্যথিত করিত। সমধর্ম্মী মানুষের স্পর্শজনিত শারীরিক পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই পরিলক্ষণীয় নহে কিন্তু নিষ্পাপ দেহের সহিত বিপরীত মনোভাববিশিষ্ট পাপময় দেহের সংস্পর্শ হইলেই পাপবীজ সমুহ সহজেই নিষ্পাপ দেহকে অধিকার করিয়া নানাবিধ উপদ্রবের সৃষ্টি করে। শারীরবিজ্ঞান এই বিষয়ে একই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহাদের শরীরে কোন রোগবীজ নিহিত থাকে সেই রোগবীজদুষ্ট অপর লোকের সংস্পর্শ হইলেও তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তির কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু যাহার শরীর সর্ব্ববিধ রোগের বীজাণু হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাহার শরীরে যে কোন রোগবীজ সংস্পৃষ্ট হইলেই তাহা সহজে কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং নিরঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণদেহ যখনই বদ্ধ সংসারী জীবের স্পর্শদুষ্ট হইয়াছে তখনই সেই সূক্ষ্ম শারীরিক পাপবীজ ব্যাধিরূপে ঠাকুরের ভাগবতীতনুকে আশ্রয় করিয়াছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্মশরীরের অসংখ্য ক্ষত তাঁহার ভাগবতী তনুর অন্যতম নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময় দেহের পরিচয় আর এক রূপেও পাওয়া যাইয়া থাকে। ভাগবতী তনু যেমন বদ্ধজীবের কলুষস্পর্শে ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, পবিত্রমন ও অনুকূল সাধকের সংস্পর্শে সেই চিন্ময়দেহ তেমনই শক্তি বিকাশ করে। জড়দেহের সংস্পর্শে শুদ্ধদেহ যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে চিন্ময় দেহ সেইরূপ প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হইয়া উঠে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মহাপুরুষগণ কামনা বাসনা-বিহীন দেহেতে নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া অনেক সময় ভক্তগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্রুততর গতিতে সম্পাদন করিতে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সঞ্চারিত শক্তি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত আধার হওয়া প্রয়োজন,— যাহার মনের স্বাভাবিক গতি বিষয়ভোগের দিকে তাহার দেহে অথবা

মনে সঞ্চারিত শক্তির সম্যক্ স্ফুরণ হওয়া সহজ নহে। শ্রীভাগবতে এই স্পর্শসম্ভূত শক্তির কথা শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। তখন হিরণ্যকশিপু নিধন হইয়াছে, নৃসিংহদেব মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন করিতেছেন, দেবতারা ভীত হইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেছেন না। তখন ভক্ত প্রহ্লাদ নির্ভয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট গমন করিলেন এবং নৃসিংহদেব নিজ প্রসন্ন হস্ত দ্বারা প্রহ্লাদের মস্তক স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের ফলে "সঃ তৎকরস্পর্শধূতাখিলাশুভঃ" হইলেন অর্থাৎ প্রহ্লাদের মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গেল, তাঁহার ইহকাল পরকালের সমস্ত অশুভরাশি দূরীভূত হইল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে পদসেবা করিতে আদেশ করিতেন, তাহাদের বক্ষ স্পর্শ করিতেন, নিজক্রোড়ে কাহাকেও বসাইতেন, কাহারও বা ক্রোড়ে নিজে বসিতেন, অপ্রয়োজনে প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া, সেবাগ্রহণ করিয়া, ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেন। এই ভাগবতীদেহ-স্পর্শের ফলে নানাবিধ উপকার ভক্তের সাধনজীবনে সম্পাদিত হইত। গাঢ় দেহবুদ্ধি তরল হইয়া আসিত, উদ্দাম মন শাসনাধীনে আসিত, ভক্তের চিত্তশুদ্ধি হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"এর (পদসেবার) অনেক মানে।" ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ই মার্চ্চ কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত অসুস্থ। ঠাকুর নরেন্দ্র ও রাখালকে পদসেবা করিতে বলিয়াছেন; দুইজনে পদসেবা করিতেছেন। মহেন্দ্রগুপ্ত কাছেই বসিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকেও পদসেবা করিতে বলিলেন। এই সামান্য ঘটনাটী অনুধাবন করিলেই আমরা ঠাকুরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব। কণ্ঠের দারুণ যন্ত্রণার সময় পদসেবা নিশ্চয়ই ভাল লাগিতেছিল না, ভাললাগিতে পারে না, তথাপি একজনকে নয় দুইজনকে সেবা করিতে বলিয়াছিলেন।—একজন ভবিষ্যতে দেশ বিজয়ের সেনাপতি, অপর জন ভবিষ্যতে বেলুড়সন্ন্যাসাশ্রমের প্রথম প্রেসিডেন্ট। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্রগুপ্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িল,—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকেও বঞ্চিত

করিলেন না। দুইজনের পদসেবার উপর তৃতীয়জনকর্ত্তৃক পদসেবা কেবলমাত্র নিষ্প্রয়োজন নহে, বস্তুতঃ অসুবিধাজনক এবং পীড়াদায়ক। তথাপি তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঠাকুর পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন। নিজ দেহলীলা অবসান হইবার সময় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, সেই পবিত্র ভাগবতী তনুর স্পর্শে প্রিয় ভক্তগণকে কৃতার্থ ও সফলকাম করিবার জন্যই আহারবিহীন, নিদ্রাবিহীন, আরামবিহীন শ্রীরামকৃষ্ণের এই করুণ প্রয়াস। এই ঘটনাটী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনুর বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতেছে।

কিন্তু ভাগবতী তনু হইলেও দেহধারণ করিলে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, অনেক নৈসর্গিকী বিধির অধীন হইয়া জীবনরক্ষা করিতে হয়। বিশেষ করিয়া ভজনানন্দী লোকের পক্ষে এই সংসার প্রতিকূল,—সংসারে হিংসা, দ্বেষ, ভগবৎ বিমুখতা সাধুপ্রকৃতি লোকগণকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করিয়া থাকে। অধিকাংশ লোকই মায়াদাস, এবং তাহারা নিরন্তর যে সমস্ত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া থাকে তাহা সাধুগণের নিকট অর্থহীন ও ক্লেশদায়ক। যেরূপ মানুষের সঙ্গ সাধুরা ইচ্ছা করেন সেরূপ মানুষ তাঁহারা ক্বচিৎ দেখিতে পান। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন জীবনের পর বিষয়ীসংস্পর্শ সহ্য করিতে না পারিয়া কাতরকণ্ঠে কুঠীর ছাত হইতে শুদ্ধ ভক্তগণকে আহ্বান করিতেন। সাধারণতঃ সাধুগণ অভীষ্টবস্তু লাভ হইলেই দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিরবাঞ্ছিত পদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সাধুদের জীবন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অভীষ্ট সাধিত হইলেও তিনটী কারণে সাধুগণ দেহধারণের বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, যে সাধু ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতেছেন, সমাজের কোলাহল হইতে দূরে যাঁহার ভজনক্রিয়া চলিতেছে, দেহধারণের অসুবিধা সুস্পষ্ট হইয়া যাঁহাকে পীড়া দিতেছেনা, সে সাধুর মনে দেহত্যাগের কোন চিন্তাই হয়ত উদিত হয়না, দেহবিস্মৃত মন লইয়া তিনি ভজনসাধনে দিনযাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সাধুর

জীবনধারণের কোন নিশ্চয়তা নাই, হয়ত হঠাৎ দেহ বিকল হইয়া পড়িল অথবা বার্দ্ধক্য ও জরা দেহকে অধিকার করিল, তখন সাধু দেহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন সাধু হয়ত সংসারী জীবকে নিজ সাধনভজনপ্রসূত সত্য বিশেষরূপে প্রদান করিবার জন্য কৃতসকল্প হইয়াছেন, এমনক্ষেত্রে যতদিন সেই দান ও গ্রহণক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিসমাপ্ত না হয় ততদিন সাধু দেহধারণের অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, হয়ত দেহধারণের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, অথবা যাহা পৃথিবীকে দান করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহাও দেওয়া হইয়াছে তথাপি ভক্তগণ শুদ্ধাভক্তির আকর্ষণে সাধুকে টানিয়া রাখিয়াছেন, সাধু ভক্তাধীন, অস্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলেও তাহা সংঘটিত হইবার বাধা উপস্থিত হইতেছে। যে কারণে শ্রীভগবানকে সময় সময় দেহধারণ করিতে হয়; যে আকর্ষণে শ্রীভগবান ইহসংসারে মানুষলীলা করিয়া থাকেন, সাধুগণকেও অনেক সময় ঠিক অনুরূপ কারণেই দেহধারণের অসুবিধা অনিচ্ছায় ভোগ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ,
সাধুভিঃ গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈঃ ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

(আমি ভক্তের অধীন, আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই, সাধুরা ভক্তিতে আমাকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, ভক্তরা আমার অতি প্রিয়।)

সাধুগণ জীবন্মুক্ত হইয়াও এই ত্রিবিধ কারণে সাধারণ জীবের ন্যায় দেহধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভের পর দেহধারণের অধীন হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যে বাস করিতেছিলেন তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে ইহ সংসারে তাঁহার অনুভূত সত্য প্রদান করিবার সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে বিষয়ীসমাগম হইত, শ্রীরামকৃষ্ণ ভীত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেন, বিষয়ীর দেহদুষ্ট বাতাস পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে অসহনীয় ছিল। সুতরাং অধিকদিন জীবনধারণকরা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না, অবস্থাও অনুকূল ছিল না। কিন্তু যে মহৎ সত্য দান করিতে তিনি দেহধারণ করিয়াছিলেন তাহা তখনও দেওয়া হয় নাই। শ্রীভবতারিণী ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন,—ভক্তগণ আসিবে, তাঁহার বাণী গ্রহণ করিবার আধার প্রস্তুত রহিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরে জীবনধারণ শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে দুর্ব্বহ হইবে না। ক্রমশঃ ভক্তসমাগম হইতে লাগিল, তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণবাণী গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ধীরে ধীরে, অতিধীরে এই সত্য সঞ্চারিত হইয়া শুদ্ধ আধার সমুহে প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনধারণের একটা হেতু উপস্থিত হইল। আর এক দৃঢ়তর বন্ধনে শ্রীরামকৃষ্ণের ইহজীবন পরিবেষ্টিত হইল,—ভক্তগণ তাঁহাকে ভালবাসিয়া আত্মনিবেদন করিলেন, তাঁহার শ্রীচরণে নিজ নিজ মস্তক বিক্রয় করিলেন। একদিকে সত্যপ্রদান সঙ্কল্পের বন্ধন, অন্যদিকে ভক্তের প্রীতিভক্তির বন্ধন,—এই উভয়বিধ বন্ধন বিষয়বিরক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে সংসারে ধরিয়া রাখিল।

কিন্তু ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভজনসাধনের পরিপাকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্মুক্ত পুরুষ হইলেন, দেহ যখন চিন্ময় হইল, তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি হইল দেহমুক্তির দিকে,—এই পাঞ্চভৌতিক দেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আনন্দময় ধামে প্রবেশ করিবার সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই কথা ঠাকুর অনেকবার ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন—"আমাদের নিকট ঠাকুর কতদিন স্বয়ং বলিয়াছেন—'এখানকার মনের স্বাভাবিক গতিই উর্ধ্বদিকে। সমাধি হলে আর নাম্‌তে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। ...আবার নাম্‌তে নাম্‌তে হয়ত সেই দিকে (উর্ধ্বে) চোঁচা দৌড়ুল।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলির ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। ভক্তগণকে

শিক্ষাদিবার জন্যও তাঁহাকে অনেক কার্য্য স্বহস্তে করিতে হইত। "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"—এই যে অবস্থার কথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন সেই অবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণের হইয়াছিল তথাপি তিনি কর্ম্মাধীন জীবের ন্যায় কর্ম্ম করিতেন। তাহাও ভক্তগণের শিক্ষার জন্য, ভক্তগণের প্রতি প্রীতির জন্য। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্ব্বদা সতর্ক ও জাগ্রত থাকিতে হইত, পাছে তাঁহার শিথিলতার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া শিষ্যগণ তাঁহার অনুকরণ করিতে যাইয়া সাধনভজনের ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনধারণের গোপন রহস্য; ইহাই ছিল তাঁহার ছোটখাট অনুষ্ঠানগুলির প্রতি মনোযোগের একমাত্র কারণ।

কিন্তু কালক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অবস্থায় উপনীত হইলেন তখন শিষ্যগণ সাবালক হইয়াছেন, শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বিভিন্ন বিভিন্ন আধারে বিভিন্নরূপে কার্য্য করিবার উপক্রম করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জ্ঞান ও ভক্তির নবরূপের প্রবর্ত্তক। তিনি একবার শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে বলিয়াছিলেন—"বাসনা না থাক্‌লে শরীর ধারণ হয় না। আমার একটা আধটা সাধ ছিল। বলেছিলাম, মা কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগীর সঙ্গ দাও, আর বলেছিলাম তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করবো।" নিষ্কাম কর্ম্মীর সঙ্গ করিবেন এ সাধের কথা তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। কামিনীকাঞ্চনত্যাগীর সঙ্গলাভ ঠাকুরের হইয়াছিল, জ্ঞানীর ও ভক্তের সঙ্গও হয়ত তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের অপরাহ্নকালে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে তাঁহার সহস্রদলপদ্ম, তাঁহার অতিপ্রিয় ভক্ত নরেন্দ্রনাথের মনের স্বাভাবিক গতি কর্ম্মের দিকে! তাঁহারই স্নেহ ও শক্তিরসে পরিপুষ্ট এই বীজ ভবিষ্যতে যে মহীরুহরূপে কর্ম্মফলভারে সজ্জিত হইয়া সংসারী জীবের তাপদগ্ধ হৃদয়ে ছায়া বিস্তার করিবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি যে মাটি, আলো, রস ও বাতাস এই বৃক্ষবীজকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার

মূলতত্ত্ব ভক্তি ও জ্ঞান, কিন্তু বীজ নিজ স্বধর্ম্ম অনুসারে নিষ্কাম কর্ম্মের মহীরুহরূপে উচ্চশির লইয়া পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিবার উপক্রম করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনের গতি ভক্তি ও জ্ঞানের দিকে থাকিলেও মহাবীর্য্যশালী নরেন্দ্রনাথের প্রভাবে সকলেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, ঠিক্ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথ জগতে বাণীর দ্বারা প্রচারিত হইলেও, প্রাণের দ্বারা প্রচারিত হইবে না। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"মহেন্দ্র সরকারকে ঠাকুর বললেন—'এইবার তোমার ভাবের কথা বলি।' এই বলে জ্ঞানের কথা শোনালেন। তখন মহেন্দ্রনাথ সরকার ব'ল্‌লেন—'হাঁ, ঠিক্ ঠিক্।' ......পরক্ষণে মহেন্দ্র সরকার ভক্তদের দেখাইয়া বলিলেন—'এদের সেই কথাগুলি বল।' ঠাকুর বললেন,—'এরা কি নিতে পারবে?" কথাগুলি বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা ছিল—'নিতে পার্ব্বে?'—'বুঝতে পার্ব্বে?'—এ ভাষা তিনি ব্যবহার করেন নাই। কারণ তাঁহার বাণী "বুঝিবার" শক্তি শিক্ষিত শিষ্যগণের অনেকেরই ছিল, কিন্তু "নেবার" অর্থাৎ জীবনে ব্রতরূপে গ্রহণ করিবার শক্তি হয়ত কাহারও ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বকীয় আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে ইহা দৃঢ়ভাবেই জানিতেন যে উত্তরকালে শিষ্যগণ জ্ঞান অথবা ভক্তির পথ গ্রহণ করিবেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে এমন সময় আসিল যখন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণের আর কোন প্রয়োজন রহিল না, এবং তখন ঠাকুরের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল, গলদেশে দারুণ ক্যান্‌সার ক্ষতের সৃষ্টি হইল।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেহের ভিতর মৃত্যু যখন নিজ স্থূল মুর্ত্তিতে দেখা দিয়া ক্ষণে ক্ষণে দেহত্যাগের কথা গুরু ও শিষ্যগণকে স্মরণ করাইতে লাগিল তখন সেই চিন্ময় দেহ ও চিন্ময় আত্মার মধ্যে এক অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। সেদিন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই মার্চ্চ, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, চাঁদের

আলোয় কাশীপুরের বাগান সমুদ্ভাসিত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেখানে উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন—"ঠাকুরের কঠিন পীড়া—চন্দ্রের বিমল কিরণ দর্শনে ভক্তহৃদয়ে আনন্দ নাই।…চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল বসন্তানিলস্পর্শে বৃক্ষপত্রের শব্দ হইতেছে।…মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরো কাছে আসিতে বলিতেছেন।…মাষ্টারকে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলিতেছেন—'তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি,—সব্বাই যদি বল যে—এত কষ্ট—তবে দেহ যাক্—তাঁহলে দেহ যায়।" কথাগুলির অর্থ সহজেই অনুমেয়। আত্মা চায় মুক্তি, জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত দেহের বন্ধন হইতে মুক্তি, কিন্তু ভক্তের প্রীতি তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে; একদিকে মুক্তির কঠিন প্রয়াস, অন্যদিকে ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ,—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির লীলাভূমি শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ত-মাংস ও চিৎকণ-গঠিত বিশাল বক্ষঃস্থল।

পরদিন ১৫ই মার্চ্চ, সকাল ৭।৮টা। শ্রীরামকৃষ্ণ কথঞ্চিৎ সুস্থ কিন্তু শিষ্যগণ পূর্ব্ব রাত্রির স্মৃতিতে ম্রিয়মাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "এখন আমার কোন কষ্ট নাই।" ঠাকুর এক একবার ভক্তদের দেখিতেছেন ও কাহারও কাহারও মুখে শ্রীহস্ত বুলাইয়া আদর করিতেছেন। যিনি পূর্ব্বরাত্রে রোগের যন্ত্রণায় বলিয়াছিলেন—"তোমরা সব্বাই যদি বল যে এত কষ্ট, তবে দেহ যাক্, তাহলে দেহ যায়", তিনিই আজ প্রভাতে বলিতেছেন "এখন আমার কোন কষ্ট নাই", এবং ভক্তগণের চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিতেছেন। একই মানুষের দুইটী বিভিন্ন চিত্র; এক চিত্র আত্মার মুমুক্ষু অবস্থা, অন্য চিত্র প্রীতির বন্ধন। এই দ্বন্দ্ব কিছুদিন যাবৎ চলিয়াছিল, যতই শরীর ক্ষয় হইতেছিল, ভক্তেরা ততই সহস্রহস্তে গুরুদেবকে আঁকড়িয়া ধরিতে ছিলেন।

এদিকে দিন সমাগত, ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন ভক্তের সঙ্গলিপ্সা পরিহার করিয়া, সর্ব্ব আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেহলীলা সংবরণ

করিবেন। ভক্তগণ আকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সকলে বুঝিলেন কেবলমাত্র তাঁহাদের স্নেহ ও প্রার্থনা ঠাকুরকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, ঠাকুর নিজে যদি ইচ্ছা করেন, দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তাঁহার দেহ আরও কিছুদিন ইহলোকে থাকিয়া ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতে পারে। একদিন রাখাল বলিলেন—"আপনি বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে," ঠাকুর উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা", আবার কিছুক্ষণ পরে রাখাল বলিলেন "আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান", ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিলেন মাত্র। অপর একদিন পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন—"মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি, আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক্ মনে ক'রে মন একাগ্র ক'রে, একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখিলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?" রাখালের ছিল স্নেহের আবদার; সুতরাং উত্তর না দিলেও চলিয়াছিল কিন্তু শশধর একজন মস্ত বড় পণ্ডিত, ইঁহার কথার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত হ'য়ে একথা কি ক'রে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?" পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন। এইবার ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া বসিলেন—"আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে,—আমাদের জন্য সারাতে হবে।" এই জেদী প্রাণপ্রিয় শিষ্যের কথা সহজে উপেক্ষা করা চলে না, সংক্ষেপে মন-ভুলানো উত্তর ইঁহাকে নিরুত্তর করিতে পারিবে না, শাস্ত্রের অথবা তর্কযুক্তির কথা ইনি শুনিবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জানিতেন সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া উত্তর দিলেন—"আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি রোগে ভুগি, আমি তো মনে করি সারুক্, কিন্তু সারে কৈ? সারা না-সারা মার হাত।" নরেন্দ্রনাথ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

নিরুৎসাহ হইলেন না, পুনরায় বলিলেন, "তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।" এইবার ঠাকুরকে আসল কথা বলিতে হইল—"তোরা তো বলছিস, কিন্তু ওকথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে।" ইহাই হইল প্রকৃত কথা,—নিজের ব্যাধি আরোগ্যের জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা করা শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে লজ্জাকর, চিরদিন তিনি দেবীর নিকট শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলা সমগ্র সাধন ভজনের প্রতিকূল একটী প্রার্থনা,—রোগ আরোগ্য করিবার প্রার্থনা,—তিনি কিরূপে মুখ দিয়া বাহির করিবেন, কিরূপে অন্তরে চিন্তারূপেই বা স্থান দিবেন! কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আজ ওসব কিছুই শুনিবার জন্য প্রস্তুত নহেন, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"তা হবেনা মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।" "আমাদের জন্য বলতে হবে"—এই স্নেহের অত্যাচার অগত্যা শ্রীরামকৃষ্ণকে মানিয়া লইতে হইল, তিনি উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা দেখি, পারি তো বল্‌বো।" স্বামী বিবেকানন্দের যে ইচ্ছাশক্তি উত্তরকালে সমগ্র জগৎকে বিস্মিত ও জাগ্রত করিয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তি আজ প্রবলরূপ ধারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণেরও বিশ্রাম নাই, স্বামীজিরও বিশ্রাম নাই, একটা মীমাংসা চাই এবং শীঘ্রই তাহা করিয়া ফেলিতে হইবে। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন,—"কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুত স্বামীজি পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মশায় বলেছিলেন? মা কি বল্লেন?"

ঠাকুর—মাকে বললুম, (গলার ক্ষত দেখাইয়া),—'এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি ক'রে দে।' তা মা বল্লেন —তোদের সকলকে দেখিয়ে—'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্।' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।

শেষের দুইটি পংক্তিতে শ্রীভবতারিণীর প্রচ্ছন্ন তিরস্কারসূচক উত্তর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের লজ্জাশীল নিরুত্তর অবস্থা ভাবিয়া দেখিবার এবং বুঝিবার

একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে দেবীর ভাষা তিরস্কার এবং অসহিষ্ণুতাব্যঞ্জক। "কেন?"—বড় কঠোর প্রশ্ন, ভাষার মধ্যে যেন ধৈর্য্য ও কোমলতার অভাব। ঠাকুর দেবীর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন যেন দুইটী খেতে পারেন এরূপ অবস্থা দেবী করিয়া দেন। প্রার্থনা অন্তর হইতে সমুৎসারিত হয় নাই, অনুরোধে উপরোধে পরের কথা জানাইতে গিয়া ভাষার স্বচ্ছন্দতা এবং সরলতা নষ্ট হইয়াছিল। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে ভক্তগণ তাঁহাকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, স্নেহের দাবী দেবীকে জানাইতে বলিয়াছেন, তাহা হইলে কথাগুলি সহজ হইত এবং দেবী কি উত্তর দিতেন তাহা আমরা না জানিলেও, অনুরোধটী একেবারে কাটিয়া ফেলা ভবতারিণীর পক্ষে সহজ হইত না, অন্ততঃ রূঢ় 'কেন' শব্দ কখনই ব্যবহার করিতে পারিতেন না। অথবা যদি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে আরও কিছুদিন ভক্তসঙ্গ করিবার তাঁহার সাধ আছে, জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইলেও 'ভক্তের রাজা' হইয়া বিরাজ করিবার সাধ তাঁহার তখনও সম্পূর্ণ মিটে নাই, তাহা হইলে শুদ্ধা-ভক্তির এই সহজ দাবী শ্রীভবতারিণীর পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন হইত, অন্ততঃ দেবীকে ভাবিয়া দেখিতে হইত, হঠাৎ 'কেন' বলিলেই ব্যাপারটী মিটিয়া যাইত না। নরেন্দ্রনাথের স্নেহের দাবী যেরূপ শ্রীরামকৃষ্ণকে সকল স্বাতন্ত্র্য পরিহার করাইয়া দেবীর নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিল ঠাকুরের ঠিক্ অনুরূপ স্নেহের দাবী ইচ্ছাময়ীর স্বাধীন ইচ্ছাকেও হয়ত প্রতিহত করিত, সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিত। বহুবর্ষ পূর্ব্বে আর একবার ঠিক্ অনুরূপ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য প্রার্থনা দেবীর নিকট জানাইয়াছিলেন এবং দেবীকে সে প্রার্থনা পূরণ করিতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছিলেন—"অনেকদিন হলো যখন পেটের ব্যথাতে ভুগ্‌ছি, হৃদে বল্‌লে মাকে একবার বলনা,—যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বল্‌তে লজ্জা হল। মা, সুসাইটীতে মানুষের হাড়

দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি, মা! এ রকম ক'রে শরীরটা একটু করে দাও, তাহলে তোমার নাম গুণকীর্ত্তন করবো।" সেবার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল কারণ নামগুণকীর্ত্তন করিবার জন্য শরীরের আরোগ্য চাহিয়াছিলেন,—"যাতে দুটী ভাত খেতে পারি",—ইহার জন্য শরীরের সুস্থতা প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু, এবার শ্রীরামকৃষ্ণের চিরদিনের অভ্যস্ত যে প্রার্থনা,—'শুদ্ধাভক্তি দাও',—তাহার বিপরীতগামী প্রার্থনা —'গলার ক্ষত আরোগ্য কর',—সমস্ত ভাব ও ভাষাকে ওলট্‌পালট করিয়া দিল, কথাগুলি যেন বিসদৃশ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং দেবী যখন তিরস্কার করিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে স্নেহের সম্মুখে পরাজিত হইয়া তিনি যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা তাঁহার চিরজীবনের সাধন-ভজনের বিরুদ্ধভাব, তাঁহার চিরজীবনের লোক শিক্ষার বিরুদ্ধ আচরণ, তাঁহার চিরজীবনের ব্যবহার করা ভাষার বিপরীত ভাষা। সুতরাং লজ্জা হইবারই কথা। দেবীর সম্মুখে চিরআনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের এই লজ্জাবৃত অবনত মুখের চিত্র বড়ই সুন্দর!

"এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্!"—দেবীর এই কথাগুলির নিগূঢ় অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এত নিবিড় লজ্জা। দেবী ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে ঠাকুরের দেহ-ধারণের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, আবার গলার ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য প্রার্থনা কেন? এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথিত স্বয়ং নারায়ণের দেহাসক্তির মত একটা হাস্যকর ব্যাপার। নারায়ণ বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যনিধন করিয়াছেন কিন্তু দেহত্যাগ করিয়া স্বধামে যাইতে প্রস্তুত নহেন, ছানাপোনা লইয়া বেশ আনন্দে আছেন। এখন মহাদেবের ত্রিশূলের প্রয়োজন, নারায়ণের বরাহ-দেহ বিনষ্ট না হইলে তিনি নিজধামে যাইতে চাহিবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটী যেন সেইরূপই দাঁড়াইল। দেবী তাই

ইঙ্গিত করিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি ভক্তগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া-গিয়াছে, নিজ দেহের প্রতি চিৎকণা ভক্তদেহে কার্য্য করিতেছে, শিষ্যগণের শ্রীরামকৃষ্ণময় জীবন, শ্রীরামকৃষ্ণময় দেহ সুতরাং আর স্বকীয় বিভিন্নমুখে খাইবার কোন প্রয়োজন নাই, শিষ্যগণ অন্নগ্রহণ করিলেই শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণ পরিপুষ্ট হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণমন্ত্র সফল হইবে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেহ শিষ্য-দেহ হইতে বিভিন্ন ছিল, এখন আর তাহা নহে,—ত্যাগের মন্ত্র ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন, জ্ঞান ও ভক্তির সাধন হউক বা নাই হউক, যে নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে ভক্তগণ চলিয়াছেন তাহাও ত্যাগ ও বিবেকবৈরাগ্য সাপেক্ষ, তাহাও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রসাধনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং "এই যে এত মুখে খাচ্ছিন্"—কথাগুলি শ্রীভবতারিণী বলিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ লজ্জিত হইলেন, আর তাঁহার কিছু বলিবার রহিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও তাহা জানিতেন। বহুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্ম্মিণী বলিয়াছেন—"মা দুঃখ করতেন,—'এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে সারদার বে দিলুম, ঘরসংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হলনা, মা বলাও শুনলে না।' একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বল্ছেন—'সে জন্য আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখ্বেন মা-ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠ্বে।" শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা-সমুদ্ভূত শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ শিষ্যগণ আজ তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছেন—একমাত্র সাধুদের ক্ষেত্রেই 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' কথাগুলি খাঁটি সত্য হইয়া দেখা দেয়। যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কেবলমাত্র জড়দেহতেই নিবদ্ধ তাহাদের পৃথক্ সত্তা আছে, তাহাদের পৃথক্ ভাবে বাঁচিবার হয়ত একটা অর্থ আছে। কিন্তু যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আত্মার ক্ষেত্রেই প্রকাশিত সেই পিতার আত্মচ্ছবি পুত্র সাবালক হইবামাত্র পিতাপুত্রের আর পৃথক্ভাবে দেহধারণ করিবার প্রয়োজন হয় না। শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী সিদ্ধিলাভ

করিলে তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছিলেন—"তুম্‌ ভি অব্‌ সের হো গিয়া; বাকি, দো সের এক ঠোর মে নহি রহনে শক্‌তা হ্যায়", অর্থাৎ তুমিও এখন সিংহ হইয়াছ, কিন্তু দুইটী সিংহ এক জায়গায় থাকিতে পারে না। শিষ্য সিংহ হইয়া যাইলে গুরু ও শিষ্যের একত্র বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না। আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন—"আমি পরে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষ মুখে খাব।" যাহা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছিলেন শ্রীভবতারিণী সেই কথাই ঠাকুরকে ফিরাইয়া দিয়া লজ্জিত করিয়াছিলেন। চিন্ময় দেহের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, আবার গলের ক্ষতের দিকে পিছু ফিরিয়া তাকাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ অনন্তধামে চলিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইল।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুকপ্রিয়তা

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত অপূর্ব্ব এবং এই কথা-সাহিত্যের মধ্যে একটী সুস্পষ্ট হাস্যরসরেখা ইহাকে সাধারণ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ও দুরূহ ধর্ম্মচিন্তাগুলিকে সহজ ও সরল করিয়া ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত করিতেন,—ইহাই যেমন তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের অনন্য সাধারণ বিশিষ্টতা ছিল,—তেমনই অন্যদিকে সেই গভীর ও চিরন্তন সত্যগুলিকে তিনি কৌতুক সমাবেশে চিত্তাকর্ষক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী করিয়া তুলিতেন। তাই তাঁহার ধর্ম্মকথার যেমন অপরূপ গৌরব, তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তাও সেইরূপ রসপরিবেশে সমুজ্জ্বল। এই বিষয়ে মানবপুত্র যিশুখৃষ্টের সহিত তাঁহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যিশুখৃষ্টও গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাহাকে হাস্যরসে মধুর করিবার চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই। যিশুখৃষ্ট যুবক হইয়াও ধর্ম্মবৃদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মবৃদ্ধ হইয়াও চিরযুবক। কখনও ঠাকুর সিংহের মত নিঃসঙ্গ, মেঘের মত গম্ভীর, আবার পরক্ষণেই হয়ত অজস্র তাঁহার পরিহাস,—শরতের অকারণ হাস্য-হিল্লোলে চঞ্চল, বিকশিত কাশবনের মত। জগতের সমস্ত ধর্ম্মগুরুগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই বলিতে পারেন

"আমি সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহের
রহস্য—সখা।"

মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জ্ঞান ছিল,—সকল মহাপুরুষের মধ্যে এই দৃষ্টিশক্তি পরিলক্ষিত হয় না। যে সকল সাধু ও মহাত্মাগণ আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই দিবারাত্র সাধনা করিতেছেন

তাঁহারা হিমালয়ের নির্জ্জন কন্দরেই বাস করুন অথবা লোকালয়ের মধ্যে নির্লিপ্ত জীবনই যাপন করুন,—মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন হয় না, মনুষ্যচরিত্র বুঝিবার জন্য তাঁহাদের কোন আগ্রহও দেখা যায় না। কিন্তু যে সাধুগণ দীনবৎসল, মনুষ্যসমাজে ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করাই যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিবার যে অপূর্ব্ব শক্তি ছিল তাহা নানা ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি জানিতেন যে সাধারণ মানুষের নিকট ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি শুধু যে দুর্ব্বোধ্য তাহাই নহে, প্রায়শঃই নীরস। তিনি দেখিতেন দক্ষিণেশ্বরে আগত উৎসাহী ভক্তগণের মধ্যেও অধিকক্ষণ ধর্ম্মকথা শুনিবার ধৈর্য্যের অভাব হইত, একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার শারীরিক অথবা মানসিক শক্তি অনেকেরই ছিল না; আবার একই বস্তুতে বহুক্ষণ মনঃসংযোগ করিবার মত মনের অবস্থাও খুব কম লোকের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইত। অথচ তাসখেলায় ইহারাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে, সাংসারিক "ফাল্‌তো" গল্প করিবার ও শুনিবার উৎসাহ ইহাদের অপরিসীম। তাই অভিজ্ঞ শিক্ষক যেমন খেলার ভিতর দিয়াই অমনোযোগী বালকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া শিক্ষাগ্রহণ করিতে প্রণোদিত করেন, মানবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক্ সেইরূপ কৌতুকরসের ভিতর দিয়া দুরূহ ধর্ম্মবিষয়গুলিকে গৃহী ও অপক্ক ভক্তের মনের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের হাসিকে বাদ দিয়া তাঁহার ধর্ম্মকথা বিচার করিতে যাইলে ধর্ম্মের অনেকখানিই আমরা হারাইয়া ফেলিব। মহাত্মা রামদত্ত লিখিয়াছেন—"পরমহংসদেব নিজে রসিক চূড়ামণি ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার এক একটী উপদেশ রসে ঢল ঢল করিতে থাকে।"

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের অতি তুচ্ছতম কথা ও ঘটনাও সেই একই সত্যপ্রচারের বিভিন্ন উপায়মাত্র

ছিল বলিয়া আমাদের মনে রাখিতে হইবে। গৃহীর কার্য্যকলাপ বহুমুখী, সাধুর জীবনব্রত একমুখী; গৃহী বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রাখে; তাহার জীবনের অখণ্ডতা বলিয়া কোন জিনিষ নাই, তাই গৃহীর প্রতিদিন এক একটী বিভিন্ন জীবন। কিন্তু সাধুর জীবন এক ও অখণ্ড, মন একাগ্র, উদ্দেশ্য সত্যানুভূতি, ইচ্ছা সত্যপ্রচার। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যরসপ্রিয়তা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সহিত একাঙ্গীভূত। যে হাসি তিনি হাসিতেন তাহা সচ্চিদানন্দ সাগরের কোন একটী লহরীমাত্র,—এই লহরীর উদ্দেশ্য সচ্চিদানন্দ সাগরের তটভূমিকে লক্ষ্য করা, স্পর্শ করা, অনুভব করা। তাই ঠাকুরের রসালাপের দূর অথবা নিকট উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মোপদেশ। সাধু নাগমহাশয় বলিতেন, "ঠাকুর পরিহাসচ্ছলেও যদি কোন কথা কহিতেন, তাহারও এক গূঢ় রহস্য থাকিত।" এই গূঢ়রহস্যের আনুষঙ্গিকরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন বর্ণ ও রসের স্ফুরণ হইত। কখনও বা এই কৌতুকরস নিছক স্ফূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইত, তখন ইহা বিশেষ করিয়া অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের প্রতি প্রীতির উৎসমুখে অনাবিল বারিধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া বাহির হইত। সেই সময় এই কৌতুক যেন উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিত, অকারণ হাস্য পরিহাসে দক্ষিণেশ্বরের ঘর মুখরিত হইয়া উঠিত, কিন্তু বসন্তের আনন্দের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেও সেই হাস্য পরিহাস অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী ব্যতীত অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বাহির হইত না। এই জাতীয় নির্ম্মল, আপাতঃদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিহীন মধুর হাসিরাশিকে শ্রীরামকৃষ্ণ "আঁসধোয়া জল" বলিয়া অভিহিত করিতেন, —"আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁসধোয়া জল একটু একটু দিই। তা না হ'লে আসবে কেন।"

কখনও কখনও এই কৌতুকপ্রিয়তার অন্য উদ্দেশ্যও থাকিত। হয়ত শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সাধনজীবনের নিগূঢ় অনুভূতিগুলিকে প্রকাশিত

করিতেছেন, ধর্ম্মের কোন বিশেষ গভীর সত্যকে বিভিন্ন ভাষা ও ভাবসংযোগে বারংবার প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, ভক্তগণ মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া সেই অপূর্ব্বকাহিনী শ্রবণ করিতেছে। অনেকক্ষণ হইয়া গেল, মন যেন আর গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, শরীর একই স্থানে বসিয়া থাকিতে ক্লেশ অনুভব করিতেছে; ঠিক্ এইরূপ অবস্থা আসিবার পূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন হাসির কথার অবতারণা করিতেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও এই নিয়ম বড় বড় সাহিত্যরথীগণকে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া মহাকবি সেক্ষপীয়র কোন গুরুত্বপূর্ণ-দৃশ্যের অব্যবহিত পরে অথবা পূর্ব্বে প্রায়ই কোন একটি হাল্‌কা এবং কৌতুককর পটভূমির অবতারণা করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যিকগণের এই প্রথা মনুষ্যচরিত্রজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মন একটা কঠিন ও দুরূহ বিষয় কিয়ৎক্ষণ অনুধাবন করিলে তাহার পরেই একটা হাল্‌কা অথবা কৌতুককর বিষয়ের অন্বেষণ করে,—একটানা ভারী জিনিষ ধারণা করিতে মানুষের মন অক্ষম। তাই শ্রীরামকৃষ্ণও গম্ভীর ধর্ম্মালোচনার পর শ্রোতৃবর্গের মনকে অবসর দিতেন, হাল্‌কা হাসির অবতারণা করিয়া মনকে বিশ্রাম দিয়া পুনরায় গভীর শাস্ত্রকথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেন। এই হাসির আরও একটী উদ্দেশ্য থাকিত। যে সমস্ত গৃহী অথবা সাধারণ ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সম্যক্ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিত না, যাহাদের পঙ্গু মন ধর্ম্মের উচ্চশিখরে উঠিতে স্বভাবতঃই অক্ষম, সেই সমস্ত শ্রোতাগণও এই ধর্ম্মমিশ্রিত রসালাপের দ্বারা অপরোক্ষ-ভাবে উপকৃত হইত। সাধারণ গৃহীগণ সংসারের নানাবিধ দুঃখতাপে জর্জ্জরিত, সংসারের ভিতরে জুড়াইবার স্থান নাই, তাই তাহারা কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া এক একবার দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া আসিত। এইরূপ কর্ম্ম-বহুল মানবজীবনে বিশুদ্ধ হাস্যরস অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—জনৈক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, "Laughter is life's preservative" (হাসি মানুষকে

বাঁচাইয়া রাখে)। সংসারের ভিতর বহুক্ষণ বা বহুদিন একটানা থাকিলে অতিতুচ্ছ দুঃখও বিরাট্ হইয়া মানুষের নিকট দেখা দেয়, যাহা সহজে হয়ত ভুলিয়া যাইতে পারিতাম তাহাও মনকে আঁকড়াইয়া ধরে। এমন অবস্থায় হাসির দমকা বাতাসে মনের ধোঁয়া কাটিয়া যায়, প্রতিদিনের সংসারপথের ছোট ছোট গ্লানিগুলি মন হইতে মুছিয়া যায়, মনের অস্বাভাবিক ভার লঘু হইয়া আসে। আমাদের নিত্যজীবনের উপর হাস্যপরিহাসের অপূর্ব্ব প্রভাব ; ইহা আমাদিগকে সামাজিক জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলে, হৃদয়ের উদারতা আনিয়া দেয়, পরমতসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করিয়া সমগ্র সমাজটীকে সুস্থ ও সবল করিয়া রাখে। কিন্তু সেই হাসি শুদ্ধ ও সুন্দর না হইলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অগ্নি-পরিশুদ্ধ, খাঁটি ও মধুর হাস্যরস সংসারীজীবের অপরোক্ষভাবেও নানাবিধ কল্যাণ সাধিত করিত। ঠাকুর বলিতেন, "অনেকে গাঁজার লোভে সাধুসঙ্গ করে।" একেবারে সাধুসঙ্গ না করা অপেক্ষা গাঁজার লোভেও সাধুসঙ্গ করা ভাল,—বিষয়জ্বালার পরম মহৌষধি সাধুসঙ্গ তো হইয়া যায়। তাই যথেষ্ট গ্রহণ করিবার শক্তিবর্জ্জিত সাধারণ মানুষ ধর্ম্মের গভীরতত্ত্ব সমগ্ররূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইত না, আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া রাখিতে না পারিলেও ঠাকুর তাহাদের সংসারের তিক্ততা দুর করিয়া জীবন যাত্রার পথ সরস ও সুগম করিয়া তুলিতেন। যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মকথা প্রণিধান করিতে পারিত না তাহারা অন্ততঃ হাসিটা শুনিত এবং তাহাতেই যথাসম্ভব উপকৃত হইত। আবার কখনও বা সংসারীজীবনকে শুদ্ধ করিবার জন্য, তাহার নানাবিধ মলিন অভ্যাস দূর করিবার জন্য ঠাকুর তিরস্কার করিতেন কিন্তু সেই তিরস্কারের রুক্ষতাও সহনযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য তাহাকে হাসির আবরণে ঢাকিয়া কোমল করিয়া দিতেন। ইহা যেন

কুইনাইনের বটীকাকে চিনির প্রলেপ দিয়া রোগীর সহজে গিলিবার উপায় সৃষ্টির মত,—বিষয়ী রোগী সহজে সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না, রুক্ষ করিয়া বলিলে তাহার অভিমান হইবে, আর আসিবে না, সুতরাং হাসির প্রলেপ দিয়া দীনবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সুচিন্তিত ঔষধ বিষয়ীকে গলাধঃকরণ করিতে সাহায্য করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জন্যও এই কৌতুকরসের প্রয়োজন ছিল। বিষয়ভোগের মহারঙ্গভূমি কলিকাতা হইতে অতৃপ্তবাসনার ঢেউগুলি সময় সময় দক্ষিণেশ্বরের ভিতরেও প্রবেশ করিত এবং দুঃখদাহনের উত্তাপে ঠাকুরও কখনও কখনও ক্লিষ্ট ও বিব্রত হইয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার নিজের দেহধারণের জন্য হাসির প্রয়োজন হইত। মানুষের শরীর রক্ষার জন্য যেমন জল বাতাস ও অন্নের প্রয়োজন হয়, মধ্যে মধ্যে উন্মুক্ত প্রাণখোলা হাসির ঠিক্ তদ্রূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে। হাসিতে মানুষের জন্মগত অধিকার,—তা সে শিশু অথবা বৃদ্ধই হউক, আসক্ত বিষয়কীট অথবা বিরক্ত সন্ন্যাসীই হউক—সকলেরই একরূপ প্রয়োজন। আমেরিকার বিখ্যাত President Lincoln যখন গৃহযুদ্ধ লইয়া বিশেষ বিব্রত তখনও বন্ধুগণের সহিত অবসরমত হাস্যকৌতুকে সময় অতিবাহিত করিতেন। অনেকে বিস্মিত হইতেন যে যাঁহার মস্তকের উপর সমগ্র আমেরিকার কল্যাণের গুরুভার বিন্যস্ত সেই লোক যুদ্ধবিগ্রহের অশেষবিধ ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া হাসিবার ইচ্ছা অথবা অবসর কোথা হইতে পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য একদিন Lincoln বলিয়াছিলেন "With the fearful strain that is on me day and night, if I did not laugh, I should die" (যে পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়া আমার দিবারাত্র কাটিয়া যাইতেছে তাহাতে মধ্যে মধ্যে না হাসিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইতাম)।—এই কথাগুলির মধ্যে মানবজীবনে হাস্যরসের অশেষ প্রয়োজনীয়তা নিহিত রহিয়াছে। সাধুরও

২০

তাই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য হাস্য কৌতুকের প্রয়োজন হয়। অবশ্য যে সাধু হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে একাকী সাধনভজন করিতেছেন তাঁহার হাসির প্রয়োজন হয় না, তাঁহার হয়ত জল বাতাস অথবা অন্নেরও প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা সাধারণ দেহধারণের নিয়মের অধীন নহেন। কিন্তু যে সাধু মানবসমাজের ভিতরে থাকিয়া, মানবসংস্পর্শের উত্তাপ সহ্য করিয়া, মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দেহধারণ করিয়া আছেন তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য অন্নজলের মত হাসিরও প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির স্রোত যেমন গৃহী অথবা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কল্যাণের জন্য প্রবাহিত হইত তেমনই তাঁহার নিজের দেহ ও ও মনকে শীতল করিয়া সেই হাসি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেহ ধারণ করিতে সাহায্য করিত। ঠাকুরের কৌতুক-রসের ইহাও একটি বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা বলিয়া আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

এমন যে অনন্য সাধারণ, বিষয়বীজাণু নাশক, সূর্য্য-কিরণ জালের মত উজ্জ্বল অথচ অশেষ কল্যাণকর, আনন্দরসঘন কৌতুকরাশি তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে বিশ্লেষণ করিয়া আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে সেই হাস্যরসের দেহ আছে কিন্তু আজ তাহার প্রাণ নাই, কারণ যে প্রাণের উৎসমুখে তাহারা বাহির হইত সে উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যদি কোথাও তাহার দুই এক কণা বারিবিন্দু থাকে তাহা তদ্ভাবভাবিত কোন সাধুহৃদয়ের মধ্যে ; সুতরাং লোকচক্ষুর অন্তরালে। চক্ষের একটা ইঙ্গিত, মুখের কোন ভঙ্গী, সামান্য অঙ্গুলিসঞ্চালন, কণ্ঠস্বরের উচ্চনীচহিল্লোল,—এই উপাদানগুলি যে হাস্যরসের প্রাণস্বরূপ ছিল, রূপস্বরূপ ছিল, আজ তাহাদিগকে মৃত অক্ষর সমষ্টির মধ্যে কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে! একই কৌতুকের কথা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রণালীতে ব্যক্ত হইয়া রসানুভূতির অনেক তারতম্য সৃষ্টি করিয়া থাকে,—ইহা অনেক সময় দেখা যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুকরসের পূর্ণ অভিব্যক্তি আজ

একরূপ অসম্ভব। সে যুগে ঠাকুরের মুখোমুখি বসিয়া যে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহার মুখনিঃসৃত কৌতুকালাপ শ্রবণ করিতেন এবং যে ভাবে তাহা উপলব্ধি করিতেন আজ তাহা আংশিকভাবে অনুমান করা যাইতে পারে, সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব।

তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিবার অথবা হাসাইবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম উপায়-স্বরূপে ঠাকুর হাস্য-কৌতুকের অবতারণা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গম্ভীরাত্মা, বৈরাগ্যবান্, জ্ঞান ও ভক্তিময় সাধুপুরুষ। নিরর্থক হাল্‌কা হাসি তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল,—সংসারীজীবের বৃথা হাস্যকোলাহল তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কৃষ্ণধন নামে জনৈক রসিক ব্রাহ্মণ সময় সময় ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণটীর স্বভাব এক রকম ভাঁড়ের ন্যায়;—এক একটী কথা কন আর সকলে হাসে।" একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বলরামবাবুর বাড়িতে উপস্থিত; রসিক কৃষ্ণধন সমবেত ভক্তবৃন্দকে তাঁহার হাসির কথায় মুহুর্মুহুঃ হাসাইতেছেন। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, পরে বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণধনকে বলিলেন—"কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি কতদিন ফষ্টিনাষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ঐটী ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়।" কৃষ্ণধন ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিনা তাহা আজ জানা নাই কিন্তু ঠাকুর মিথ্যা হাস্য পরিহাসকে কিরূপ ঘৃণা করিতেন তাহা আমরা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারি। তাঁহার নিজের সমস্ত হাস্যকৌতুকের মোড় ঈশ্বরের দিকে সর্ব্বদাই ফিরান থাকিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যরসতরঙ্গ যে সমস্ত বিভিন্ন ধারায় সঞ্চারিত হইত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও বেগবান রেখাটীর গতি ছিল তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের দিকে। কখনও বা এই হাস্য কৌতুকের ভিতর

আদি রসের ইঙ্গিত দেখা যাইত; কখনও বা গ্রাম্যভাষা ও অঙ্গভঙ্গীর সমাযোগে সংসারী জীবনের কোন পরিচিত চিত্র ফুটিয়া উঠিত। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ যেন গুরুর আসন হইতে নামিয়া আসিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন, গলা জড়াইয়া ধরিয়া সখার মত, সমবয়স্ক বন্ধুর মত রসালাপ করিতেছেন। অপর হয়ত অনেকে সেইখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু ঠাকুরের হাসি তাহাদের জন্য নয়, তাহারা যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া সেই কৌতুকের রসাস্বাদন করিতেছে। ভক্তগণ অন্য কোন এক ভক্তের প্রাঙ্গনে খাইতে বসিয়াছেন,—'নামসঙ্কীর্ত্তন, ঈশ্বরীয় কথা সমস্তই হইয়া গিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নাচিয়াছেন, গাহিয়াছেন, গভীর তত্ত্বসমূহ সরল করিয়া বুঝাইয়াছেন। যখন ভক্তেরা খাইতে বসিয়াছেন, লুচি দেওয়া হইল, সন্দেশ আসিল, ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মধুরকণ্ঠে লুচিমোণ্ডার গান জুড়িয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গানের সহিত তাল রাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই কি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ; সেই গুরুরূপী সাধুপুরুষ; সেই গম্ভীরাত্মা, যিনি মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে জ্ঞান ও ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করিতেছিলেন, তখন যাঁহার জীবনের অনুভূতিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কল্পনা করা দূরের কথা ভক্তগণ তাঁহার জ্ঞানপ্রদীপ্ত চক্ষুর প্রতি সহজ ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেও সাহস করেন নাই! সেই শ্রীরামকৃষ্ণই লুচিমোণ্ডার গান ধরিয়াছেন, মিষ্টান্ন লোলুপ বালকের মত সন্দেশ দেখিয়াই নৃত্য করিতেছেন! এই দুইটি বিভিন্ন চিত্র ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না,—ভক্তগণ খাইতে খাইতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপ স্বচ্ছ, অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। আর একদিনের কথা। ঠাকুর কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাড়ী আসিয়াছেন। ভক্তের ৭।৮ বৎসর বয়স্ক কন্যাটী আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে গান গাহিতে বলিলেন। বালিকা কিছুতেই গান গাহিবেনা। প্রচুর দাঁড়ি গোঁফে কন্টকিত মুখ, স্খলিত

দন্ত, বৃদ্ধকে বড় জোর একটা প্রণাম করা চলে, তাঁহার সম্মুখে গলা ছাড়িয়া গান গাওয়া একেবারেই অসম্ভব। উপরন্তু সেখানে বহুজনসমাগম, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই আছেন। বালিকা যখন কিছুতেই গান গাহিল না তখন বালক—শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই অঙ্গভঙ্গী সহকারে সেই সভামধ্যে গান ধরিলেন

"আয়লো তোর খোঁপা বেঁধে দি,
তোর ভাতার এলে বল্‌বে কি ?"

গান চলিতেছে, বালিকা লজ্জায় মর্ম্মাহত, অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ গুরুকে ভুলিয়া কৌতুকময় সখাকে দেখিতেছেন, যাঁহারা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সাধু দর্শন করিতেছেন তাঁহারা অদ্ভুত সাধুর অদ্ভুত সঙ্গীত শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন, কেহ বা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু বালিকা উপলক্ষ্য মাত্র ; যাহাদের জন্য এই গান সেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গানের মর্ম্মকথা গ্রহণ করিতেছেন। একদিন যাত্রাওয়ালারা ফলহারিণী কালীপূজা উপলক্ষ্যে "বিদ্যাসুন্দর" পালা গাহিয়াছে, যে গৌরবর্ণ যুবক বিদ্যা সাজিয়াছিল সে ঠাকুরের সহিত প্রভাতে দেখা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর প্রীত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বিবাহ হয়েছে ? ছেলে পুলে ?" যাত্রাওয়ালা উত্তর দিল—"আজ্ঞে, একটী কন্যা গত, আরো একটী সন্তান হয়েছে।" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এর মধ্যে হোলো গেল। তোমার এই কম বয়স। বলে—সাঁজ সকালে ভাতার ম'লো কাঁদবো কত রাত !" উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কথাটা কিন্তু অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের জন্য ; সংসারের সুখভোগ ভাল করিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই দুঃখ, ব্যাধি, মৃত্যু আসিয়া মানুষকে দহন করিতে থাকে, সমস্ত জীবন তখনও তো সম্মুখে পড়িয়া আছে ! আরম্ভ হইতে না হইতেই সাঁজ সকালে যদি দহন আরম্ভ হয়, সুদীর্ঘ জীবন-রজনী তখনও সম্মুখে প্রসারিত ; মানুষ "কাঁদবে কত রাত !" শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অন্তরঙ্গ

ভক্তগণকে বলিতেছেন—'সাধু সাবধান।' হাসি তাঁহাদের জন্য, হাসির জ্বালাও তাঁহাদের জন্য, যাত্রাওয়ালা উপলক্ষ্য মাত্র।

আবার কোন কোন সময় শিষ্যদের মধ্যে কেহ কৌতুকের ইঙ্গিত করিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ইঙ্গিতের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া অন্তরঙ্গগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতেন। এই বিষয়ে সাধারণতঃ অগ্রণী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। অন্যান্য শিষ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণ হাসাইলে তবে হাসিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে হাসাইবার চেষ্টা তাঁহারা করিতেন না। কিন্তু অশেষ স্নেহরসে অনুগৃহীত নরেন্দ্রনাথের সাহসের সীমা ছিল না। একদিনের কথা। ভক্ত অধরসেনের বাড়িতে ধর্ম্মের মেলা বসিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ভগবৎস্মরণ ও ভগবৎকথালাপ করিতেছেন। কীর্ত্তন হইতেছে

বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই
তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই॥

ঠাকুর এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "সেই অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।" গান নাচ শেষ হইলে ভক্তমধ্যে উপবেশন করিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন— "হাজরা নেচেছিল ?" নরেন্দ্র কুটিল হাস্য সহকারে উত্তর দিলেন "আজ্ঞা, একটু একটু।" নরেন্দ্রনাথের 'একটু' 'একটু' বলিবার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ছিল,—অর্থাৎ হাজরা আনন্দে নৃত্য করে নাই, দলে পড়িয়া হাজরার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ঈষৎ নৃত্য করিয়াছিল মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও নরেন্দ্রনাথের কুটিল হাস্যের এবং তাঁহার কৌতুকের ইঙ্গিত অনুমান করিতে পারেন নাই, সুতরাং বিস্মিত হাস্যসহকারে প্রশ্ন করিলেন—"একটু একটু ?" এইবার যুবক নরেন্দ্র বৃদ্ধ বয়স্যের নিকট ভাল করিয়া মুখ খুলিলেন,— "ভুঁড়ি আর একটী জিনিষ নেচেছিল।" যেন কলেজে পড়া তরুণ ছাত্রদের ভিতর রসালাপ হইতেছে। অন্য কেহ এই আদিরসাক্রান্ত

স্বামী বিবেকানন্দ

কৌতুকের ইঙ্গিত করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ঠাকুরের আদর পাইয়া নরেন্দ্রের সাহসের সীমা ছিলনা। কিন্তু শিষ্যের নিকট গুরু হারিবার পাত্র নহেন, সুতরাং "আর একটী জিনিষ নেচেছিল" শুনিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার উপর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন "সে আপনি হেলে দোলে,—না দোলাতে আপনি দোলে।" গানের এই ছত্রটী শ্রীকৃষ্ণের চূড়া ও মালার বিষয়ে রচিত, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রের রসকৌতুকের ভিতরে পড়িয়া ছত্রটী বিপরীত অর্থ ধারণ করিল, হাসির তরঙ্গ উঠিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে প্লাবিত করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান লোক সকলকেও স্পর্শ করিল। আবার কোন কোন দিন জ্ঞানবৃদ্ধ ঠাকুর নিজ বাল্যকালের স্মৃতি মনে টানিয়া আনিয়া সে-যুগের পেশাদারী স্ত্রীলোক কীর্ত্তনীয়ার অনুকরণ করিয়া অন্তরতম শিষ্যগণকে আনন্দ প্রদান করিতেন। এইরূপ একদিনের কথা মহেন্দ্র গুপ্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। ছোট খাটটীতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্ত্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসাইতেছেন। কীর্ত্তনী সেজেগুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্ত্তনী দাঁড়াইয়া, হাতে রঙ্গীন রুমাল। মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে "আসুন"। আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটী ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।" সমস্তই ঠাকুর একাই অভিনয় করিতেছেন,—ঢং করিয়া কাসিতেছেন, নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছেন, হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ-অনন্ত-বাউটী দেখাইতেছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! জ্ঞানের নিস্তরঙ্গ মহাসিন্ধুস্বরূপ পরম গম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকদের ভিতরে যুবক সাজিয়া, কলেজ স্কুলের ছাত্রদের সভাসমিতিতে যে হাস্যরসের ছোট ছোট অভিনয় হয়, তাহাকেও

আজ হার মানাইয়াছেন। যে ঘরে সাধারণতঃ বেদ বেদান্ত অনুশীলন হয়, জ্ঞান, ও ভক্তির নির্ম্মল ধারা অজস্র সহস্রবিধ রেখায় প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেই কক্ষে আজ নানা ঢংয়ের গান, কাসি, গহনা দেখান চলিতেছে। "অভিনয় দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন—'ছেলেমানুষ কি না, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।' (পল্টুর প্রতি সহাস্যে) 'তোর বাবাকে এসব কথা বলিস্‌নি। যাও একটু আমার প্রতি টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।" অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত এইরূপ বাধাবন্ধহারা অনাবিল হাস্যকৌতুক শ্রীরামকৃষ্ণ আপনি উপভোগ করিতেন আবার ভক্তগণকেও সে আনন্দের অংশ মুক্ত-হস্তে বিতরণ করিতেন,—সেখানে লজ্জা অথবা শিষ্টাচারের কোন আবরণ থাকিত না।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক রকমের কৌতুক ছিল,—বিরোধনাশক, শান্তিসংস্থাপক। ধর্ম্মের নামে দ্বন্দ্ব তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। চিরদিনই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই জগতে যে সমস্ত নৃশংস অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া আসিতেছে তাহা ধর্ম্মপ্রাণ সাধুদিগের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছে অথচ আজ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকার হইল না। নানাবিধ তুচ্ছ কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া বর্ব্বর মানব অনেক সময় অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে কিন্তু ভগবানের ধ্বজা উড়াইয়া, তাঁহার দুর্ব্বোধ্য ইচ্ছাকে বুঝিবার ভান করিয়া, মানুষ এই জগতে যত রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে তাহার শতাংশের এক অংশও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়—মহাযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মের নামে অত্যাচার অথবা রক্তপাত দূরের কথা ভগবানকে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া মানুষে মানুষে বিরোধ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই ধর্ম্মের নামে বিরোধ দেখিলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যথিত হইতেন, তৎক্ষণাৎ সেই বিরোধ

মিটাইবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান উপায় ছিল তীব্র কৌতুক,—এই কৌতুকের সহায়তায় তিনি ধর্ম্মের বিরোধ বহুক্ষেত্রে মিটাইয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর জানিতেন যে ধর্ম্মের গোঁড়ামি যখন বিবাদপ্রিয়তাকে অবলম্বন করে তখন শাস্ত্র, যুক্তি, শিষ্টাচার, কোন বিষয়ই তাহাকে বুঝাইতে পারে না,—একগুঁয়েমির পরাকাষ্ঠা মানুষ ধর্ম্ম-বিবাদের সময় প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শাস্ত্র-আলোচনা অথবা মহাজন-অনুসৃত পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেন না, তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দময় কৌতুকরসের অবতারণা করিয়া তিনি এই তুচ্ছ ও অর্থহীন বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। একদিনের কথা। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কুচবিহার রাজবংশে কন্যার বিবাহ দেওয়ায় ব্রাহ্মসমাজে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং ভক্তপ্রবর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই বিবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ তখন দুইটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—একদিকে সাধারণ সমাজ, অন্যদিকে নব বিধান। এমনই সময়ে একদিন একখানি ষ্টীমারে করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তগণ নদীবক্ষে বায়ু সেবন করিতে বাহির হইয়াছিলেন,—বায়ুসেবন উপলক্ষ্য মাত্র, ধর্ম্মকথা আলোচনা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেদিন উপস্থিত, তিনি লিখিয়াছেন—"ভাঁটা পড়িয়াছে, আগ্নেয় পোত কলিকাতা অভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে।......তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন দিক দিয়া সময় যাইতেছে, হুঁস্ নাই। এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট।......এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছেন। (ঠাকুর) তখন যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়া দিলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ—যেন শিবরামের যুদ্ধ। (হাস্য) রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো; দুজনে ভাবও হলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো, ওদের ঝগড়া কিচমিচী আর মেটেনা। (উচ্চহাস্য) আপনার লোক। তা এরূপ হয়ে থাকে। লবকুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা! কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি এর একটী সমাজ আছে; আবার ওর একটী দরকার। (সকলের হাস্য) তবে এসব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটীলে কুটীলের কি দরকার? জটীলে-কুটীলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয় না। (সকলের হাস্য) জটীলে কুটীলে না থাক্‌লে রগড় হয় না। (উচ্চ হাস্য)।" গঙ্গাবক্ষ প্রকম্পিত করিয়া উচ্চহাস্য চতুর্দ্দিক মুখরিত করিল, বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন, উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল, যে জমাট ধোঁয়া উভয়ের মনের উপর চাপ বাঁধিয়া বসিয়া ছিল, হাসির দম্‌কা বাতাসে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল, উভয় ভক্তের মধ্যে যে কঠিনতার যবনিকা এতক্ষণ ছিল তাহা ধীরে ধীরে অপসারিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ মনুষ্যচরিত্র বুঝিতেন, তিনি জানিতেন যে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ উভয়েই সাধুস্বভাব ও ভগবৎ বিশ্বাসী; সুতরাং তিনি শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন কথার অবতারণা করিলেন না, কোন্ সমাজ সত্যপথে চলিয়াছে, কোন্ সমাজ ভুল করিল, এই সমস্ত অবান্তর বিষয় ঠাকুর আলোচনা করিলেন না, তিনি দেখিলেন ইঁহাদের মনের কুজ্‌ঝটিকা উড়াইয়া দিলেই, মিলনের বাকী কার্য্য আপনা আপনিই সাধিত হইবে। ঠিক্ তাহাই হইল! তাই সাধুদেরও হাসির এতো প্রয়োজন, সংসারী লোকের তো বটেই,—এই হাসি না থাকিলে সংসার, সমাজ, পৃথিবী সমস্তই তিক্ত হইয়া উঠিত।

এইরূপ অসংখ্য ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আর একটীমাত্র এখানে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, ৩রা জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজার ভক্তগৃহে উপস্থিত; সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—"সব ধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব; বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের মধ্যে। ভিন্ন মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, সমন্বয় ক'রতে জানে না।......যে সমন্বয় করেছে, সে-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি,—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তমত সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরকার, তিনিই সাকার, তাঁহার নানা রূপ।" কয়েকটী কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব উপস্থিত রহিয়াছেন, ঠাকুরের কথাগুলি তাঁহাদের ভাল লাগিতেছেনা। তাঁহারা কেশবমন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসবান, অন্য মন্ত্রের উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের ঘোরতর সন্দেহ। ঠাকুর তাঁহাদের ভাব ও চিন্তা বুঝিলেন, আরও লক্ষ্য করিলেন যে বৈষ্ণব ভক্তগণের—"আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না"—এই মতুয়ার বুদ্ধি শুনিয়া শাক্তগণের মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, মনে মনে বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে, ঠাকুর আশঙ্কা করিলেন —পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। তখন শাক্তগণের মুখের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিলেন "শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করিয়া দেন,—বৈষ্ণবদের এই কথা শুনিয়া শাক্তেরা বলে, 'তাতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী, তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন, পার করবার জন্যে।" চতুর্দ্দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল, শাক্তগণ উল্লসিত হইলেন, নির্ম্মল কৌতুকরস গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবগণও সেই হাস্যে যোগ দিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবদের বিবাদের আশঙ্কা হাসির বাতাসে অঙ্কুরেই কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। "যে সমন্বয় করেছে সেই লোক"—"Dogma divides religious experience unites",—ধর্ম্মজগতের এমন একটী মহৎ সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের

হাসির ভিতর দিয়াই ভক্ত-হৃদয়ে প্রবেশ করিল। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে বিবদমান লোকের মধ্যে শান্তিস্থাপন করেন তাঁহারা ভগবানের প্রিয়,—কিন্তু হাসির ছটায় ধর্ম্মকলহের ঘনায়মান অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সাধুপুরুষের জীবনে পরিলক্ষিত হয় না।

মানুষ অনেক সময় নিজেকে নিজ দেখিতে পায় না, হয়ত এমন আচরণ করিয়া ফেলে যাহা লোকচক্ষুতে লজ্জাকর, অথচ নিজে তাহা বুঝিতে পারে না। নিজের ভিতরে গভীরতম প্রদেশে কি পশু লুক্কায়িত আছে তাহা মানুষ অনেক সময় ধারণা করিতে পারে না। শিষ্টাচারের আবরণে আচ্ছাদিত কি প্রচণ্ড অহঙ্কার মানুষের হৃদয়ে গুপ্ত রহিয়াছে তাহা মানুষ অনুভব করে না, নিজের তমোগুণাচ্ছন্ন অলস মনকে হয়ত সত্ত্বগুণের নিরাশক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান ছিল, সাধনপ্রসূত সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী দৃষ্টি ছিল, তাই মানুষ নিজে নিজের সম্বন্ধে যাহা বোঝে না, শ্রীরামকৃষ্ণ পরের সম্বন্ধেও তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেইজন্য সময় সময় সংসারীজীবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ঠাকুর সংসারী জীবকেই দেখাইতেন, দূরে দাঁড়াইয়া বাহির হইতে নিজের চিত্র দেখিয়া মানুষ হাসিত এবং সেই হাসির দ্বারাই জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে তাহার চরিত্র যথাসম্ভব সংশোধিত হইয়া যাইত। দক্ষিণেশ্বরে নানাপ্রকৃতির লোক আসিত,—কেহ বা প্রাণের টানে আসিত, কেহ বা সাধুকে পরীক্ষা করিতে আসিত, আবার কেহ লোকদেখান সাধুসঙ্গ করিতে আসিত,—অথচ হয়ত মন বিষয়স্পর্শের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া আছে। ঠাকুর সমস্তই লক্ষ্য করিতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বহু লোক সমাগম হইয়াছে, কিন্তু কয়েকটী বিষয়াসক্ত লোক হরিকথায় মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছেনা, মন যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। তখন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা হইতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে-

ছিলেন—"আমি সব রকম করেছি, সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।" শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য করিলেন বিষয়াসক্ত লোকগুলির কোন ভাবই নাই, একমাত্র বিষয়চিন্তা মনের ভিতর গজ্‌গজ্‌ করিতেছে, ঠাকুরের নিকট হইতে উঠিতে পারিলেই যেন তাহাদের মনটা স্বস্তিলাভ করে। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন "যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটী নিয়ে থাকে। বারোয়ারীতে নানামূর্ত্তি করে,—আর নানামতের লোক যায়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্ব্বতী, সীতারাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি রয়েছে, আর প্রত্যেক মূর্ত্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। যারা শাক্ত তারা হরপার্ব্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তারা সীতারাম মূর্ত্তির কাছে। তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝ্যাঁটা মারছে,—বারোয়ারীতে এমন মূর্ত্তিও করে। ও সব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখে আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে,—আরে ও সব কি দেখ্‌ছিস্‌, এদিকে আয়, এদিকে আয়।" সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য এই কথাগুলি তাহাদের অন্তরে হাসি বিঁধিয়া গেল, নিজের চরিত্রের অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইল, হাসির ধাক্কা তাহাদিগকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও জাগ্রত করিল। এই মুহূর্ত্তের জাগরণও মানবজীবনে দুর্ল্লভ।

শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যরস অনেক সময় তাঁহার নিজের জীবন অথবা ঘটনাকে অধিকার করিয়া প্রকাশিত হইত। ইহাই বিশুদ্ধ হাস্যরস,—ইংরাজীতে যাহাকে খাঁটি humour বলে। বিশুদ্ধ হাস্যরস আঘাত দেয় না, হাসায়, সে হাসি যাহাকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইয়াছে সে হাসে, অপর সকলে তো হাসিবেই। নিজেকে বাঁচাইয়া কেবলমাত্র অপরের কৌতুককর চিত্র-অঙ্কনই খাঁটি হাস্যরস নহে, কৌশলী স্রষ্টা নিজেকেও এই

গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনিয়া নিজেও হাসেন, অপরকেও হাসাইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় এই বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিচয় দিতেন। হাজরা মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই হাজরা মহাশয়ের নিকট নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই যাইয়া বসিতেন, তাঁহার সহিত তামাক খাইতেন, গল্পগুজব করিতেন। ঠাকুর ইহা পছন্দ করিতেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে বলিলেন—"সত্ত্বগুণকে সাদা রংয়ের সঙ্গে উপমা দিয়েছে; রজোগুণকে লাল রংয়ের সঙ্গে, আর তমোগুণকে কাল রংয়ের সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বল্‌লে,—'নরেন্দ্রের ষোল আনা, আর আমার একটাকা দুই আনা'। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—আমার কত হয়েছে? তা বল্‌লে,—'তোমার এখনও লাল্‌চে মারছে,—তোমার বার আনা'"। বিষয়-বিরক্ত পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের সম্বন্ধে এইরূপ কৌতুককর বর্ণনা শুনিয়া ভক্তগণ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু ঢেউ গিয়া বহুদূরে ঠেকিল, হাজরার ধৃষ্টতায় হাজরার প্রতি বিরক্তির সৃষ্টি করিয়া এই কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা ভক্তগণকে তাঁহার হীনসংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার মনোভাব সৃষ্টি করিল। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের সম্বন্ধে কৌতুককর বর্ণনার দ্বারা ভক্তগণের মনে হাসির উদ্রেক করিবার আরও অনেক ঘটনা আছে। একদিন ঠাকুর ভক্তগণের নিকট ভাগীনেয় হৃদয়ের কথা বলিতেছিলেন। হৃদয় নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করিত। একদিন ঠাকুরের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শুনাইয়া হৃদয় বলিয়াছিল—"বোকা, আমি না থাক্‌লে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেত",—কথাগুলির মধ্যে যে বিষ মিশ্রিত ছিল তাহা বাদ দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কেবলমাত্র অসীম আত্মম্ভরিতার হাস্যরসই গ্রহণ করিয়া ভক্তদিগকে শুনাইলেন। কলিকাতায় ভক্তগণের বাটীতে যাইবার সময় প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে সঙ্গে লইতেন,—মনোমত পার্ষদগণ সঙ্গে না থাকিলে তাঁহার আনন্দ হইত না, উদ্দীপনা হইত না, কথা

কহিবার রুচি হইত না। এইরূপে অনেকবার যাতায়াত করিতে করিতে ঠাকুর কলিকাতার বিভিন্ন পাড়ায় পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রসিক পল্লীবাসীগণ ঠাকুরকে এইরূপে সাঙ্গোপাঙ্গপরিবৃত দেখিলেই কখনও বা পরোক্ষে, কখনও বা শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইয়া বলিতেন "ঐ পরমহংসের ফৌজ আসছে।" কথাগুলি মোটেই শ্রদ্ধাসূচক ছিল না, তথাপি হাসির রসটী শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করিতেন এবং তাহা উল্লেখ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। একদিন গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাইবার সময় বোসপাড়া গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র সেই পরিচিত কথাগুলি ঠাকুরের কাণে গেল এবং মহেন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন —"হ্যাঁগা, কি বলে ?—পরমহংসের ফৌজ আসছে! শালারা বলে কি!" ফৌজের সৈন্যগণ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও হাসিতে হাসিতে পথে অগ্রসর হইলেন। এইরূপ বিশুদ্ধ কৌতুকরসের প্রবাহ হইতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ মহিষীও অনেক সময় অব্যাহতি পাইতেন না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী,—পানিহাটীর দণ্ড মহোৎসব। শ্রীরঘুনাথের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল এই দিবস বৈষ্ণবসমাজে মহাসমাদৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শ্রীশ্রীমাতার সেইদিন পাণিহাটী যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ঠাকুর মন খুলিয়া অনুমতি না দেওয়ায় বুদ্ধিমতী শ্রীরামকৃষ্ণ মহিষী পাণিহাটী যাইলেন না। পাণিহাটী হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"ও (শ্রীশ্রীমা) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত—'হংসহংসী এসেছে।' ও খুব বুদ্ধিমতী।" পরমহংসের স্ত্রী, অতএব শ্রীশ্রীমাতা 'হংসী'! ইহাই বিশুদ্ধ হাস্যরস,—শ্রীশ্রীমাতাকে এই কৌতুকরসের অঙ্গীভূত করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিধা বোধ করিলেন না। আর একদিনের কথা,—ঘটনাটী শ্রীশ্রীমাতার নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইতেছে। "একদিন কাশীপুরে ২॥ সের দুধ শুদ্ধ একটা বাটী নিয়ে সিঁড়ি উঠ্‌তে

গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ তো গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন,—'তাই ত বাবুরাম এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটী ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারিস্?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন বাবুরাম তো হেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীমাতাকেও টানিয়া এই বিশুদ্ধ কৌতুক উপভোগ করিতেছিলেন তখন তিনি অসুস্থ, গলায় বিষম ক্ষত, মণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। অথচ কৌতুকপ্রিয়তা তখনও ঠাকুর পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজধর্ম্মপ্রচার,—কেবলমাত্র হাসির জন্য তিনি কৌতুকের অবতারণা করিতেন না। কখনও বা এই হাসি অতি মৃদু ও মধুর হইয়া মনকে আকর্ষণ করিত, কখনও বা হাসির ভিতর দিয়া তিরস্কার বাহির হইয়া পড়িত, আবার কখনও বা লোককে হাসাইয়া ঠাকুর বিষয় বিশেষের প্রতি ঘৃণা অথবা বিরক্তির ভাব উদ্রেক করিতেন। শিষ্যদের মধ্যে অনেকরকম প্রকৃতির লোক ছিলেন, কেহ বা অতি মৃদু স্বভাব, কেহ বা সহজে কোপনশীল। সব অন্তরঙ্গ শিষ্যগণেরই সাধনভজনের পরিপাকে উত্তরকালে ক্রোধ দমিত হইয়া ক্রমশঃ প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল কিন্তু এমন অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যেস্থলে যুবক ভক্তগণ সাধনভজনের অবস্থায় মনের উপর বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জানিতেন। একদিন ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া বলিলেন—"যে ভগবানের ভক্ত, তার কূটস্থ বুদ্ধি

হওয়া চাই।...অসৎলোকের বাঘ ভল্লুকের স্বভাব, তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে।...যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বল্‌বে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন,—বলে গালাগালি দেবে। তাকে বল্‌তে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুসি হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।' যে চিত্রটী ঠাকুর অঙ্কিত করিলেন, যে ভাবা ব্যবহার করিলেন তাহাতে সহজেই মানুষের হাসি পায়; কিন্তু যে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের উদ্দেশ্যে, অপর ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া, এই হাসির চিত্র অঙ্কিত হইল তাঁহারা যথার্থ ভাব গ্রহণ করিলেন। এই সংসারে 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' (ভাল কাজের অনেক বাধাবিপত্তি) এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা মানুষের নিকট হইতেই আসে। ঘোরবিষয়ী, পশুপ্রকৃতি মানুষ পৃথিবীতে অসংখ্য বাস করিতেছে তাহারা নিজেরাও সাধনভজন করে না, অপরের সাধনভজন দেখিলেও তাহা সহ্য করিতে পারে না। নিন্দা, বলপ্রয়োগ, অচিন্তনীয় উপদ্রব সৃষ্টি,—এই সকল লোকের স্বভাবসিদ্ধ এবং কোন ভাল লোককে সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেই ইহারা বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধকের মনে ক্রোধের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যদি সাধু একবার ক্রোধের বশীভূত হইয়া কায়িক অথবা মানসিক শক্তি প্রয়োগে তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে একবিন্দু রক্তপাতে যেমন অসংখ্য রক্তবীজের উৎপত্তি হইয়াছিল, সাধুর সাধনকার্য্যে সেইরূপ বহুবিধ বিঘ্ন সহস্রশীর্ষ হইয়া প্রবল আকারে দেখা তো দিবেই, উপরন্তু সাধকের জাগ্রত অথবা সুপ্ত সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তিই অপব্যয়িত হইয়া যাইবে, তাই হাসির কথায় ঠাকুর অপক্কসাধকগণকে সাবধান করিয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ নূতন করিয়া ভারতবর্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই বহুপুরাতন আদর্শ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভোগাসক্তচিত্ত প্রবলপরাক্রম ইংরাজ জাতির কটাক্ষ সম্মুখে যখন

ম্লান হইয়া গেল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহনিনাদে সেই মলিন আদর্শকে আবার নূতন করিয়া উজ্জীবিত করিলেন,—এই কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ, শ্রীরামকৃষ্ণের মহামন্ত্র। বিশেষ করিয়া সাধক-জীবনে কামিনীর প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি কখনও বা শুদ্ধ উপদেশ, কখনও বা হাসির অবতারণা করিতেন। একদিন এই প্রসঙ্গক্রমে কামিনীর বশীভূত গৃহী লোকের এক অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়া ঠাকুর ভক্তগণকে হাসাইলেন। "একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হায়রান হয়েছে, কর্ম্ম আর হয় না। অফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা কোরো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল; উমেদার হতাশ হয়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি! ওটার কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাঁধন ছেড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম্ম হবে। উমেদার বললে, বটে! আমি এখুনি চললুম। গোলাপ বড়বাবুর রাঁঢ়। উমেদার দেখা করে বললে, মা তুমি এটা না করলে হবে না। আমি মহাবিপদে পড়েছি, ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই। গোলাপ বললে, আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক করে রাখবো। তার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটী লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বললে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর অফিসে বেরুবে।" সকলেই হাসিলেন কিন্তু বিবেকী লোক হাসির অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ধর্ম্মোপদেশ প্রছন্ন ছিল তাহা গ্রহণ করিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও প্রবুদ্ধ হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, যে কামিনী লইয়া মানুষ এত উন্মত্ত হয়, সচ্চিদানন্দকে ভুলিয়া থাকে সে কামিনীর মনও বিষয়ী লোক সকল সময় অধিকার করিতে পারেনা। মানুষে মনে করে রমণীর দেহ অধিকার করিতে পারিলেই মনও তাহার অধীন হইয়া পড়িবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দেহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইলেও মন স্বেচ্ছাচারী হইয়া অনেক দূরে বিচরণ করিতেছে। স্ত্রীলোকের মন পাইতে হইলে রূপ, গুণ,

বয়স, অর্থ প্রভৃতির একটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন কিন্তু সব সময়ে ইহা ঘটিয়া উঠে না, অথচ কোন একটার অভাব হইলেই মনের গতি বিপরীতগামী হইয়া পড়ে। কিন্তু মনটা দখল না করিতে পারিলে আংশিক সুখও সম্ভবপর নহে। ঠাকুর বলিলেন "আবার কারু কারু তাকে (স্ত্রী) আগ্‌লাতে আগ্‌লাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার খোট্টা বুড়ো,—তার চৌদ্দ বৎসরের বৌ! বুড়োর সঙ্গে তার থাকৃতে হয়। গোলপাতার ঘর। গোল পাতা খুলে খুলে লোকে ছাখে। এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।' এ যেন "Humour that is close to tears" (অশ্রুজলে ভেজা হাসি)। পাঁড়ে জমাদার বৃদ্ধ এবং দরিদ্র কিন্তু কল্পনার সাহায্যে প্রয়োজনমত একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই ইহা ধনী যুবকের ক্ষেত্রেও মিলিয়া যাইতে পারে। কামিনীর সাহচর্য্যে সুখের আশা সুদূর পরাহত জানিলে হয়ত বিষয়ভোগী বিরক্ত হইয়া ভগবানের দিকে মনের মোড় ফিরাইয়া দিবে,—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির ভিতরকার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

কখনও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ ভক্তগণকে সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য অথবা মনে বিষয়বিরক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য হাসির চাবুক ব্যবহার করিতেন। তিনি জানিতেন বিষয়ী লোক অর্থকে বড়ই ভালবাসে এবং ভোগসুখব্যতীত অন্য কোন কারণে অর্থব্যয় করিতে বিষয়ী লোকের বড়ই কষ্ট হয়। অথচ এই কাঞ্চনের কিছু কিছু সদ্ব্যয় না হইলে, কাঞ্চনপ্রীতি ক্রমশঃ মনের দুষ্টব্যাধিতে পরিণত হইবে এবং মানুষকে কাঞ্চনের মতই কঠিন ও নীরস করিয়া তুলিবে। ইংলণ্ডের কোন কোন মনীষীও এই সত্য অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। George Eliot নামে একজন ইংরাজ মহিলা তাঁহার 'Silas Marner' নামক উপন্যাসে এক তন্তুবায়ের চরিত্রের ভিতর দিয়া কাঞ্চনের প্রবল মোহ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই তন্তুবায় মনুষ্য সমাজে মিশিতনা, দয়া করিয়া কোন ভিখারীকে কখনও অর্থ প্রদান করে নাই। তাহার কতকগুলি

সোণার মোহর সঞ্চিত ছিল, সেইগুলি বিছাইয়া মধ্যে মধ্যে দেখিত, স্পর্শ করিয়া সুখ অনুভব করিত; সঞ্চয় করিয়া মোহরসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা বিষয়ীজীবনের উদ্দেশ্য সফল করিত। ক্রমশঃ কঠিন কাঞ্চনখণ্ডের সহবাসে তন্তুবায়ের হৃদয় কঠিন ও নীরস হইয়া উঠিল,—অর্থপ্রীতি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার প্রতিদিনের খণ্ড খণ্ড জীবনকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, একটি মানবশিশুর কোমলও জীবন্ত সংস্পর্শের ভিতর দিয়া মনুষ্যের উচ্চজীবনের সন্ধান পাইয়া সে সুখী ও কৃতার্থ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ভিখারী দেখিলে সঞ্চয়শীল বিষয়ীভক্তগণকে অর্থ প্রদান করিতে বলিতেন, সাধু সন্ন্যাসীগণের জন্য অর্থব্যয় করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। ইহারা একেবারে কাঞ্চনত্যাগ করিতে পারিবে না, তথাপি সদ্ব্যয় করুক্, যাহাতে জীবনের উপর কাঞ্চনের প্রভাব অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও খর্ব্ব হইয়া যায়। একদিনের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। অথচ বলরাম ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন,—অর্থের মোহ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিয়াছেন, ভক্তগণ চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাহিতে বলিলে নরেন্দ্র ইতস্ততঃ করিলেন,—যন্ত্র নাই, শুধু গান ভাল জমিবে না। এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ হাসির চাবুক ধরিয়া বলরামকে দয়া করিলেন, বলরামের মনের নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলরামকে লজ্জিত করিলেন। ঠাকুর বলিলেন "বলরামের বন্দবস্ত! বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন,—একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন।' (সকলের হাস্য)...এখান থেকে একদিন গাড়ি দিছ্‌লো—৮০ আনা ভাড়া; আমি বল্লাম, বার আনায় দক্ষিণেশ্বর যাবে? তা বলে,—ও অমন হয়। গাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল! (সকলের উচ্চহাস্য) আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একেবারে থেমে

যায়। কোন মতে চলে না। গাড়োয়ান এক একবার খুব মারে; আর এক একবার দৌড়ায়।……বলরামের ভাব,—আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো।" সকলেই উচ্চহাস্য করিল। কিন্তু এই হাসির জ্বালা বলরামকে স্পর্শ করিল, উত্তরকালে সাধুসজ্জন ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য বলরাম উদারহস্তে ব্যয় করিতেন,—ভক্তের কৃপণ স্বভাব একদিনের হাসির আঘাতে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর একদিন ব্যয়কুণ্ঠ কাঞ্চনমোহাবিষ্ট বিষয়ীলোকের স্বভাব ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছিলেন। "বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।…এক জায়গায় যাত্রা হ'চ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারি ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান করে জানতে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারি ভিড় হ'য়েছে। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল করে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগ্‌ল।" কি অপূর্ব্ব বর্ণনা, কি অপূর্ব্ব চিত্র! বিষয়ীগণ সাধুর সত্য সত্যই যাহা প্রয়োজন তাহাও সন্ধান করিতে প্রস্তুত নহে; পাছে অর্থব্যয় করিতে হয়! সাধুদর্শনও হউক, ফাঁকি দিয়া কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া যায় তো মন্দ নহে, কিন্তু সাধুদর্শন করিতে গেলে যদি অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে অনিশ্চিত পুণ্যলাভের আশা পরিত্যাগ করাই ভাল। কিন্তু অপর দিকে অর্থলোভী সাধুরও ঠাকুরের নিকট অব্যাহতি ছিল না। একদিন সিঁদুরিয়াপটীর ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন "সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় কর্ত্তে নাই।……দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটুলি পোট্‌লা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা কাপড় বুঁচ্‌কি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায় ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিন জন

বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্ছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প কর্‌ছে। বল্‌ছে,—আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া,—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া।" পেঁড়া বরফীর কথার সময় সাধুদের জিহ্বায় রস সঞ্চার হইতেছিল কিনা, সাধুরা ঘন ঘন ঢোক গিলিতেছিলেন কিনা তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন নাই কিন্তু ভাবা ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের সংযোগে জিহ্বালম্পট্ সাধুদিগের চিত্র সকলের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, বিশেষ করিয়া শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হৃদয় স্পর্শ করিল। ভবিষ্যতে সাধুজীবন যাপন করিবার সময় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কিছুই সঞ্চয় করিতেন না, পুরীতে অবস্থান কালে অযাচিত সহস্র সহস্র মুদ্রা হয়ত একই দিনে ভক্তগণের নিকট হইতে বিজয়কৃষ্ণের নিকট আসিয়াছিল, পরদিনের জন্য এক কপর্দ্দকও না রাখিয়া বিজয়কৃষ্ণ সমস্তই দান করিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের এই অমূল্য উপদেশ কখনও বা হাসির সংমিশ্রণে মধুর হইয়া, কখনও বা পরমগাম্ভীর্য্য সহযোগে কঠিন হইয়া, আবার কোন সময়ে তিরস্কারের আবরণে তিক্ত হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিত এবং উত্তরকালে এই সাধুবৃন্দের মধ্যে অর্থসঞ্চয়ের স্পৃহা কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। হাসির দ্বারা এমন চিত্তশোধনের দৃষ্টান্ত ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিরল।

নরেন্দ্রনাথ যখন সংসারের তাপে দগ্ধ হইতেছিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ হাসির বাক্যবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া বস্তুলোভাতুর মনের বিলয় সাধন করিয়া শুদ্ধ ভক্তজীবনে নরেন্দ্রনাথকে প্রবোধিত করিতে অশেষ বিধ প্রয়াস করিতেছিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে যত ভালবাসিতেন তত কঠিন শাসনও তাঁহার জন্য ব্যবস্থা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক দুঃখের মধ্যে পড়িলেন,—তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে সংসারে অর্থস্বাচ্ছল্য হইলে তাহার পর ভগবৎচিন্তনে জীবন উৎসর্গ করিবেন।

এই "আগে পরের" ব্যাপারটি শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ২৭শে অক্টোবর বেলা প্রায় ১০টার সময় নরেন্দ্রনাথ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন "নরেন্দ্র পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। মা ও ভাই-এরা আছেন, তাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে। নরেন্দ্র আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মধ্যে বিদ্যাসাগরের বৌবাজারের স্কুলে কয়েকমাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বাটীর একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন,—এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন। ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধকের মনের এই "আগে-পরের" অবস্থা কখনও পছন্দ করিতেন না। ঝাঁপ দিতে হইবে, হিসাব করিয়া খানিকটা মন সংসারে, খানিকটা ভগবৎ চিন্তায় নিয়োজিত করিলে, একূল ওকূল দুকূলই হারাইয়া যায়, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তাই সেদিন নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর কথাটা ভাল করিয়া পাড়িলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই উপবিষ্ট কিন্তু কথাগুলি মহেন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকাইয়া আরম্ভ হইল। "আচ্ছা, যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার ভাবনা হয় না,—সে মাসে মাসে মুসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্রের অত উঁচু ঘর; তবু হয়না কেন? ভগবানে মন সব সমর্পণ কর্‌লে তবে তিনি তো সব যোগাড় করে দিবেন।" সেই কথাই চলিতে লাগিল, নরেন্দ্র ঝাঁপ দিতেছেন না, ঈশ্বরে ষোল আনা বিশ্বাস তাঁহার তখনও আসে নাই, পুরুষকারে বিশ্বাস রহিয়াছে, অবসর পাইলেই আপিষে আপিষে ভাল চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। তখনও নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহার ভাল চাকুরী হওয়া অসম্ভব, বিশ্বজননী নরেন্দ্রনাথের অর্থলোভের পথে বিরাট পর্ব্বতের মত বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, যুগে যুগে বিশ্বজননীর চিহ্নিত সেবক নরেন্দ্রনাথের অদৃষ্টে ভোগবিলাস নাই, অর্থ সঞ্চয় নাই, বিষয় সুখ নাই। ঠাকুর পুনরায়

বলিলেন—"একটা মাগীর ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধ্‌লে,—তার পর 'ওগো, দিদিগো আমার কি হ'ল গো' ব'লে আছড়ে পড়লো, কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙ্গে যায়।" এই কথা বলিয়া ঠাকুর চুপ করিলেন, গম্ভীর হইলেন। সাধারণতঃ হাসির কথা বলিয়া তিনিও হাসিতে যোগ দিতেন কিন্তু আজ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গকৌতুকের আঘাতে নরেন্দ্রের বক্ষে বেদনার রক্তবিন্দু; তাই আজ ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের ভিতরেও নরেন্দ্রের জন্য অপার বেদনা, অসীম উদ্বেগ। কিন্তু ঠাকুরের 'মাগী', 'আঁচল' 'নৎটা' 'আছড়ে পড়্‌ল' ইত্যাদি এক একটি কথার এক একটি চিত্র চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া, প্রত্যেকটি কথা নরেন্দ্রনাথের তখনকার জীবনের প্রতি প্রযোজ্য বুঝিয়া, উপস্থিত অন্যান্য ভক্তগণ উচ্চহাস্য করিলেন। নরেন্দ্রনাথ "এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাইত্‌ হইয়া শুইয়া পড়িলেন।"

আজিকার এই অশ্রুমিশ্রিত হাসির নিগূঢ় রহস্য অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মন ও নরেন্দ্রনাথের মন যে একই সুরে বাঁধা, একই রোদনধ্বনি আজ উভয় হৃদয় তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়াছে, যিনি হাসির আঘাত হানিয়াছেন তিনিও যে বিদ্ধ হইয়াছেন, ইহা সেদিন কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির কথাটা শুনিলেন, ভিতরের অশ্রুটা চক্ষে পড়িলনা। মহেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রকে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "শুয়ে পড়্‌লে যে?" শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির পশ্চাতে কোমল হৃদয়ের স্পর্শ ছিল, মহেন্দ্রনাথের বিদ্রূপ যেন মানুষকে বেকায়দায় পাইয়া একটু খোঁচামারা! নরেন্দ্র-বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি নরেন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সংসারী মহেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"আমি তো আপনার ভাসুরকে নিয়ে আছি, তাহাতেই লজ্জায় মরি অন্য মাগীরা পরপুরুষ নিয়ে কি ক'রে থাকে!" মহেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া

মস্তক অবনত করিলেন। এইরূপে ভক্তগণের শিক্ষার জন্য হাসির ধ্বনি উঠিত, কোন হাসিটী আনন্দে উজ্জল, কোনটি বা অশ্রুজলে সিক্ত; কিন্তু সব হাসিই ছিল ভক্তের বিষয়বিরক্তির জন্য, আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য।

কখনও বা শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্য কৌতুকের ভিতর দিয়া মনে ঘৃণা ও লজ্জার সঞ্চার করিয়া স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে ধনীসমাজে মোসাহেব বলিয়া একশ্রেণির লোক পরিদৃষ্ট হইত। * যেমন ভাল আসবাব পত্র, রূপার গড়গড়ি, মূল্যবান তৈলচিত্র, শুভ্র তাকিয়াসাজান বিস্তৃত ফরাস, বহু দাসদাসী বড়লোকের বাড়ির অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে বিরাজ করিত ঠিক্ সেইরূপ তোষামোদী, মেরুদণ্ডবিহীন কতকগুলি লোক ধনীবাবুকে পরগাছার মত ঘিরিয়া থাকিতে সর্ব্বদাই দেখা যাইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ এইরূপ মোসাহেবের যুগ ছিল,—পরাধীন জাতির ইহা একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা। এখনও মোসাহেব আছে, হয়ত ধনী বলিয়া একটি সামাজিক শ্রেণি যতদিন থাকিবে ততদিন মোসাহেবও থাকিবে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় এই মোসাহেব এখন অনেক কম, প্রায় নাই বলিলেই চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ সামাজিক এই পরগাছাগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, যে পুরুষসিংহ আপনার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় সর্ব্বদাই জাগরুক তাঁহার পক্ষে এই কোমল মৃত্তিকাপিণ্ড মোসাহেবগুলিকে সহ্য করা কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। একদিন ঠাকুর বন্ধু ও ভক্ত যদুমল্লিকের বাটীতে আসিয়াই দেখিলেন অনেকগুলি বাবুপরিবৃত হইয়া মল্লিক মহাশয় অলস ও ঘোলাটে আলাপে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি অতো ভাঁড়, মোসাহেব, রাখো কেন?" মল্লিক মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তুমি উদ্ধার করবে বলে।" শ্রীরামকৃষ্ণ পরিহাসে

*কালীপ্রসন্নসিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"য় এইরূপ মোসাহেবের চিত্র অঙ্কিত আছে।

ভুলিলেন না, পুনরায় বলিলেন—"মোসাহেব মনে করে বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা শৃগাল একটী বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চরে বেড়ায়; ওটাও সঙ্গে সঙ্গে। শৃগালটা মনে করেছে ওর অণ্ডের কোষ ঝুলছে সেইটে কখনো না কখনো পড়ে যাবে আর আমি খাবো। বলদটা কখনো ঘুমোয় সেও কাছে শুয়ে ঘুমোয়; আর যখন উঠে চরে বেড়ায় সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কতদিন এইরূপে যায়; কিন্তু কোষটা পড়লো না; তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল। মোসাহেবদের এইরূপই অবস্থা।" সকলেই উচ্চহাস্য করিল, মোসাহেবরাও সেই হাস্যে যোগদান করিয়া লজ্জার দীনতা গায়ে মাখিল না, যদু মল্লিক নীরব হইলেন। হাস্যকৌতুকের যেমন ভাষা, তেমনই ভাব, তেমনই বলিবার ভঙ্গী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রটীও ঠিক যেন মিলিয়া গেল। যদুমল্লিক মনে মনে জিনিষটা বুঝিলেন, বিরক্ত হইলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সঙ্গী ভক্তগণকে শ্রদ্ধাসহকারে জলযোগ করাইলেন, কিন্তু হাসির কথাটী যে তাঁহার মর্ম্মস্থলে বিঁধিয়া রহিল তাহার পরিচয় পরবর্ত্তী সময়ে অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছিল।

ভাষায় বিচিত্র, ভাবে সমৃদ্ধ, বর্ণনায় অতুলনীয় অসংখ্য কৌতুক-প্রসঙ্গের মধ্যে কয়েকটী মাত্র উল্লিখিত হইল। হাস্যরসের অভিব্যক্তি সাহিত্য-শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু সব হাসিই সাহিত্য নয়। যেমন দাঁত বার করাই হাসি নয়, তেমনই সব কৌতুকই সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। সাহিত্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুকরস বর্ণনার মধ্যে চিরস্থায়ী সাহিত্যের সমস্ত উপাদানই বর্ত্তমান ছিল। সাধারণতঃ শ্রোতার শিক্ষা, মন এবং সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতায় বিভিন্ন প্রকারের কৌতুক প্রয়োজন হইয়া থাকে। একজন উচ্চশিক্ষিত লোক যে কৌতুকে হাসিবে, সাধারণ মুর্খ লোক হয়ত তাহার রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব হাস্যরস শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু ও গৃহী সকলেরই

সমভাবে উপভোগযোগ্য ছিল। হাস্যরস সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন "Of all experiences, the humorous is perhaps one of the finest and most useful." (মানুষের যত রকম অভিজ্ঞতা আছে তাহার মধ্যে কৌতুকরসাস্বাদন একটি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা)। হাসিটাই কৌতুকরস নহে, শুধু হাসানই কৌতুকরসের উদ্দেশ্যও নহে, কৌতুকরস হইতে হাসির উদ্ভব অবশ্যই হয় কিন্তু আরও অনেক কারণে মানুষ হাসে যাহা কৌতুকরসের অন্তর্ভুক্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সহজেই হাসে তাহার কৌতুকরসাস্বাদনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একজন ইংরাজ মনস্তত্ত্ববিদ বলিয়াছেন "In fact one who laughs easily is often devoid of a sense of humour." (যে সহজেই হাসে তাহার কৌতুকরসগ্রহণের শক্তি নাই!)

বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনে স্বীকার করিয়া এখন দেখিতে হইবে কি কি উপাদান বর্ত্তমান থাকিলে মানবমনের উপর বিশুদ্ধ হাস্যরসের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে হইতে দেখা যায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যরসের মধ্যে তাহা পাওয়া যাইত কিনা। প্রথমতঃই দেখা যায় যে কৌতুককর ঘটনা বর্ণনা করিবার শক্তি অধিকাংশ লোকের মধ্যেই নাই, কিন্তু এই শক্তিই কৌতুকরসোৎপাদনের প্রধান উপাদান। মনস্তত্ত্ববিদ্ জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন "The method of telling a humorous story becomes very important. One person may tell a story and get no response ; another telling the same story, may overcome his listeners with laughter." (হাসির গল্প বলিবার কৌশল কৌতুকরসের একটি প্রধান উপাদান। একজন হয়ত যে গল্প বলিয়া কোন হাসিরই উদ্রেক করিতে পারিলেন না আর একজনের বলা সেই গল্পই শুনিয়া হয়ত সকলে খুব হাসিতে লাগিলেন)। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত বিধিদত্ত শক্তি ছিল,—এই শক্তি অর্জ্জন করা যায় না, শিক্ষা

করা যায় না, ইহা বক্তার মানসিক গঠনপ্রণালীর উপর নির্ভর করে। যেমন বড় বক্তা, বড় কবি, বড় অধ্যাপক মানুষ চেষ্টা করিয়া হইতে পারে না,—এই শক্তি জীবনের সহিত কেহ পাইয়াছে, কেহ বা পায় নাই, ঠিক্ তেমনই দেখা যায় যে, হাসির কথা বলিবার কৌশল ও প্রণালী কেহ বা জন্মগত অধিকাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার কেহ চেষ্টা করিয়াও তাহা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির অধিকাংশ গল্পগুলি তাঁহার স্বরচিত, তাঁহার নিজ কল্পনাপ্রসূত। এখানেও শ্রীরাম-কৃষ্ণের হাসির কথার একটা বিশিষ্টতা ছিল। যাহা আমরা বহুবার শুনিয়াছি তাহা কিয়ৎপরিমাণে শুষ্ক ও নীরস হইয়াছে, হয়ত বা পচিয়া গিয়াছে, কৌশলী লোকের শক্তিও বর্ণনার দ্বারা তাহার ভিতর হইতে রস নিংড়াইয়া বাহির করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ কল্পনাশক্তিসহায়ে সময় ও অবস্থার উপযোগী যে সমস্ত হাসির গল্প সৃষ্টি করিতেন তাহা অপ্রত্যাশিতরূপে মানুষের মনকে অধিকার করিত,—মনকে এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণই হাস্য উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান। এই সৃষ্টি-কৌশল কবির নিজস্ব শক্তি,—ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 'The environment in which a humorous story is told is also important. (উপযুক্ত পরিবেশও হাসির গল্পের সফলতার জন্য একটী প্রয়োজনীয় জিনিষ।) এই অনুকূল Environment (পরিবেশ) শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিত। যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীরাম-কৃষ্ণকে তাঁহাদের অপেক্ষা একজন শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন, সুতরাং শ্রোতাগণের আগ্রহ, মনোযোগ ও বুদ্ধি সমস্তই সতর্ক হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যকৌতুকের উপযুক্ত পটভূমিকা পূর্ব্ব হইতেই সৃজন করিয়া রাখিত। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে এই একই কারণে লেক্‌চারঘরের মধ্যে অধ্যাপকের হাসির কথা সহজেই ছাত্রগণের

হাস্যরসের উদ্রেক করে। তৃতীয়তঃ, হাস্য কৌতুকের সফলতার জন্য শ্রোতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্যক। একজন সমালোচক বলিয়াছেন "One's mood is also a very important factor in the humorous experience. One must be able to follow a story freely...ordinarily, after-dinner speakers have ideal circumstances in which to tell their stories. The listeners have had a good dinner, the day's work is behind them ; they have no particular worries ; and, since the group is a social unity, all of the group suggestivity is present." (মানুষের উপযুক্ত মনের অবস্থাও হাস্যরসানুভূতির পক্ষে প্রয়োজন। সহজে হাসির কথা বুঝিতে পারা চাই। সাধারণতঃ খাওয়া দাওয়ার পর সন্ধ্যাটাই হাস্য কৌতুকের প্রশস্ত সময়। শ্রোতাগণ তখন খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়াছে, দিনের কাজ শেষ হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া আছে, মনে কোন চিন্তাভার নাই ; বিশেষতঃ শ্রোতাগণের সামাজিক ঐক্যের মধ্যে সামাজিক ব্যঞ্জনা ও অনুভূতি এই হাস্যরস উপভোগের বিশেষ সহায়ক)। এই উপযুক্ত 'mood' শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রোতাগণের সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিত। সংসারের দুঃখ তাপভার ফেলিয়া রাখিয়া মনকে লঘু করিবার জন্যই সাধারণতঃ লোকে দক্ষিণেশ্বর যাইত, ক্ষুধার কথা, দুশ্চিন্তার কথা তখন মনে স্থান পাইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ কৌতুককর গল্পের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের কথা বলিতেন,—ভাব সহজ, ভাষা সরল,—কাহাকেও কষ্ট করিয়া মাথা খাটাইয়া তাহার অর্থসংগ্রহ করিতে হইত না। চতুর্থতঃ, হাসির গল্প সমাজ ও দেশভেদে বিভিন্ন, ইংলণ্ডের লোকের কাছে যে হাস্যরস অতীব উপাদেয় তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের কাছে নীরস ও অর্থহীন। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন "The humour stories of various countries are also quite different"

(বিভিন্ন দেশের কৌতুককর গল্পগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন)। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্টতা ছিল। তাঁহার অনেক হাসির কথা কেবলমাত্র বাংলা সমাজের পক্ষেই কৌতুককর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অসংখ্য গল্প ছিল যাহা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইলেও রসসৃষ্টির কিছুমাত্র বিঘ্ন হইবে না,—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই আনন্দপ্রদ হইবে। ঠাকুরের হাসির এই সার্ব্বভৌমতা তাঁহার কৌতুকরসকে সাহিত্যের মর্য্যাদা প্রদান করিতেছে। এই কারণে অন্য লোকের হাসির কথা পুরাতন হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুককর গল্পগুলি চির নূতন, ও পুনঃ পুনঃ রসপ্রদ। আধ্যাত্মিক সত্যসমাবেশে ইহারা মানব সমাজের চির আদরের ধন, চিরদিনের প্রণিধানের বস্তু।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ হাস্যরসের এমনই অপূর্ব্ব প্রভাব ছিল যে ইহা অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়াছিল। একটীমাত্র উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব হইয়াছে, বরাহনগরে মুন্সীদের একটী ভাঙ্গা ও পোড়ো বাড়ি লইয়া নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ কয়েকটি ভক্ত বাস করিতেছেন। বাড়ির সবই ভাঙ্গা,—রান্নাঘর, বারান্দা, পায়খানা, দরজা জানালা ভাঙ্গা, —ইহাই সেদিনকার বরাহনগরের মঠ। ভক্তদের অত্যন্ত দীনাবস্থা, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। স্বামী শিবানন্দের জীবনী হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। "সকলে মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে কিছু চাল আনত। তাহা একটা হাণ্ডাতে সিদ্ধ করা হ'ত, আর নুন লঙ্কা আর একটা হাঁড়িতে সিদ্ধ করা হ'ত। কখন কখন তাতে তেলাকুচার পাতাও কুচিয়ে দেওয়া হ'ত। এই হল ভাত, আর এই হল তরকারী। তারপর সেই ভাতগুলো একটা কাপড়ে ঢেলে সকলে চারিদিকে ঘিরে বস্‌ত এবং সেই লঙ্কাজলের একটা বাটি ভাতের গাদার উপর থাকৃত। একবার করে ভাত মুখে দিত, আর একবার লঙ্কার জল মুখে দিত। জিভটা জ্বলে উঠ্‌লে ভাতটা নেমে যেত।

আর জল খাবার জন্য একটা মাত্র পিতলের হিন্দুস্থানী ঘটী।....নরেন্দ্রনাথ, রাখাল মহারাজ, তারকদা প্রভৃতি সকলেই আবশ্যকমত হাণ্ডা ও কড়াগুলি মেজে নিতেন এবং ফেলবার জল মাঠের পুকুর থেকে তুলতেন।...রাত্রে গায়ের লেপ কম্বল কিছুই ছিল না। যে যার শিয়রে চ্যাটাইয়ের নীচে একখানা করে ইট দিয়ে মাথা উঁচু করে রাখ্‌তো, এই হ'ল বালিশ, আর এই হল বিছানা। প্রথমে সকলের এক একখানা ক'রে কাপড় ছিল।...তারপর কাপড় দু-টুক্‌রা করে বহির্ব্বাস ও কৌপীন হল। ক্রমে বহির্ব্বাস, কৌপীন ছিঁড়ে গেল।...প্রথম প্রথম সকলকে উলঙ্গ দেখে একটু লজ্জিত হ'তাম, কিন্তু সকলকেই উলঙ্গ দেখে দেখে আর বিশেষ কিছু সঙ্কোচভাব রইল না।" অথচ এই উলঙ্গ, অর্দ্ধভোজী, ভূমিশায়ী সন্ন্যাসীগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিত, অধিকাংশই উচ্চবংশসম্ভূত, তথাপি এই স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ও কঠোর সাধনা। শ্রীগুরুদেবকে হারাইয়া ভক্তগণের পার্থিব জীবনের এই এক চিত্র!

কিন্তু এই চিত্রের আর একটা দিক্ ছিল, যাহা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য পূর্ব্বের বর্ণনাটি বিশদ্‌ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এত দুঃখদৈন্য সত্ত্বেও সকলের "মুখে সব সময় হাসি।" বিরক্তির কোন চিহ্ন নাই। খাওয়া দাওয়া ও কাপড়ের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই; মাঝে মাঝে হাসি-তামাসা ও ব্যঙ্গ।....রুটী সেঁকা ও রান্নাঘরে গিয়ে জড় হওয়া বড় আনন্দের জিনিষ ছিল। সে ভারি এক স্ফূর্ত্তির ব্যাপার। তরকারী যাই হক্ না কেন,—গরম রুটী, নুন, লঙ্কা আর সৎচর্চ্চা ও মাঝে মাঝে খুব হাসি-তামাসা। মোট কথা এই কঠোর সাধনা, অনাহার ও অনিদ্রা কাহারও মনে কোন কষ্ট বা দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ হইত না। একটা আনন্দ ও হাসি তামাসার ভিতর দিয়া যেন সমস্ত জীবনস্রোত চলিত। গোম্‌ড়া মুখ, বিষণ্ণভাব, রুক্ষভাব,—এ সব কিছুই ছিল না। হাতুস্ত কৌকের ভিতর দিয়া মহাকঠোর ও

দুঃসাধ্য সাধনা চলিয়াছিল। এই জন্য এই কঠোর সাধনা কেহ কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই।”

লেখক বলিয়াছেন,—“হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়া মহাকঠোর ও দুঃসাধ্য সাধনা চলিয়াছিল”, কিন্তু এত দৈন্য ও কষ্টের ভিতর হাস্য-কৌতুক কোথা হইতে আসিত? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অপূর্ব্ব হাস্যরস অনুশীলন করিতে হইবে, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের উপর ঠাকুরের উজ্জ্বল ও মধুর হাসি কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কি করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে শিষ্যগণ এই হাসিরাশি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

বেশী আর কিছুই ঠাকুর ব্যবহার করিতেন না। ইহা ভাষার কার্পণ্য অথবা দীনতা নহে, ইহা ভাষার মিতব্যয়িতা। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে চেষ্টা পরিত্যাগ করা হইল।

উচ্চশ্রেণির গদ্যসাহিত্যের তৃতীয় প্রধান গুণ হইতেছে ইহার চিরন্তন আনন্দপ্রদান করিবার শক্তি। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের দাবী অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী অপেক্ষাও অধিক। যে চিন্তাধারা তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে ভাষায় তাঁহার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সে ভাব ও ভাষা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নহে। একদিন যেমন মহামহোপাধ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেইরূপ নিরক্ষর দক্ষিণেশ্বরবাসী রসিক ম্যাথরও তাহার কর্ম্ম ভুলিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিল। তরল হাসিতে হয়ত কখনও ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, কখনও বা গভীর ধর্ম্মানুভূতিগুলি শুনিবার জন্য মানুষের মতই ঘরের বাতাস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার হাসিতে যে আনন্দ ছিল, গম্ভীর ধর্ম্মালোচনাতেও সেই আনন্দ ছিল; কারণ তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল মানুষের চির আনন্দের ধন, জীবনের একমাত্র সম্বল। সে কণ্ঠ আজ নীরব, সে অভিব্যক্তি আজ নাই, তথাপি তাঁহার সেই উদারবাক্যরাশি আজিও পাঠক বারংবার পড়িতেছে, কিছু দিন পরে পরে আবার পড়িতেছে, সুখের দিনে পড়িতেছে, দুঃখের দিনে পড়িতেছে। এই যে চিরন্তন আনন্দ দিবার শক্তি ইহা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের একটী প্রধান লক্ষণ। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক বই নাম করা যায় যেগুলি প্রকাশের সময় হয়ত পাঠকসমাজে একটা হৈ-চৈ-এর সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আজ পড়া দূরের কথা অনেকে তাহাদের নামও ভুলিয়া গিয়াছেন। বারংবার পড়িয়া যে জিনিষে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সাহিত্যশ্রেণিবাচ্য,—এমনকি মানুষের চিঠিও এই

গুণের জন্য সাহিত্য বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। ইংরাজ কবি কুপার এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী এই বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই আনন্দ দিবার শক্তি আবার গতিশীল এবং বৃদ্ধিশীল,—বারংবার পড়িতে ইচ্ছাও হয়, বারংবার পড়িলে নূতন নূতন দিক্ চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া যায়। "As you grow older you find more in them than you found at first" (আমাদের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা একই সাহিত্য পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর অধিক আনন্দ অনুভব করি)। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য অপূর্ব্ব। অনেক গ্রন্থ হয়ত বারংবার পড়িতে ইচ্ছা হয় না, ভালবাসা, দেশপ্রেম, সমাজ-সংস্কারের চিত্র এক সময়ে বেশ ভাল লাগিয়াছিল কিন্তু আর এখন ভাল লাগে না, আর ছুঁইতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাধারা পুরাতন হয় না, ইহা চির নবীন, চিরনূতন, যত পড়া যায় ততই শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। মানুষ যতদিন পুরাতন না হইবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাও ততদিন পুরাতন হইবে না, মানুষ যতদিন পশুর উর্দ্ধে থাকিবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাসাহিত্যও ততদিন তাহার ভাল লাগিবে। ইহা সাহিত্যের একটী প্রধান গুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের রচনারীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে বস্তুবাচক শব্দের ব্যবহার। ভাষার মধ্যে যতই বস্তুবাচক কথা ও চিত্র ব্যবহার করা যায় রচনাপদ্ধতি ততই সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। রচনার এই গুণ গ্রীক সাহিত্যের একটী বিশেষ কৌশল ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলকে "The greatest monument of English prose" (ইংরাজি গদ্যসাহিত্যে সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ) বলা হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ইহার মধ্যে গুণবাচক (abstract) শব্দ অপেক্ষা বস্তুবাচক শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাহার জন্য চিন্তাধারা সহজভাবে চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

"The first virtue, the touchstone of a masculine style, is its use of the Concrete noun." (শক্তিশালী রচনাশিল্পের প্রধান ধর্ম্ম বস্তুবাচক বিশেষ্যপদ ব্যবহার করা)। শ্রীরামকৃষ্ণও জানিতেন যে ধর্ম্মের কথাগুলি সাধারণ ভাবে বলিলে মানুষ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, তখনকার মত শুনিলেও মনে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তাই গভীর সত্যগুলিকে তিনি বস্তুবাচক ভাষার পরিচ্ছদে সাজাইয়া মানুষকে দেখাইতেন এবং তখন সহজেই সেই সত্যগুলি মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ তখন অর্থকষ্ট পাইতেছেন, সংসারে সর্ব্বদাই অনটন। ঠাকুর সেই কথা বলিবার সময় "দারিদ্র্য' কথাটী ব্যবহার করিলেন না। 'নরেন্দ্র দরিদ্র হইয়াছে' তাহাও বলিলেন না; শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "তার তো কলাপোড়া খাবার নূন নেই।" কথাগুলি গ্রাম্য কিন্তু সজীব চিত্রবিশিষ্ট, সুতরাং শ্রোতার মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিল। পূর্ব্বজন্ম এবং ইহজন্মের সংস্কারের প্রভাব বর্ণনা করিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "আগেকার সংস্কার যায় না।" পরক্ষণেই ঠাকুর দেখিলেন যে শ্রোতৃগণ জিনিষটা ভাল বুঝিতে পারিল না, তখন বাস্তব চিত্র আঁকিয়া জিনিষটা সহজে বুঝাইয়া দিলেন। "এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে, একটা স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কর্চ্ছে, একজন আড়চোখে চেয়ে দেখ্‌লে। সে তিনটী ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।" 'আড়চোখে' কথাটী পুরাতন সংস্কার এবং বর্ত্তমান সাধনার মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব, এবং পুরাতন সংস্কারের সাময়িক বিজয়চিত্র, শ্রোতার মনের সম্মুখে আঁকিয়াছিল, সাধু চেষ্টা করিয়াও সংস্কারের হাত সহজে এড়াইতে পারিতেছে না, তাহাও বুঝা যাইল। শ্রীরামকৃষ্ণ 'কূটস্থবুদ্ধি' বুঝাইবার সময় বলিলেন—"হাজার দুঃখ কষ্ট বিপদ বিঘ্ন হোক্—নির্ব্বিকার।" শ্রোতৃগণ তাকাইলেন, চোখে যেন শূন্য দৃষ্টি। ঠাকুর তখনই বলিলেন "যেমন কামারশালের নেয়াই, হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু

নির্ব্বিকার।" চিত্রটী দেখা গেল এবং ভাবটী মনের নিকট পরিষ্কার হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।" তখনই নরেন্দ্রনাথের একাধারে রূপ ও গুণের ঐশ্বর্য্য শ্রোতাগণ হৃদয়ঙ্গম করিল। গীতায় বর্ণিত

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ

—এইরূপ মনের অবস্থা বুঝাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 'কাঁচা আমি' কথাগুলি ব্যবহার করিলেন। আবার গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ের শেষভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, অর্জ্জুন বলিতেছেন

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত,
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।

—অর্জ্জুনের এই শাস্ত্রসম্মত শ্রীকৃষ্ণানুমোদিত মনোভাব বুঝাইবার জন্য ঠাকুর বলিলেন এই "পাকা আমি," "দাস আমি"। এইরূপ দুরূহ ধর্ম্মভাব বুঝাইবার জন্য বস্তুবাচক শব্দপ্রয়োগের অসংখ্য উদাহরণ আছে। শাস্ত্রীয় কথাগুলি ব্যবহারের সময়ও ঠাকুরের বস্তুবাচক শব্দের প্রতি আকর্ষণ বুঝা যাইত। যোগী নাদবিন্দু ভেদ করিয়া যখন সহস্রারে উপস্থিত হন তখন তিনি প্রণব ধ্বনি শ্রবণ করেন,—ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ "দীর্ঘ-ঘণ্টানিনাদবৎ" কথাগুলি ব্যবহার করিলেন, কুলকুণ্ডলিনী তিনটী সংযুক্ত বলয়ের মত মূলাধারে মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছেন, যোগী তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য যোগসাধনা করিতেছেন,—ইহা বুঝাইবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ

কুলকুণ্ডলিনীকে "প্রসুপ্তভুজগাকারা" বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এই সমস্ত ভাষা তাঁহার নিজের গড়া নহে, সমস্তই শাস্ত্র ও সাধনপুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি এই কথাগুলির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের বস্তুবাচক শব্দের প্রতি প্রীতি সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কবিসুলভ কল্পনাশক্তি ছিল যাহার সহায়তায় তিনি কথার যোগাযোগ স্থাপন করিয়া নূতন সজীবচিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। এই কথাসৃজনশক্তি, এই চিত্রঅঙ্কনশক্তি, প্রকৃতপক্ষে কবির সাধনার জিনিষ—এই জন্যই অনেক সময় কবিতাকে "Speaking Painting"—কথা-কহা চিত্র—বলা হইয়া থাকে। একদিন একজন পেশাদার কীর্ত্তন-কারীর গান শ্রুতিমধুর না হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "ওদের যেন ডোঙ্গা-ঠ্যালা গান।' 'ডোঙ্গা-ঠ্যালা গান'—ইহা ভাষার অদ্ভুত সৃষ্টি। কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে একটা চিত্র শ্রোতাগণের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। একসঙ্গে কতকগুলি লোক কর্দ্দমাক্ত অগভীর জলের ভিতর দিয়া ডোঙ্গা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, পরিশ্রমে ক্লান্ত শরীরে অঙ্গসঞ্চালনের কোন সৌষ্ঠব নাই, পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য বিকৃতমুখে বিকৃতকণ্ঠে গান ধরিয়াছে, সে গানে না আছে সুর, না আছে তাল, আছে কেবলমাত্র গলাভাঙ্গা চীৎকার। ইহাই হইল "ডোঙ্গা-ঠ্যালা গান।" বেচারী কীর্ত্তনকারীগণ তখন উপস্থিত ছিল না, কিন্তু পরোক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদত্ত এই সার্টিফিকেট তাঁহাদের অন্য স্থানে গান গাহিয়া উপার্জ্জনের পথে যে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী একত্র পানিহাটীর উৎসবে যাইলে হয়ত লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত—"হংসহংসী এসেছে।" 'হংসহংসী' কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজেরই সৃষ্টি, সাধারণ লোকে হয়ত বিদ্রূপ করিতে পারিত কিন্তু এমন শ্রুতিমধুর, রসব্যঞ্জক শব্দ সহসা খুঁজিয়া পাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। অনুরূপ ভাব প্রকাশের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "দারী সন্ন্যাসী"

কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন, ঠাকুর সাধারণ চলিত ভাষা "স্বামীস্ত্রী" অথবা শ্রীচৈতন্যের ভাষা "দারী সন্ন্যাসী" ব্যবহার করিলেন না, "হংসহংসী" কথাগুলি সৃষ্টি করিয়া কৌতুকচিত্র অঙ্কন করিলেন। গ্রীবার অপূর্ব্বভঙ্গী-সহ, গম্ভীর পদবিক্ষেপে পাশাপাশি ভোগী সন্ন্যাসী ও তদীয় নর্ম্মসহচরী আসিতেছেন, বাহিরে সন্ন্যাসীর ঠাট, ভিতরে প্রচ্ছন্ন বিষয়লালসা,—ইহাই "হংসহংসী"র অপূর্ব্ব ব্যঙ্গচিত্র। "মার্কামারা সাধু" শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটী কথা-চিত্র। চতুর্দ্দিকে মালা ও চন্দনের ছাপে কণ্টকিতদেহ সাধু চলিয়াছেন, রাস্তার ধারে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে, সকলেই তাকাইয়া দেখিতেছে, সাধু বক্রদৃষ্টিতে সমস্ত দৃশ্যটা উপভোগ করিতেছেন, প্রতি পদবিক্ষেপের সহিত প্রশংসার বীভৎস ক্ষুধা কিছু কিছু প্রশমিত হইতেছে, সাধু অন্তঃসার শূন্য, হয়ত বা বিষয় ভোগলোলুপ। বাহিরে বড় বড় মার্কা আছে, ভিতরে পচা-মাল বোঝাই। অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ লোককে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কুমড়োকাটা বড় ঠাকুর" বলিতেন। এই কথাগুলিও একটী সজীব চিত্র। বাড়িতে অনবরত বেকার বসিয়া আছে, সংসার পালনের জন্য কোন চেষ্টা নাই, সাধনভজনে মন লাগে না, বাহিরের ঘরে স্যাঁৎসেঁতে মেজের উপর উবু হইয়া বসিয়া অনবরত তামাক সাজিতেছে ও টানিতেছে, বয়স হইয়াছে, উদর ঈষৎ স্ফীত, দেহ মাংসল অথচ শিথিল, আত্মসম্মানবোধ রহিত একজন লোক; *অর্থাৎ নামেই পুরুষ মানুষ, সংসারক্ষেত্রে বুদ্ধিহীন চলমান মাংসপিণ্ড মাত্র। ইহাই "কুমড়োকাটা বড় ঠাকুরের" সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা। পেশাদার ইষ্টমন্ত্রদাতাগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ "গুরুগিরি" কথা ব্যবহার করিতেন। কথাটীর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নাই, সাধনভজন নাই, অথচ ধর্ম্মোপদেশ দিবার ধৃষ্টতা আছে, শিষ্যের নিকট মর্কটবৈরাগ্য, ভিতরে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি;

---

*মেয়েদের কুমড়ো কাটিতে নাই, তাই সময় সময় অন্তঃপুর হইতে কুমড়ো কাটিবার জন্য ডাক আসে এবং এই ডাক পালন করাই ইঁহার পুরুষত্বের একমাত্র সার্থকতা।

নিজ বৃহৎ সংসারে বহু পুত্র কন্যা, অর্থ-সাচ্ছল্যের লোভে শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত; নিজেই সংসার তাপে দগ্ধ অথচ শিষ্যকে পরাশান্তি প্রদানের মিথ্যা আশ্বাস,—ইহাই "গুরুগিরির" প্রকৃত চিত্র। ইহার ফল কি হয় তাহাও ঠাকুর বলিয়াছেন,—'হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য'। এইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণসৃজিত ও শ্রীরামকৃষ্ণব্যবহৃত আরও অনেক কথা আছে, যেগুলি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, ঘৃণা ও হাস্যের সংমিশ্রণে বাঙ্গালা ভাষাকে নূতন নূতন রূপ দিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি সম্প্রসারিত করিয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ভাষার সরসতা, শব্দবিন্যাস ও ধ্বনিসঙ্গীতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এই যৌগিক কথাগুলি সহজেই মনে থাকিত, একবার শুনিলে বারংবার মনে পড়িত, মানুষের কল্পনাকে জাগ্রত করিয়া চিত্র সম্পূর্ণ করিতে প্রণোদিত করিত। সাহিত্যরথীগণের রচনারীতির ইহা একটী প্রধান ধর্ম্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনাকৌশল তাঁহার সাহিত্যরসসৃষ্টির আর একটী প্রধান উপাদান। ছোট ছোট কয়েকটী কথায় একটা জীবনের সমগ্র ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সবাক্‌চিত্রের মত ঘটনাবলী চক্ষের সম্মুখ দিয়া একের পর এক চলিয়াছে, পাঠক আগ্রহবিস্ময়ে তাহা দেখিতেছে, হয়ত নিজের জীবনের সঙ্গেও মিলাইয়া লইতেছে। ঠাকুর বলিলেন "বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তা'হলে হয় আবোল তাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে, আমি চুপ করে থাক্‌তে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।" এই বর্ণনার ভিতর দিয়া আলস্যপরায়ণ বেকার সংসারী জীবনের সমস্ত দিনের একটা কার্য্যতালিকা পাওয়া যাইল। "আবোল তাবোল ফাল্‌তো",—এই কথাগুলি নিজেরাই বিশৃঙ্খল, তাহারা বিশৃঙ্খল উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের চিত্র নিপুণভাবে আঁকিয়া দিতেছে। "মিছে কাজ" লইয়াই বদ্ধজীব ব্যস্ত;— কাজের মত কোন কাজে হাত দিতে গেলেই পরিশ্রম করিতে হয়,

মনঃসংযোগ করিতে হয়, কিন্তু আয়াসী জীবনে তাহা রুচিকর হয় না। তাসখেলা সব যুগেই আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে অলস ভদ্রলোকের সময় কাটাইবার ইহাই প্রধান উপায় ছিল।—হয় বৈঠকখানায় বসিয়া এলোমেলো, মাথামুণ্ডবিহীন গল্প, নতুবা তাসখেলার নেশা। এইরূপ আটপৌরে কুড়েমির একটা বিশদচিত্র ঠাকুরের কয়েকটী বাছা বাছা কথার মধ্যে পাওয়া গেল। সংসারীজীবের দুঃখময় জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা করিয়াছেন। জীব দুঃখের ভিতরেই সুখ খুঁজিতেছে, বারংবার একই দুঃখের কারণের বশীভূত হইতেছে।—"সংসারী লোক এত শোকতাপ পায় তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হ'লো,—তবু আবার বিয়ে ক'রবে। ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পর্‌লো। এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়েছেলেও হয়। মোকদ্দমা করে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।" ইহা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের চিরন্তন চিত্র,—শ্রীরামকৃষ্ণের সময়ে ইহাই ঘটিত, আজ সত্তর বৎসর পরেও ইহাই ঘটিতেছে। সংসারে যে কয়টি উপদ্রব আসিলে মানুষ ক্রমশঃ বিব্রত ও দৈন্যগ্রস্ত হইয়া পড়ে,—স্ত্রীবিয়োগ, মেয়ের বিবাহ, মকর্দ্দমা, বছর বছর ছেলে হওয়া,—এই সব কারণগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণ একের পর এক বর্ণনা করিয়াছেন। ছেলের মৃত্যুর সময় মাতার করুণ বিলাপ, আবার কিছুদিন পরে তাহারই অলঙ্কারবিলাস! মাতার চরিত্রের বিপরীতধর্ম্মী এই দুইটি প্রবৃত্তি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহা যেন সাধারণ সংসারী জীবনের একটা নিত্য ইতিহাস,—খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলি শিল্পীর ভাষায় অখণ্ড চিত্রে পরিণত হইয়াছে। আর একটী

বর্ণনা। ইংরাজি মহাজনী আপিষে চাকুরীকরা অনেক শিক্ষিত বাবু সে যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতেন। ঠাকুর একদিন বলিলেন—"আর দেখ, অত পাশকরা, কত ইংরাজিপড়া পণ্ডিত. মনিবের চাক্‌রী স্বীকার ক'রে, তাদের বুটজুতোর গোঁজা দুবেলা খায়।" সে যুগে মহাজনী আপিষের অর্দ্ধশিক্ষিত বড় সাহেব মানুষকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিত না, বিশেষ করিয়া "কালা আদ্‌মীকে" ঘৃণার চক্ষে দেখিত। একদিকে ইংরাজীপড়া পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে বুটজুতা! শ্রীরামকৃষ্ণ 'সাহেব' কথাটি ব্যবহার করিলেন না, সাহেবের যে অঙ্গের যে বস্তুর সহিত এই শিক্ষিত কেরাণীদের নিত্য সংযোগ, কেবলমাত্র সেই 'বুটজুতা' কথাটী উল্লেখ করিয়া মনিব ও কেরাণীর সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিলেন। সে যুগের মহাজনী আপিষে এইরূপ ঘটনা সত্য সত্যই ঘটিত, এমন কি পীলেফাটার কথাও প্রায়ই শুনা যাইত, ক্বচিৎ কখনও বড়সাহেবের ২।১০ টাকা জরিমানাও হইত। ঠাকুরের কয়েকটি কথাতেই সেই কেরাণী-জীবনের অবমাননা ও নির্য্যাতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপণস্বভাব ধনীলোকের চরিত্র ও জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। "এক এক জন টাকা থাক্‌লেও হিসেবী হয়,—টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক্ নেই। সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙ্গা লণ্ঠন; ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া; হাসপাতাল ফেরৎ দরোয়ান; আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।" কি অপূর্ব্ব বর্ণনা, শব্দসংযোগ ও নিখুঁত চিত্র! কৃপণের পারিবারিক জীবন এবং তাহার চরিত্রের নিভৃততম প্রদেশ পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরা পড়িয়া গেল। 'ভাঙ্গা', 'ভাগাড়', 'হাঁসপাতাল', 'পচা,'—এই কথাগুলি নিজেরাই এক একটি চিত্র। ইহা ব্যতীত সমগ্র বাক্যসমষ্টির মধ্যে যে একটী গদ্যছন্দ রহিয়াছে,—ইংরাজিতে যাহাকে Cadenced prose বলে,—তাহাও বর্ণনাটীকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ

অনেক উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণকথাসাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ইহাই বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট অবদান। যে বাঙ্গালা ভাষা এখন বিংশ-শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বাঙ্গালাদেশের পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ সাহিত্যরচনায় দেখা যাইতেছে তাহার প্রথম স্থচনা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়া হইয়াছিল। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন তখন বাঙ্গালাভাষায় দুইটি পৃথক্ বিভাগ ছিল,—একটি আটপৌরে ভাষা, অন্যটি পোষাকী। গদ্যে গভীর ভাব প্রকাশ করিতে হইলেই পোষাকী বাঙ্গালা ব্যবহার করিবার রীতি ছিল, কবিতা-ক্ষেত্রে পোষাকী ভাষার একচ্ছত্র প্রভাব তো ছিলই। সাধারণ আটপৌরে বাঙ্গালায় কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে গদ্যরচনার বিষয়বস্তু ছিল হাল্‌কা, সুতরাং হাল্‌কা চলিত ভাষা তাহার উপযুক্ত বাহন বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু গম্ভীর ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ, মানবজীবনের নিগূঢ় অনুভূতি, সমাজের চিরন্তন সমস্যা প্রকাশ করিতে হইলে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করা লোকে সুশোভন মনে করিত না, ভাষাকে পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া একটা বিশিষ্ট রূপ প্রদান করিবার প্রয়োজন হইত। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথম দেখাইলেন যে অতি গভীর ধর্ম্মচিন্তাগুলিকেও সাধারণ ভাষায় সুষ্ঠুভাবে, শুদ্ধভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাষাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় "গৃহস্থপাড়ার ভাষা" আখ্যা দিতে পারি। ঠাকুরের যে মৌলিক প্রতিভা তখনকার দিনের এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিল সে প্রতিভা সকলের না থাকিলেও এখন জিনিষটা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একজন পথ দেখাইয়াছেন, অপর সকলে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। তাই বিংশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান সময়ে আমরা অসংখ্য নভেল, নাটক, এমনকি কবিতার ভিতরেও এই "গৃহস্থপাড়ার ভাষাকে"

বাহনরূপে দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঋণী। ক্রমে ক্রমে পদ্য সাহিত্যের ভিতরেও ভাষার এই পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতেছে, কাব্যমহিষীর ছন্দের অবগুণ্ঠনও আজকাল বারংবার খসিয়া পড়িতেছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে কাব্যজগতে প্রথম পথপ্রদর্শক। ভাষা ও ছন্দের "সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন" দূর করিয়া গদ্যের স্বাধীন-ক্ষেত্রে কবিতার সহজ ও স্বাভাবিক সঞ্চরণ দেখাইবার জন্য যখন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে "কোপাই" নামক একটী কবিতা রচনা করেন তখন তাহার সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের কথা পাঠকসমাজ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। রবীন্দ্রনাথ 'কোপাই'-শীর্ষক কবিতার মধ্যে সাধুভাষাকে 'পদ্মা' নদীর সহিত এবং চলিতভাষাকে 'কোপাই' নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

"পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে!

... ...

পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে

একদিকে নির্জ্জন পর্ব্বতের স্মৃতি, আর একদিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।"

এই আভিজাত্য গর্ব্বিতা পদ্মাকে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে দেখিয়াছিলেন; যৌবনের শেষে দেখিলেন নিরাভরণা কোপাই নদীকে।

"এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।

প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
... ...
ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
... ...
ছিপ্ছিপে ওর দেহটা
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোর
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
... ...
কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী ক'রে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।"

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এই 'কোপাই' কবিতার ভিতর দিয়া এমন একটি "গৃহস্থপাড়ার ভাষার" সন্ধান পাইলেন যে ভাষায় গোত্রের গরিমা না থাকিলেও কলহাস্যমুখর গতিবেগ আছে, পুঞ্জিত সবুজের স্নিগ্ধতা আছে, স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতের মধুর সঙ্গীত আছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে খুঁজে-পাওয়া এই গৃহস্থপাড়ার ভাষাই শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের নব ধর্ম্মসাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র বাহন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণকে বাঙ্গালাদেশ তথা ভারতবর্ষ ধর্ম্মগুরু বলিয়াই জানে, তাঁহার অসাধারণ সাধনভজন, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মপ্রচারই জগতে সুপরিচিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসাবেও তাঁহার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। তিনি যদি ধর্ম্মজগতে উচ্চস্থান অধিকার নাও করিতেন, ধর্ম্মপ্রচারই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ নাও করিতেন তথাপি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উৎকর্ষ তাঁহাকে মানবসমাজে বিশিষ্ট স্থান প্রদান করিত। যে সমস্ত গুণ থাকিলে মানুষ সাধারণতঃ মহৎ হয় তাহার সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার চরিত্রের সেই বিস্মৃত দিকটি আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিতে যাইলে প্রথমেই তাঁহার সর্ব্বতত্ত্ব-ভেদিনী বুদ্ধিবৃত্তির কথা আসিয়া পড়ে। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই; শাস্ত্র পড়িবার উপযোগী বিদ্যা তাঁহার ছিল না, অথচ লোকমুখে শুনিয়া শুনিয়া সাধনজীবনের প্রারম্ভে এবং মধ্যস্থলে তিনি পণ্ডিতের মতই শাস্ত্রজ্ঞান অধিকার করিয়াছিলেন। মুখে মুখে শুনিয়া শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে হইলে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন হয়; মনের ভিতর শাস্ত্রজ্ঞান পরিপাক করিয়া নিজস্ব করিবার জন্য ক্ষুরধারের মত বুদ্ধিরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। বুদ্ধি বহুরূপী,—স্মরণশক্তি তাহার একটী বিশিষ্ট রূপ। এই স্মরণশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটী পরিলক্ষনীয় বস্তু। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের জটিল ভক্তিতত্ত্বের কথা, বেদান্তের নিগূঢ় রহস্যগুলি, গীতার শ্রেষ্ঠ সত্যগুলি ঠিক্ শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করিতে অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা যাইত। সমালোচনা করার শক্তিও প্রধানতঃ

বুদ্ধি-প্রসূত। এই সমালোচনাশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। একজন বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবীচৌধুরাণী" স্থানে স্থানে পড়িয়া শুনাইতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে তাহার বিশ্লেষণ করিতেছেন,—সমালোচনা যেন গ্রন্থের মর্ম্মস্থল চিত্রিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে। বুদ্ধির আর একটা দিক্ আছে, যাহাকে ইংরাজিতে alert brain—মনের সতর্কতা—বলে। নিজের জানা কথাগুলি ঠিক্ প্রয়োজনমত, অবস্থামত মনে আনা এবং তাহা প্রয়োগ করিবার শক্তি সকল বুদ্ধিমান লোকের থাকে না। যে সময় কথাটা বলা উচিত ছিল, প্রয়োজন ছিল, সে সময় মনে পড়িল না, হয়ত ২।৪ ঘণ্টা পরে মনে হইল এই কথাটা বলিলে ঠিক্ হইত। মনের জাগ্রত অবস্থা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসাপেক্ষ। নতুবা কার্য্য কালে উপস্থিত না হইলে—ন সা বিদ্যা, ন তৎ ধনং,—যেন গুরু-শাপমলিন কর্ণের শস্ত্রবিদ্যা। এই উপস্থিতবুদ্ধি, জাগ্রত মন মানুষের সমস্ত অবস্থার উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন,—ইহা না থাকিলে বড় উকিল, বড় ডাক্তার, বড় অধ্যাপক, বড় বক্তা, বড় ধর্ম্মপ্রচারক কিছুই হওয়া যায় না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাইত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়োজন মত হাসির গল্প সৃষ্টি করিতেছেন, যেমন ক্ষেত্র, যেমন অবস্থা ঠিক্ অনুরূপ হাসির কথা অনর্গল তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে। শাস্ত্রসিন্ধু কেবলমাত্র শ্রবণ মননের দ্বারা মন্থন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে সমস্ত সারকথা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও প্রয়োজন মত উল্লেখ করিয়া শ্রোতার সম্মুখে ধরিয়া দিতে পারিতেন। কেবলমাত্র একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই।" এই কথা বলিয়া ঠাকুর ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে তৎক্ষণাৎ উদাহরণ দিতে লাগিলেন। "ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার

জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই।" অনর্গল, সহজভাবে স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে এতগুলি উদাহরণ বাহির হইল, ভাবিতে হইল না, থামিতে হইল না, কোনটী বাদ পড়িল না। এরূপ স্মরণশক্তি ও মনের সতর্ক অবস্থা অনেক সুপণ্ডিতের মধ্যেও সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের যে স্বাধীন, সবল ও নির্ভীক মন ছিল তাহা বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বড়লোকের তোষামোদ, সর্ব্ববিধ দাসত্ব, নিছক্ অদৃষ্টবাদী দুর্ব্বল মন শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে। উভয়েই যেন বাঙ্গালাদেশের মানুষই ছিলেন না। এদেশের লোক অন্নসংস্থান করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও বিবাহ করে; বিবাহ করিলেই বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে; মনের সংযম বলিয়া কোন জিনিষ ইহাদের নাই, পরের দাসত্ব করার লজ্জা ও দীনতা ইহারা মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিতে পারে না। এই সমস্ত মানুষের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া ঠাকুর বলিতেন—"এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর মেয়ে হবে; মকর্দ্দমা করে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মকর্দ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভালঘরে রাখ্‌তে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়। বলে, কি ক'র্‌বো, অদৃষ্টে ছিল।" এ যেন বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর কোন সমাজ-সংস্কারক ইউরোপীয় পণ্ডিতের কথা! আবার চাকুরীকরা মনোবৃত্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘৃণা করিতেন। এই যে সেবাবৃত্তি যাহাকে শ্ব-বৃত্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যাহাকে ঠাকুর বলিতেন "জুতার গোঁজা খাওয়া",—সেই বৃত্তি অশেষবিধ দোষের আকর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "এমনি আছে যে, বার বছর না কত ঐ রকম দাসত্ব কর্ল্লে তাদের সত্তা হয়ে যায়। তাদের রজঃ তম গুণ, জীবহিংসা, বিলাস এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা কর্‌তে কর্‌তে। শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনসান খায়।" একবার

দাসখৎ লিখাইলে, ইহ জীবনে আর শেষ নাই,—'আবার পেনসান্ খায়।' পূর্ব্বে রোমনগরীতে ক্রীতদাসগুলিকে চিনিবার জন্য তাহাদের একরকম পোষাক দেওয়া হইত; সে পোষাক ছিল বাহিরের; কিন্তু সেবাবৃত্তির দ্বারা যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদের মনের পোষাক পেনসান-রূপে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, চাকুরীর অবসান হইলেও মনের হারান স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যায় না। *শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে বড়ই স্নেহ করিতেন। একবার নিরঞ্জন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "দেখ্ তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে।...সংসারী লোকেরা যেমন চাক্‌রি করে তুইও চাক্‌রি কর্‌ছিস; তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাক্‌রি স্বীকার করেছিস্। মা, গুরুজন ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ্ ছেলের জন্য চাক্‌রি ক'ত্তিস, আমি বলতুম, ধিক্ ধিক্। শত ধিক্। একশো ছিঃ।" দাসবৃত্তির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের এতই ঘৃণা ছিল। ঠাকুরের স্বাধীন চরিত্র কোন ধনী অথবা প্রবল লোকের অপেক্ষা রাখিত না, তিনি একদিকে যেমন অতি দীন দরিদ্রের প্রতিও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন তেমনই ধনী অথবা প্রভুত্ব সম্পন্ন লোকের কোন ধৃষ্টতা অথবা অহঙ্কার সহ্য করিতেন না, অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদ জানাইতেন। হয়ত ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সাময়িক অসুবিধা বা ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু সে সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা তাঁহাকে নির্ভীক মতপ্রকাশ হইতে বিরত করিতে পারিত না। একদিন ভক্ত মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন—"তুমি বড় লোক বলে মনে ক'র না তোমার খোষামোদ কর্ব্ব।" আর একদিনের কথা। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ,

*কাশী প্রবাসী কোন কোন পেনসানভোগী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে অপরাহ্নকালে কাশীর গঙ্গাতীরে বসিয়া পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচিত সাহেব প্রভুদের প্রশংসা করিতে অনেক সময় শুনা যাইয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

কথাশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা ও রচনারীতি বাঙ্গালা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার চরিত্রে ধর্ম্মের যে বহুমুখী উৎস নিহিত ছিল তাহার উপলব্ধি ও আলোচনামূলক বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব কথাশিল্প তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায়ক হইয়াছিল সেই শক্তিশালী কথাসাহিত্যের আলোচনা সম্যক্‌ভাবে করা দূরের কথা আংশিকভাবেও সাহিত্যরসিকগণ সে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা গদ্য ভাষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার ও রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী সমালোচকগণের উদাসীনতার প্রধান কারণ এই যে তিনি তাঁহার ভাব ও চিন্তাধারা হাতেকলমে লিপিবদ্ধ করেন নাই,—তাঁহার সমস্ত কথাই মুখের কথা। তিনি স্বহস্তে কিছুই লিখিয়া যান নাই,—তিনি ছিলেন 'মূর্খোত্তম'। কিন্তু কথা বলিবার শক্তি ও পুস্তক রচনার শক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দুই-ই এক হইয়া দেখা দিয়াছিল। মুখের কথা ছাপা না হইয়া মুখেমুখে বহুদিন প্রচলিত থাকিলেও যদি তাহার ভিতর সাহিত্যের সারবস্তু থাকে তাহা হইলে সেই কথাই সাহিত্যশ্রেণিবাচ্য হইয়া পড়ে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড্, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থগুলি লোকমুখে বহুদিন হইতে সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তখন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ না হইলেও সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য চিরদিনই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের

ভাষা ও ভাবের মধ্যে এমন সমস্ত উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় যে তখনকার যুগে ছাপা না হইলেও সাহিত্যের দিক্ হইতে ইহার মূল্য অপরিসীম। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক Quiller Couch বলিয়াছেন,—"Literature is a record of memorable speech" (স্মরণে রাখিবার উপযুক্ত কথাই সাহিত্য)—সে কথা মুখে মুখে চলিয়া আসিলেও সাহিত্য, ছাপা হইলে তো কথাই নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত ভাষা ও চিন্তাধারা, পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালী জাতির সৌভাগ্যক্রমে, কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত, মনোযোগী এবং পরিশ্রমী শিষ্যের স্মৃতিশক্তির সাহায্যে আলোকচিত্রের মত নিখুঁতভাবে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তদীয় ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ—বিশেষ করিয়া শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—তাঁহাদের কল্পনাশক্তির প্রভাবে বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী, কথোপকথন, মানবচরিত্র-অঙ্কন ও হাস্য-কৌতুকের ভিতর চিরন্তন সাহিত্যের সমস্ত উপাদান বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং ঠাকুরের কথাগুলির শুধু সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াই এই শিষ্যগণ ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার অপূর্ব্বভাষা, ভক্তি ও মনোযোগের দ্বারা যথাযথভাবে স্মরণ করিয়া, জগতের আনন্দ ও কল্যাণের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিজের কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, সময় ও অবস্থার কোন বর্ণনা না দিয়া কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধ কথাগুলি যদি সম্পূর্ণভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে চিরজীবী সাহিত্যের সমস্ত উপাদানই তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এই কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর হইতে বাহির হইবার সময় তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি, কণ্ঠের মাধুর্য্য, অঙ্গসঞ্চালন, ভাবতরঙ্গের হ্রাসবৃদ্ধি সহযোগে যে অপূর্ব্ব প্রভাব শ্রোতৃগণের মনের উপর বিস্তার করিত আজ সে প্রভাব অনুমানসাপেক্ষমাত্র। "Things heard are mightier than things read". (শোনাকথা পড়া-কথার চেয়ে মনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার

করে)—ইহা সমস্তক্ষেত্রেই দেখা যায়। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক আবৃত্ত হইতে শুনিয়াছেন তাঁহারা এই কথার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—সে কথা শ্রোতার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিত। লেখক যে কথা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বাহির করেন সে লেখার মর্য্যাদা পাঠকসমাজ সব যুগেই দিয়া আসিতেছে, অথচ সমভাবে সমৃদ্ধ হইলেও বলা-কথার মর্য্যাদা তাহার তুলনায় অনেক কম। ছাপা-কথার প্রতি এই যে মোহ তাহা সাহিত্যমোদী ইংরাজ জাতির মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক Gilbert Murray ইংরাজ জাতির এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"We have a tribal habit of confining our literary enjoyment to the written word". (ইংরাজ জাতির একটা দুর্ব্বলতা আছে,—আমরা লেখা-কথা ছাড়া সাহিত্য উপভোগ করি না)। বিদ্বান ইংরাজজাতিরই মধ্যে এই অবস্থা, আর যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত তাহাদের পক্ষে ছাপা-পুস্তককে একটা অস্বাভাবিক সম্মান দেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাক্-শিল্প ও ভাবধারা সমালোচনা করিবার সময় আমাদিগকে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হইবে কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের বলা-কথা উচ্চাঙ্গের ছাপা-কথার মতই মূল্যবান্—কেবলমাত্র ধর্ম্মভাবের দিক্ দিয়া নহে, শুদ্ধ সাহিত্য-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাও এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

উচ্চ ও চিরন্তন চিন্তাধারাই সাহিত্যের প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। মানুষ স্বভাবতঃই মননশীল এবং উচ্চচিন্তা তাহার মনকে সহজেই নাড়া দিয়া থাকে। লেখক নিজে যেমন ভাবিয়াছেন, ঠিক্ অনুরূপ চিন্তা পাঠকের মনে জাগাইতে পারিলে, পাঠকের মনকে আঘাতের দ্বারা সচেতন করিতে পারিলে সাহিত্যসেবীর উদ্দেশ্য সফল হয়। এইরূপ চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। "Great thoughts arise from

the heart and not from the head" (বড় বড় ভাবগুলি অন্তর হইতে আসে, বুদ্ধি হইতে আসে না)—বিখ্যাত ইংরাজ লেখক Bacon-এর এই কথাগুলি খাঁটি সত্য। কেবলমাত্র বুদ্ধির ঘাঁটাঘাঁটী হইতে সাহিত্য-পদবাচ্য চিন্তার উৎপত্তি হয় না ; অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না হইলে মন শান্ত হয় না এবং মন শান্ত না হইলে অনুভূতি হইতে পারে না। এই শান্ত মন, এই গভীর অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয় একমাত্র সাধকের, কিন্তু সাহিত্যিকেরও এই সাম্যাবস্থা অন্ততঃ তখনকার জন্য না আসিলে সাহিত্যসৃষ্টি হইতে পারে না। প্রশান্ত মন ও অনুভূতির শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অহরহ বিরাজ করিত ; সুতরাং সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে তাঁহার অবস্থা সর্ব্বদাই অনুকূল ছিল। এই mental precision অর্থাৎ মনের সাম্যাবস্থা না থাকিলে সাহিত্যসৃষ্টি দুরের কথা সাধারণ কথাও গুছাইয়া বলা যায় না। বর্ণনা-কৌশলও সাহিত্যসৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। অনেকে হয়ত কোন ঘটনার বর্ণনা করিতেছেন কিন্তু সমস্ত বর্ণনাটী এলোমেলো হইয়া যাইতেছে, শ্রোতার বুঝিতে অসুবিধা হইতেছে, কথাগুলি শ্রোতার মনে কোন গভীর রেখাপাত করিতেছে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে "a confused talker is never a clear thinker" (Llyod George) —অর্থাৎ যাহার পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি নাই তাহার কথাবার্ত্তা সব সময়েই এলোমেলো—নিজেরই সুস্পষ্ট চিন্তাধারা নাই, অপরকে সে কি করিয়া বুঝাইবে! স্বচ্ছ পরিষ্কার ভাষাও সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন। ভাষার স্বচ্ছতা বর্ত্তমান থাকিলেই মনের স্বচ্ছতাও সহজেই অনুমান করা যায়। সাহিত্যসৃষ্টির আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান আছে—ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য। যেমন ভাব ভাষাও ঠিক্ অনুরূপ,—এই ক্ষমতা না থাকিলে সাহিত্যশ্রেণিবাচ্য কথার সৃষ্টি হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলির মধ্যে সাহিত্যিকের এই গুণ সমূহ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল—উদার হৃদয়, প্রশান্ত মন, গাঢ় অনুভূতি, স্বচ্ছ ভাষা। আরও

ছিল ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব মিলন,—ভাষা প্রয়োজন বোধে কখনও লঘু কখনও গম্ভীর, অমার্জ্জিত সরস গ্রাম্যকথা কখনও বা ধর্ম্মশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের তেজস্বিনী সাধুভাষা। এই সমস্ত কারণে কেবলমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টির দিক্ হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে শ্রীরামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা গদ্য ভাষার ইতিহাসে এক বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

আর একটি কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রধানতঃ ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা by-product অর্থাৎ আনুষঙ্গিক মাত্র; এবিষয়েও কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে কল্পনাশক্তি, শিল্পকৌশল এবং ধর্ম্মানুভূতি সমভাবেই বর্ত্তমান ছিল। এক শ্রেণীর সমালোচকগণ মনে করেন ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিপরীত উদ্দেশ্যশীল, সুতরাং ধর্ম্ম-সাহিত্য বিপরীতবাচক শব্দ, ধর্ম্মের ভাব আসিলেই বিশুদ্ধ সাহিত্যরস নষ্ট হইয়া যায়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অনন্ত আনন্দের খনি ধর্ম্মকে বাদ দিলে সাহিত্যসৃষ্টির অঙ্গহানি হয়, সাহিত্য অনেক পরিমাণে পঙ্গু হইয়া যায়। একজন বিখ্যাত ইংরাজলেখক বলিয়াছেন—"That religion has constantly been the inspirer of art, and that art has often helped to the expression of religious feeling, suggests the inner connection between the two......Because of what it suggests rather than what it represents, art joins with religion in opening the vision to the Unseen." (অর্থাৎ ধর্ম্ম অনেক সময় ললিতকলা-সমূহকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে, আবার ললিতকলাসমূহের ভিতর দিয়া অনেক সময় ধর্ম্মের সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতেই ধর্ম্ম ও ললিতকলার মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ সহজেই বুঝা যায়। কলাসৃষ্টির বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন ইহার মধ্যে যে ইঙ্গিত থাকে ধর্ম্মের মধ্যেও

সেই ইঙ্গিত বর্ত্তমান—অনন্তের প্রতি দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া উভয়েরই উদ্দেশ্য)। এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে ধর্ম্মচিন্তা ও সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে চিরন্তন সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' 'নৈবেদ্য' প্রভৃতির ঈশ্বরানুভূতিমূলক কবিতাগুলি সাহিত্যক্ষেত্রে কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। "গীতাঞ্জলির" অনেক কবিতা কাতর প্রার্থনার রূপান্তর মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মভাব অনুভব করা ও করান, ধর্ম্মশক্তি নিজজীবনে সৃষ্টি করিয়া অপরের জীবনে তাহা সঞ্চারিত করা। কিন্তু ধর্ম্ম ও কলাসৃষ্টির মধ্যে চিরন্তন ও স্বাভাবিক সম্বন্ধবশতঃ ধর্ম্মভাব সৃজনের ফলে সাহিত্যসৃষ্টিও আপনা হইতেই হইয়া গিয়াছে। আবার এই সাহিত্যরস সৃষ্টির সমস্ত উপাদানই ঠাকুরের মনে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য তাঁহার নিকট বহুল পরিমাণে সহজ হইয়া গিয়াছিল। ইহা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সাহিত্যকে বাহনরূপে ব্যবহার করা নহে ;—তাহা হইলে ধর্ম্ম ও সাহিত্য উভয়েই পঙ্গু হইয়া থাকিত। সাহিত্য স্বাধীন, ইহা কাহারও দাসত্ব করে না,—স্বয়ং ভগবানেরও নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রেরণার উৎসমুখে যে ভাষা ও ভাবরাশির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা অনায়াসে, অননুসন্ধানে, সৌন্দর্য্যময় সাহিত্যেও রূপায়িত হইয়াছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যে ধর্ম্মের ভূমানন্দ ও সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে, ধর্ম্ম ও সাহিত্য এমন করিয়া জড়াইয়া গিয়াছ যে তাহাদিগকে পৃথক্ করা একেবারেই অসম্ভব।

মানুষের রচনা-পদ্ধতি তাহার চরিত্রের উপর নির্ভর করে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যরচনাকৌশল বিশ্লেষণ করিবার সময় পাঠককে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইংরাজিতে একটী কথা আছে—"Style is the man" (যেমন চরিত্র তেমনই রচনাকৌশল)।

বাস্তবিক মনুষ্য চরিত্রের সহিত রচনাশিল্প এমন নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ যে অনেকক্ষেত্রে লিখিবার কৌশল হইতে লেখকের চরিত্র অনুমান করা যায়। চরিত্রের বিভিন্নতার জন্যই লিখিবার প্রণালীর এত পার্থক্য। একটা সাধারণ উদাহরণ হইতে জিনিষটা ভাল বুঝা যাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ত ত্রিশহাজার ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছে, একই নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক হইতে একই বাঙ্গালা প্রশ্নের উত্তর, নিজ মাতৃভাষা বাঙ্গালায় তাহারা লিখিতেছে। অথচ ত্রিশহাজার ছাত্রের রচনাপদ্ধতি ত্রিশহাজার রকম হইয়া যাইতেছে। ইহার মূল কারণ চরিত্রগত বৈষম্য। সেইজন্য অপরের কণ্ঠস্বর যেমন অধিকক্ষণ অনুকরণ করা যায় না তেমনই অপরের রচনাপদ্ধতিও স্থায়ীভাবে অনুকরণ করা কখনও সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের বিভিন্ন বয়সে, মনের পরিপক্কতার অবস্থাভেদে রচনাকৌশল বিভিন্ন হইয়া থাকে,—একই লেখকের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রচনাপদ্ধতি। সাধারণ লেখকের মধ্যে তো ইহা দেখা যায়ই এমনকি মহাকবি সেক্সপীয়রের বিভিন্ন বয়সের লেখারমধ্যে ভাষার অনেক বৈষম্য। বিখ্যাত Swiss অধ্যাপক Amiel বিশ্বসাহিত্যে ইহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"How many styles in one man!" (একই লোকের কত রকম রচনাপদ্ধতি)। ভাবের তরলতা, ভাষার বাহুল্য, কথার দীনতা,—অপরিপক্ক লেখকগণের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যে সাধু একবার তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত কথার মধ্যে একই কৌশল, একই সৌন্দর্য্য সমভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার 'many styles' বহু রচনাপদ্ধতি নহে;—তাঁহার একই রচনাপদ্ধতি সর্ব্বসময়ে সর্ব্ব অবস্থাতেই দেখা যাইত। শিষ্যগণের আগমনের পূর্ব্বে, শিষ্যগণের আগমনের পরে, সুস্থশরীরে, কঠিন ক্যান্সার রোগের সময়,—সেই একই রচনাকৌশল, সেই স্বচ্ছতা, সেই ওজস্বিনী

ভাষা। ইহার নিগূঢ় কারণ এই যে সাধুর রচনারীতি বয়স ও বুদ্ধির শক্তির উপর নির্ভর করে না, ইহা তাঁহার সাধনসংস্কৃত চরিত্র এবং জ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টতার অবশ্যম্ভাবী ফল। সাধুর যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য নাই;—সব বয়সই এক বয়স; সাধুর জ্ঞানলাভের অবস্থাভেদ নাই, এক অখণ্ড জ্ঞান সর্ব্বসময়েই তাঁহার মনকে উজ্জ্বল করিয়া আছে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের রচনাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিবার সময় তাঁহার এই অখণ্ড রচনারীতি আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গদ্যভাষার শক্তি ও উৎকর্ষ এবং বাঙ্গালা গদ্য ভাষার ইতিহাসে তাঁহার অবদানের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দীতে,—বিশেষ করিয়া তাহার শেষভাগে বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে ধর্ম্মের যে জ্বলন্ত বিশ্বাস সাহিত্যসৃষ্টির একটী শক্তিশালী উপাদান, সেই ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বের আদর্শ হারাইয়া গিয়াছিল, নূতন আদর্শ তখনও গড়িয়া উঠে নাই। অধ্যাপক সুশীল দে লিখিয়াছেন "Public opinion on religious matters was low,......and the undoubted belief in the absolving efficacy of superstitious rites calmed the imagination and allayed the terrors of conscience. Empty rituals, depraved practices, and even horrid ceremonies like hook-swinging, human sacrifice and infanticide partially justify the unsparing abuse of our religion by the missionaries." (ধর্ম্মবিষয়ে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঘোলাটে হইয়া গিয়াছিল। কতকগুলি কুসংস্কারপূর্ণ আচার ব্যবহারেই ধর্ম্মসাধন হইতেছে ভাবিয়া মানুষের মন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিত। অসার ধর্ম্মপ্রথা, নিন্দনীয় আচরণ এবং কুৎসিত আচার ও অনুষ্ঠান—যেমন পৃষ্ঠদেশে লৌহশলাকা

বিদ্ধ করিয়া শূন্যে ঝোলা, নরবলি, শিশুহত্যা,—তখনকার দিনের খৃষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উগ্র আক্রমণের কারণ যোগাইতেছিল)। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মভাব চাপা পড়িলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বৈষ্ণবগুরু শ্রীগৌরাঙ্গ, নৈয়ায়িক রঘুনাথ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও তান্ত্রিকাচার্য্য কৃষ্ণানন্দের প্রভাব বহুশতাব্দীর পরেও বাঙ্গালী জাতিকে তখনও প্রভাবিত করিতেছিল,—ক্ষীণ, অতিক্ষীণভাবে, কিন্তু একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা, মহামানবের অপেক্ষা,—আগুন আনিতে পারিলে ইন্ধনের অভাব ছিল না। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যখন উভয় ক্ষেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া মানুষ আসিল তখন ধর্ম্ম ও সাহিত্য একসঙ্গে নূতন করিয়া উজ্জল হইয়া উঠিল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, নানাবিধ কারণে ধর্ম্ম ও সমাজ-ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য বাঙ্গালা গদ্য রচনাভঙ্গী কোন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বহুবিধ রচনা প্রণালী পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতেছিল, কোনটাই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। পণ্ডিতী ভাষা তাহার বংশগৌরবের দাবী লইয়া সুধী সমাজোচিত ভারী অথচ মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া অনেকটা প্রাধান্য অর্জ্জন করিলেও জনসাধারণের গ্রহণীয় হইতে পারিল না, লোকের চক্ষে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ের সৃষ্টি করিলেও মনের ভিতর প্রবেশ লাভ করিল না। পাশাপাশি চলিত ভাষা অর্থাৎ সাধারণের সুবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক ভাষা চলিয়াছিল। সাধারণ চলিত ভাষায় চাহিদা মিটাইত কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা এবং কথকঠাকুর। "It was so direct in its simplicity, so dignified in its colloquial ease, and so artful in its want of art that it never failed to appeal." (এই চলিত ভাষা এত সহজ ও সরল ছিল, ইহার মধ্যে প্রতিদিনের ভাষার এমন সৌন্দর্য্য ছিল এবং চেষ্টাসাধ্য কলা কৌশলের অভাবে ইহা এতই মনোহর ছিল যে মনের

উপর ইহার অসাধারণ প্রভাব সর্ব্বদাই লক্ষ্য হইত)। ঠিক পাশাপাশি না হইলেও প্রায় পেছু পেছু চলিয়াছিল আদালতী ও সাহেবী বাঙ্গালা। ফার্সীশব্দবহুল আদালতী ভাষার ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ ছিল,—আদালত এবং বাজারহাটেই ইহা সাধারণতঃ শুনা যাইত। সাহেবী বাঙ্গালা কোন সময়েই সাধারণের উপভোগের জিনিষ ছিল না, ইহা না সংস্কৃত, না চলিত,—একটা সঙ্কর ভাষা ও বাক্যরচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ ভাষা তখনকার দিনে ছিল, কিন্তু কোনটাই বাঙ্গালীর খাঁটি জাতীয় ভাষা হিসাবে দাবী করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে নাই। ধর্ম্ম, সমাজ, জনমত, জাতীয়ভাব কোনটাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, গদ্যভাষা কি করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে!

এই যুগসন্ধির সময় আসিলেন মহামহিম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "বেতালপঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যে যুগান্তরের সৃষ্টি হইল। বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের জনক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ সাধুভাষা দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত-শব্দবহুল নহে, ইহা বনিয়াদী বংশগৌরবে গর্ব্বিত পণ্ডিতীভাষা নহে, ইহা রাজকুলের গায়ের জোরে প্রচলিত সাহেবী ভাষা নহে,—ইহা জীবন্ত মানুষের লেখা জীবন্ত ভাষা। বিদ্যাসাগরের সুমেরুবৎ চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও উদারতা যেমন এই ভাষায় ছিল, তেমনই অন্যদিকে দয়ার সাগরের হৃদয় এই ভাষাকে কোমল ও প্রসারণশীল করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি সম্পূর্ণভাবে এই ভাষা সাধারণ লোকের গ্রহণীয় হইল না, সাধারণ লোকে দেখিল, শুনিল, বিস্মিত হইল, কিন্তু মনের ভিতর জড়াইয়া ধরিতে পারিল না। এই ভাষা এতই নূতন, এতই লেখকের বিশিষ্ট চরিত্রব্যঞ্জক যে ইহাকে "বিদ্যাসাগরী" ভাষা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র আখ্যা সাহিত্যক্ষেত্রে দেওয়া হইয়াছে। সমাজ ইহাকে নিবিড়ভাবে পাইল না, বিদ্যাসাগরী গদ্যভাষা দূরের জিনিষ রহিয়া গেল।

এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আসিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা প্রায় ১২।১৩ বৎসরের বড়; বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের প্রায় পাঁচ বৎসরের ছোট। প্রথম প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া বিদ্যাসাগরী ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি নভেল রচনা করিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রভাব তো বঙ্কিমচন্দ্রের উপর পড়িবেই! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বেশীদিন তাঁহাকে অনুকরণশীল হইতে দিল না, বন্ধনমুক্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে নিজ বিশিষ্টতা স্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইয়াছিল। সে যুগে এই পুস্তকখানি সাহিত্যসমাজে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। যে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র এই পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কথ্যভাষামূলক। বাঙ্গালাভাষায় ইহাকেই সাধারণতঃ প্রথম নভেল বলা হইয়া থাকে। এই আলালী ভাষার বিশিষ্টতা হইল এই যে ইহাতে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা চলিত দেশী ও বিদেশী শব্দেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। ইহা ঠিক মুখের ভাষাও নহে, লেখার মার্জ্জিত ভাষাও নহে—একটা সঙ্কর ভাষা বলিলেই চলে। তথাপি ইহা চক্ষের সম্মুখে ছবি আঁকিত; মনকে আঁকড়াইয়া ধরিত। এই যে 'আলালী' ভাষা এবং 'বিদ্যাসাগরী' ভাষা, ইহারা জীবন্ত ভাষা হইয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে বেশীদিন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না, কিন্তু এই দুই বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ভাষার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক শক্তিশালী ভাষার সৃষ্টি করিলেন। আলালী ভাষার বৈচিত্র্য গ্রহণ করিয়া, বিদ্যাসাগরী ভাষার সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস কাটিয়া ছাঁটিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাকে লঘু, গতিশীল এবং সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়াদিলেন বঙ্কিমী প্রতিভা যাহার বিশ্লেষণ কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। এই নূতন গদ্যধারাসৃষ্টি বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইলেন ভাষার প্রতি অচল

আনুগত্য স্বীকার করিলেই সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ ভাষা সাহিত্যসৃষ্টি করে না, প্রতিভাসম্পন্ন লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করিবার সময় ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া লয়, তাহাকে নূতন রূপরস আনিয়া দেয়, নিজের প্রতিভার রংয়ে রঞ্জিত করিয়া ভাষাকে যেন নূতন করিয়া সৃষ্টি করে। বাঙ্গালাভাষার এই নূতন সৃষ্টি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে দুইবার মাত্র হইয়াছে,—একবার বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে, আর একবার মহাকবি রবীন্দ্রনাথের হাতে। বাঙ্গালাভাষার যে বর্ত্তমান অপূর্ব্ব গৌরব ও মহিমামণ্ডিত রূপ, যে রূপ আজ তাহাকে গরবিণী ইংরাজি, জার্ম্মাণী অথবা ফরাসী ভাষার পার্শ্বে সিংহাসন প্রদান করিয়াছে, সে রূপ একমাত্র মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সাধনার সৃষ্টি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বাঙ্গালাভাষাকে বলিতে পারেন

তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।

এইবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া পড়িতেছি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" বাহির হইল। খাঁটি কথ্যভাষায় কলিকাতার বিভিন্ন সমাজের সজীব চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিল। 'আলালে'র মত ইহার ভাষা খিচুড়িপাকান নহে, 'হুতোমী' ভাষা একটা নিজস্ব ছাপ বাংলা সাহিত্যে আনিয়া দিল। ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক। ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন নভেল ঠাকুরের ভক্তগণ তাঁহাকে কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা" ঠাকুর শুনিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না কিন্তু যখন এই দুইখানি বই প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা নগরীতে প্রায় ঘরে ঘরে এক সাহিত্যিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পূজারি হইয়া বাস করিলেও

ধর্ম্মসমাজে তিনি পরিচিত হন নাই, ভক্তসমাগম হয় নাই, ঠাকুরের তীর্থ-ভ্রমণ তখন বাকী রহিয়াছে। সুতরাং এই দুইখানি পুস্তকের ভাষা ও ভাবের সহিত লোকমুখে কিছু কিছু পরিচিত হওয়া ঠাকুরের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বিশেষ করিয়া "হুতোমী" ভাষা কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠের ভাষা, এই ভাষাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকাল এবং কৈশোরের অভ্যস্ত ভাষা। কলিকাতার এই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে যে অর্থসম্পদ ও ধ্বনিসম্পদ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের রচনাপদ্ধতির মধ্যে তাহারই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "হুতোমী" ভাষার ভিতর দিয়া আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের রচনাপদ্ধতির অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িলাম।

বাঙ্গালা গদ্য ভাষার এইরূপ পরিস্থিতির সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ সমৃদ্ধ, তিনি বাঙ্গালা শব্দসমষ্টিকে কিভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, বাঙ্গালা গদ্য ভাষার ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায় তাহা আলোচনা করা হইতেছে। প্রথমেই স্থূলতঃ দেখা যায় যে গদ্য রচনাভঙ্গীর যে যে বিশিষ্টতা বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বদেশে তাহা সাহিত্য শ্রেণিভুক্ত হইয়া থাকে তাহার সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণের গদ্য ভাষার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। যে দেশে সমালোচনাসাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ সেই ইংলণ্ডের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়াছেন—"Prose is both an art and a craft. A craftsman is concerned with utility; an artist with beauty." (গদ্য রচনা একাধারে কলা এবং কৌশল। কৌশলী ব্যক্তি ইহার কাজের দিকটা দেখেন, কলাস্রষ্টা ইহার সৌন্দর্য্য লইয়াই সন্তুষ্ট)। তাহা হইলে গদ্যভাষা কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে তাহা যেমন একটা দেখিবার দিক্ তেমনই গদ্যভাষার সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও উপভোগ করিবার বস্তু। সর্ব্বাঙ্গীন গদ্য সাহিত্যের মধ্যে এই দুইটা দিকই বর্ত্তমান থাকা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কথা সাহিত্যের ভিতর এই দুইটী

দিকই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে গদ্য-সাহিত্যের প্রথম প্রয়োজনীয় অঙ্গ,—তাহার অর্থের স্বচ্ছতা। যদি অর্থ দুর্ব্বোধ্য হয়, অনেক চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় তাহা হইলে সে কথা কেহ পড়িবে না এবং সাহিত্যের যে একটী কাজের দিক্ আছে তাহা সাধিত হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যে এই স্বচ্ছতা, (ইংরাজিতে যাহাকে perspicuity বলে) সহজবোধ্যতা সর্ব্বদাই দেখা যাইত। পণ্ডিত হউক, মুর্খ হউক কথা বুঝিতে কাহারও দেরী হইত না, কেবল মনোযোগ দিলেই হইত। কোনও ঘোলাটে কথা, অস্পষ্ট ভাব তাঁহার কথাসাহিত্যে স্থান পাইত না, তাঁহার মন ছিল ঝরণার জলের মত স্বচ্ছ, বেগবান এবং তরঙ্গশীল, সুতরাং তাঁহার কথার নীচেয় কোন তলানি জমিত না। তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সমস্ত কথাগুলি আবার ধরা যাইত, বুঝা যাইত, কেবলমাত্র ঘোলা আলাপ হইলে বাড়ি ফিরিবার পথেই তাহা হারাইয়া যাইত। গদ্যরচনার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান ভাষা,—ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা—যেমন ভাব বাহনটিও তেমনই হওয়া চাই, নতুবা ভাব স্বচ্ছন্দে মন হইতে অন্যমনে বিচরণ করিতে পারেনা, বল্‌গাবদ্ধ অশ্বের মত তাহার স্বচ্ছন্দগতি পদে পদে প্রতিহত হয়। ভাষার এইরূপ যথাযথ ব্যবহার করিতে হইলে কথাগুলিকে এক একটী চিত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয়, হয়ত একটী বিস্তৃত ভাব একটী মাত্র কথার সাহায্যে মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শব্দবিন্যাসের মধ্যে এই গুণ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুর এমন এমন কথা ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহারা জীবন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত, খানিকটা কাটিয়া বাদ দিবার অথবা বদ্‌লাইবার উপায় নাই, সমালোচকের ভাষায় "If you cut them they bleed' (যদি একটী কথাও কাটিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে)। ভাষার মধ্যে শুধু ভাবই একমাত্র সম্পদ নহে, ধ্বনির ব্যঞ্জনাও

ভাষার অপূর্ব্ব সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত কলায় পারদর্শী ছিলেন, গানের কাণ ছিল বলিয়া অনেক সময় তাঁহার ভাষা হইতে নূপুরের মত মধুর ধ্বনি উত্থিত হইত। এই মধুর ধ্বনি বাঙ্গলা ভাষায় নিহিত রহিয়াছে তথাপি সকলের রচনায় তাহা বাজিয়া উঠে না। ইউরোপীয় সমস্ত ভাষার মধ্যে গ্রীক্ ভাষাই ধ্বনিসম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, পুরাতন ল্যাটিন ভাষার মধ্যেও সঙ্গীতধ্বনি অনেক পরিমাণে দেখা যাইত। ইহার মূল কারণ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের একটা নিয়ন্ত্রিত অনুপাত। ঠিক্ অনুরূপ কারণে ভারতীয় সমস্ত ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্গীতের তরলতা ও মধুরধ্বনি প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু বাজাইবার শক্তি চাই, যাহার হাত খেলেনা তাহার নিকট অতি মূল্যবান্ যন্ত্রও অচল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে সে ধ্বনি পূর্ব্বতন সাহিত্যিকগণের অপর কাহারও গদ্য লেখার মধ্য হইতে উত্থিত হয় নাই। অবশ্য পরবর্তী যুগে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে ধ্বনিসম্পদ দেখা গিয়াছে তাহা কাহারও সহিত তুলনীয় নহে,—ভারতবর্ষের সাহিত্যক্ষেত্রে একটী মাত্র রবির উদয় হইয়াছিল, সে রবিরশ্মি তুলনাবিহীন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আর একটী বিশেষত্ব ছিল তাহার স্বাভাবিক পুরাতন রূপ। সংস্কৃত বাটালির সাহায্যে চাঁচিয়া ছুলিয়া ভাষাকে ভদ্র ও উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই, করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার সহজ গ্রাম্য চলিত কথার ভিতর দিয়া গ্রাম্য জীবন, গ্রাম্য ছবি, গ্রাম্য সমাজ ফুটিয়া উঠিত, সহরের পরিমার্জ্জিত লোকের নিকট তাহারা পুরাতনের রোমান্স সৃষ্টি করিত। ভাষার ভিতর দিয়া পুরাতনের বিস্মৃত ও উপেক্ষিত রূপ ফুটাইয়া তুলিবার এই যে শক্তি তাহা ইংরাজ লেখকগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া Thomas Hardyর গদ্য সাহিত্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেইজন্য Hardyর নভেলগুলির এত সমাদর। বর্ণনার

ভিতর দিয়া পুরাতনকে জানাইলে তাহা ইতিহাসশ্রেণিভুক্ত হইয়া পড়ে, সাহিত্যের রসসৃষ্টি হয় না। পুরাতনের রহস্য শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রাম্য ও সরস কথাগুলির ভিতর দিয়া এক একটী রূপ পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার অপূর্ব্ব সংযম আর একটী লক্ষ্য করিবার বস্তু। ভাষার বাহুল্য অথবা ভাবের উদ্দাম উচ্ছ্বাস কবিরও শোভা পায় না, গদ্য লেখকের তো নয়ই। রচনাভঙ্গীর এই দোষ অনেক বড় বড় লেখকের মধ্যেও সময় সময় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজ কবি Shelley একজন প্রথমশ্রেণির কবি তথাপি ভাষার মোহের স্রোতে অনেক সময় তিনি ভাসিয়া যাইতেন, তখন ফেনিল ভাষাতরঙ্গের মধ্যে তাঁহার ভাবরাশিকে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এই ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া Prof. Shairp লিখিয়াছেন—"Condensation and self-repression would have improved much that he worte" (ভাষার মিতপ্রয়োগ এবং আত্মসংযম Shelleyর অনেক লেখাকেই আরও সুন্দর করিতে পারিত)। ঠিক্ এই দোষের কথা বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, এমন কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কোন কোন ক্ষেত্রে খাটে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটী চরিত্রগত—চরিত্রের সংযমের অভাবে এই দোষ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের অপূর্ব্ব সংযম তাঁহাকে কখনও ভাষার অপব্যবহার করিতে দেয় নাই। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরাতন গ্রীক লেখকদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। "Art's true maxim of avoiding excess" (কলা সমূহের প্রধান আদর্শ বাহুল্য বর্জ্জনতা)—যাহা সমস্ত ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে একমাত্র গ্রীকদিগের লেখার বিশিষ্ট ধর্ম্ম,—সেই ভাষা ও ভাবের ভারসাম্যতা ঠাকুরের কথা ও বর্ণনার মধ্যে সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত। ভাষার বাজে খরচ শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও করিতেন না। ঠিক্ যতটুকু ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন, যতটুকু ভাষা ব্যবহার করিলে মানুষ ভাবটী ঠিক্ বুঝিতে পারিবে, তাহার

কলিকাতায় শ্যামপুকুরে রহিয়াছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন,—মহেন্দ্রনাথ তদানীন্তন সুধীসমাজে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার অহঙ্কারসূচক কথায় বিরক্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"তোমার কথা কি শুন্‌বো ? তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।" ডাক্তার সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ হইল, মনে আঘাত পাইলেন, কিন্তু তাঁহার নির্ভীক স্বাধীনচেতা রোগীটীকেও চিনিতে পারিলেন। ডাক্তার সরকার অভিমানী ব্যক্তি ছিলেন, বহু রোগী উপেক্ষা করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় অনেকে আশঙ্কা করিলেন হয়ত ডাক্তার বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবেন, আর আসিবেন না। কিন্তু প্রবল মনঃশক্তিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই বিষয়ভোগী ডাক্তারের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মন স্তিমিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ম্রিয়মাণ হইয়া ডাক্তার বলিলেন—"তা বল ত তোমার গলার অসুখটা কেবল দেখে যাব। অন্য কথায় কাজ নাই।" সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা বর্জ্জিত মন সূর্য্যের মত উজ্জ্বল ও প্রকাশক,—ইহার দীপ্তির নিকট তুচ্ছ মান, অভিমান, অহঙ্কার সকলই নিষ্প্রভ ও মলিন।

অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জিনিষগুলি লক্ষ্য করিবার দৃষ্টিশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সকলের থাকে না, অথচ এই দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে মানুষ কখনও বড় হইতে পারে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir Archibald Geikie এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It is not a question of mere brain-power. A man may possess a colossal intellect, while his faculty of observation may be of the feeblest kind." অর্থাৎ ইহা শুধু বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপার নহে। কোন লোকের হয়ত অসাধারণ বুদ্ধি থাকিতে পারে অথচ তাহার দৃষ্টিশক্তি হয়ত অত্যন্ত দুর্ব্বল। শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষুর অপূর্ব্ব শক্তি ছিল, অত্যন্ত খুঁটিনাটী জিনিষগুলিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। অনেকক্ষেত্রে মনে হইত

তিনি কোন একটা জিনিষ দেখিলেন না, হয়ত মন উদাসীন হইয়া রহিয়াছে, সতর্ক দৃষ্টি সেদিকে নাই কিন্তু পরের কোন ঘটনায় দেখা গিয়াছে তিনি সবই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিছুই দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। একদিন কলিকাতায় আসিয়াছেন, কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আজ বাগবাজারের পুল হ'য়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়িলে পুলের কিছু হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে—তারা টেনে রাখ্‌বে। তেম্‌নি সংসারীদের অনেক বন্ধন।" গাড়ির ভিতর হইতে জিনিষটা লক্ষ্য করিয়াছেন, মনুষ্যজীবনের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়াও দেখিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে ঠাকুর অনেক যাত্রা দেখিয়াছিলেন,—সে যুগে যাত্রার বড় ধূম ছিল। রাত্রিজাগরণে অজীর্ণতা, নানাস্থানে ভ্রমণজনিত শারীরিক অবসাদ, অনির্দ্দিষ্ট সময়ে সিদ্ধ ও অর্দ্ধ-সিদ্ধ ভোজন প্রভৃতি কারণে যাত্রাওয়ালাদের শরীর প্রায়ই ভাল থাকিত না, তেজ ও লাবণ্য দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইত। ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিতেন। একদিন জনৈক যাত্রাওয়ালাকে বলিলেন "যাত্রাওয়ালার কাজ ক'র্চ্ছ, তা বেশ। কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐ রকম হয়। গালতোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা।" যে ছবিটী লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা নিখুঁতভাবে আঁকিয়া দিলেন। আবার দৃষ্টিশক্তি কল্পনা সহায়ে বিচরণশীল হয় ;—এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে মন চলিয়া যায়, ক্ষুদ্র আনন্দ ভূমানন্দে পরিণত হয়। ইহা অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তি ও কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণ-প্রসূত। শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরিয়ায় মতি শীলের ঝিলে মাছ দেখিয়াছিলেন, মুড়ি ফেলিয়া দিলে তাহারা নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুড়িগুলি খাইয়া থাকে। ঠাকুর বলিলেন "সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। মাছগুলি ক্রীড়া ক'রে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌লে খুব আনন্দ হয়। যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে।"

শুধু দেখা নয়, দেখিয়া তাহার সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা গ্রহণ করাও শক্তি-সাপেক্ষ। সিটীকলেজের স্বনামধন্য নিরামিষভোজী অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় কলেজে তাঁহার ছাত্রদের কৌতুক করিয়া বলিতেন, "কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে তো সকলে খুব মাছ দেখ্‌তে যাও, মুড়ি খাচ্ছে; আর মাছ দেখে তোমাদের জিবে জল আসে। মাছের আনন্দটা গ্রহণ কর্ব্বার শক্তি নেই;—জিবের জল পড়াই সার।" সাধারণ লোক জিনিষ ভাল করিয়া দেখিতে জানে না, দেখিলেও তাহার ব্যঞ্জনা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সময় সময় ভাতের সহিত একটু অধিকমাত্রায় ঘি খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এই ছোট বিষয়টীও শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। একদিন নিরঞ্জনের আহারের সময় ঠাকুর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"অতো ঘি খাওয়া! শেষে কি লোকের ঝি বউ বার কর্‌বি?" যেখানে আঘাত করিলে ইন্দ্রিয়জয়ী, শুদ্ধাচারী নিরঞ্জন মর্ম্মাহত হইবেন, ঠিক্ সেইখানেই ঠাকুর আঘাত হানিলেন,—"লোকের ঝি বউ বার কর্‌বি?" নিরঞ্জন অবনতমস্তকে তিরস্কার গ্রহণ করিলেন, সেদিন তাঁহার ঘি কেমন লাগিয়াছিল জানা নাই তবে অভ্যাসটী চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন—"ক'ল্‌কাতার লোক সব হুজুগে" এবং কলিকাতার অধিকাংশ লোকই ভোগপ্রয়াসী। "সেদিন কল্‌কাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম জীব সব নিম্নদৃষ্টি; সবাইয়ের পেটের চিন্তা! সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে। সকলেরই মন কামিনীকাঞ্চনে। তবে দুই একটি দেখলাম উর্দ্ধদৃষ্টি;—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।" এত সূক্ষ্মদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। একদিন হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, উদ্দেশ্য কিছু অর্থসংগ্রহ করা। ঠাকুর বুঝিলেন, তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এবার দেশে ধান টান কেমন হয়েছে?" শ্রীরামকৃষ্ণের দেশের

সহিত যত সম্বন্ধ, 'ধ্যানটানের' সহিত সম্বন্ধ ততোধিক ছিল। অথচ তিনি জানিতেন কুশল প্রশ্ন অথবা এই সমস্ত ছোটখাট কথা জিজ্ঞাসা করাই বিষয়ী লোকেদের নিকট প্রীতিকর। একদিন বাগবাজারে বলরামবসুর বাড়িতে ঠাকুর গিয়াছেন, বহু ভক্ত উপস্থিত, অভ্যাসমত ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। স্বামী যোগানন্দের মুখের প্রতি ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ বলরামকে বলিলেন "ওগো, এর (যোগেনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয়নি, একে কিছু খেতে দাও।" এই সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "ভাবসমাধিতে আত্মহারা ঠাকুরের ভক্তগণের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক বিষয়ে কতদূর লক্ষ্য থাকিত, তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা একথার এখানে উল্লেখ করিলাম।" এই বিষয়ে যোগিবর শ্রীগম্ভীরনাথজীর কথা মনে পড়ে। প্রায় সর্ব্বদাই এই সাধু যোগমগ্ন হইয়া থাকিতেন অথচ শিষ্যগণের ছোটছোট প্রয়োজনগুলির উপরও তাঁহার দৃষ্টির অভাব ছিল না। এই সম্বন্ধে গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন, শিষ্যদের "আহার, শয়ন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের দিকে বাবাজীর সস্নেহ ও সযত্ন দৃষ্টি ছিল। স্নানান্তে বাবাজীর ঘরে গিয়া বসিলে তিনি তাঁহার অন্তর্মুখীন অবস্থাতেই আস্তে আস্তে খাটের নীচ হইতে লাড্ডু, বাতাসা বা যে কোন মিষ্ট দ্রব্য থাকিত তাহা লইয়া নিজ হাতে প্রদান পূর্ব্বক বলিতেন—'যাও, পানি পি লেও।'...কাহারও হয়ত চা পান করিবার অভ্যাস আছে, অথচ তিনি লজ্জায় বলিতেছেন না, বাবাজীর নিকট গেলেই তিনি তাহাকে বলিলেন 'যাও, চা পি লেও।' কোন কোন স্ত্রীলোক হয়ত বেশী গহনাপত্র লইয়া উদ্যানগৃহে অবস্থান করিতে শঙ্কা অনুভব করিতেছেন এবং তজ্জন্য রাত্রে সুনিদ্রা হইতেছে না, পরদিন বাবাজী তাঁহাকে গহনার বাক্স তাঁহার গৃহে রাখিয়া দিতে বলিলেন।" ছোট ছোট জিনিষগুলি, অভাবগুলি লক্ষ্য করিবার এই যে শক্তি ইহা অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই থাকে না।

প্রবল কল্পনাশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রের আর একটি বিশিষ্টতা ছিল। অনেক সময় মানুষ মনে করে যে কল্পনাশক্তি কবির নিজস্ব বস্তু, অন্য কাহারও নহে। কিন্তু পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে এই "eye within an eye" অর্থাৎ কল্পনা দৃষ্টি মানুষের একান্ত প্রয়োজন। কবি, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক ব্যবসাদার, ধর্ম্মগুরু সকলেরই এই শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মানুষ ভাবে বৈজ্ঞানিকের আবার কল্পনাশক্তি কি? তাহাকে নিছক্ পার্থিব বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, কল্পনাশক্তি প্রয়োগের তাহার অবকাশ কোথায়? কিন্তু কল্পনাশক্তি ভাববিলাস নহে, ইহা সত্যের অগ্রদূত, সুতরাং সমস্ত ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োজন আছে। জনৈক বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন "The artist's world need not extend beyond experience, and is therefore often less highly imaginative than the world of the scientist." অর্থাৎ শিল্পীগণের কল্পনাশক্তি স্বীয় অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম না করিলেও চলে সুতরাং সেদিক্ দিয়া বিচার করিলে বৈজ্ঞানিকের কল্পনাশক্তির তুলনায় ইহা সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের পৃথিবীকেও ছাড়াইয়া ধর্ম্মগুরুর কল্পনাশক্তি সঞ্চরণ করিয়া থাকে, কারণ তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, তাঁহার সত্যগুলি চিরন্তন, তাঁহার অভিজ্ঞতা বহুবর্ণ ও বহুরসের সংযোগে অসীম আনন্দপ্রদ। ভক্ত গাহিলেন "কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ, তোমাবিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই।" তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন সূর্য্য উদিত হইয়াছে এবং "চারদিকের অন্ধকার ঘুচে গেল। আর সেই সূর্য্যের পায়ে সব শরণাগত হয়ে পড়্‌ছে।" ইহাই খাঁটি কল্পনাশক্তি; বস্তুর বর্ণনা মাত্র কল্পনা সেই বস্তুকে অবলম্বন করিয়া সুদূর প্রসারী চিত্র মনের উপর আঁকিয়া চলিয়াছে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা হইতে একটি গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী

নিরঞ্জনানন্দ। গাড়ি যখন কাশীপুরের শুঁড়িখানার দিকে আসিয়াছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন শুঁড়ির দোকানে কয়েকজন লোক মদ খাইয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছে। ঠাকুর এই দেখিয়া কয়েকবার বলিলেন "আনন্দকর, আনন্দকর, আনন্দময়ি! আনন্দ কর।" এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বামী শিবানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, "তখন আমার বয়স অল্প এবং আমি ব্রাহ্মসমাজের ফের্‌তা। শুঁড়ির দোকানকে অতিশয় ঘৃণা করতুম্‌। শুঁড়ির দোকানে মাতালেরা মদ খেয়ে আনন্দ ক'রছে এই দেখে পরমহংস মশায় যে সমাধিস্থ হলেন এইটি আমার বড় আশ্চর্য্য লাগ্‌ল।" কিন্তু অপরের আনন্দ দেখিয়া কল্পনাশক্তি সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই যে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন সে আনন্দে মদ নাই, অন্য কোন উপকরণ নাই, সে আনন্দ যে আনন্দময়ীর নির্ম্মলরস তাহা সেদিন স্বামী শিবানন্দ বুঝিতে পারেন নাই। বাহিরের আবরণ ও উপাদানকে বাদ দিয়া শুধু ভিতরের রস গ্রহণ করিতে হইলে যে প্রবল কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। তাই অনেকক্ষেত্রে দেখা যাইত মদের নাম শুনিলেই, মদ দেখিলেই ঠাকুরের মাতালের মত নেশা হইত, মদ খাইতে অথবা ছুঁইতে হইত না। বিখ্যাত সুইস পণ্ডিত Amiel ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই রাত্রি ১০টার সময় এইরূপ মাতালের চীৎকার ও ছন্দবিহীন আনন্দ শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। Amiel তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত journal-এ লিখিয়াছেন,—"Shout away, then, drunkards! Your ignoble concert, with all its repulsive vulgarity, still reveals to us, without knowing it, something of the majesty of life and the sovereign power of the soul." অর্থাৎ হে মাতালগণ, তোমরা আনন্দ কর। কুৎসিত হইলেও তোমাদের এই উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীত জীবনের গৌরব ও আত্মার অসীমশক্তি আমাদের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ করিতেছে। জিনিষটা ঠিক্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের

মত বুঝা হইল না, তথাপি খানিকটা বুঝা হইল,—সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত Amiel-এর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য তো থাকিবেই! কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই প্রবল কল্পনাশক্তি কার্য্য করিতেছে, যদিও শক্তি ও সাধনার বিভেদবশতঃ সত্য বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

বিনয় সাধুর সাধনার অমৃতময় ফল, সাধুজীবনের বিশিষ্ট চিহ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে এই বিনয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বস্তু। যাঁহার ঈশ্বরলাভ হইয়াছে তাঁহার চরিত্রে বিনয় আপনা আপনিই আসিবে, কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। বিষয়ীর বিনয় পূজাপার্ব্বণের পোষাকের মত, কখনও বা তাহা পরিতে হয়, কখনও বা খুলিয়া রাখা যায়। কিন্তু প্রকৃত বিনয়চেষ্টা সাধ্য নহে, ইহা চরিত্রের অপরিহার্য্য অংশ বিশেষ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকগণের মধ্যে সাধু নাগ মহাশয়ের বিনয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল। তখন নাগমহাশয় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন অথচ রবিবার ছুটির দিনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন "কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান গণ্যমান্য লোক রবিবারে ঠাকুরের কাছে যান, আমি মূর্খ লোক তাঁহাদের কথা কি বুঝিব?" ইহাই চরিত্রগত বিনয়। সাধুর জীবনে বিনয় এমন করিয়া মিশিয়া থাকে যে তাহা সাধুর শরীর ও মনের অণুপরমাণুর অংশ স্বরূপ। প্রধানতঃ দুইটি কারণে বিনয় সাধুগণকে অধিকার করিয়া বসে। প্রথমতঃ অনন্তজ্ঞান-স্বরূপ, অনন্তবিভূতিস্বরূপ, অখণ্ডসৌন্দর্য্যস্বরূপ সেই বিশ্বপিতাকে দেখিতে পাইলে আর গর্ব্ব অথবা ঔদ্ধত্য থাকে না, সর্ব্বদাই চক্ষের সম্মুখে যিনি বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে দেখাইয়া গর্ব্ব করিবার মানুষের কি যোগৈশ্বর্য্য, কি জ্ঞান, কত ভক্তি থাকিতে পারে! সুতরাং সাধুর মস্তক সর্ব্বদাই বিনয়ে অবনত। মহাকবি যাহা হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন

মানুষ সম্মুখে এলে কেন সেই ক্ষণে
তোমার সম্মুখে আছি নাহি পড়ে মনে?

সাধু সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ভূতে ভূতে তিনি ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীভগবান স্বয়ং বিনয়ের অপূর্ব্ব আদর্শ। সর্ব্বদা ভগবৎচিন্তন করিতে করিতে ভক্ত ভগবানের সত্তা প্রাপ্ত হন, এই বিনয় তখন সাধকচরিত্রে আপনা আপনিই সংক্রামিত হইয়া থাকে। ভগবানের বিনয়ের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত শ্রীভাগবতে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিন ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ভগবান রুষ্ট হইবেন ইহাই স্বাভাবিক কিন্তু বিনয়ের অখণ্ড আধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে বলিলেন

অতীব কোমলৌ তাত! চরণৌ তে মহামুনে,
বজ্র-কর্কশ-মদ্বক্ষঃ স্পর্শেন পরিপীড়িতৌ।

(হে তাত, তোমার চরণদ্বয় অত্যন্ত কোমল, আমার বক্ষঃ বজ্রের মত কর্কশ, না জানি সেই বক্ষে আঘাত করিয়া তোমার চরণে কতই না ব্যথা লাগিয়াছে !)

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণের মধ্য হইতে আর একটীমাত্র ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। ভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাং বরং
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্।
তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাৎ শ্রুতান্
জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্॥

(হে উদ্ধব, পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া ভীষ্মের মুখ হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্য শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ শুনিয়াছিলাম তাহা তোমাকে বলিতেছি।)

কি অপূর্ব্ব বিনয়! যিনি স্বয়ং মুর্ত্তিমান জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা, যাঁহার জ্ঞানের আভাস মাত্র পাইয়া জগৎ সংসার জ্ঞানী হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন যে ভীষ্মের মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহা ভক্ত উদ্ধবকে শুনাইবেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরণ সর্ব্বদা অনুধ্যান করিয়া সদা তৎভাবভাবিত হইয়া সাধুগণ যে বিনয়ী হইবেন ইহা বিচিত্র নহে।

তাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বিনয় সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। জ্ঞানীচূড়ামণি হইয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে বলিতেন "আমি মুর্খোত্তম", "আমি জানি, আমি কিছুই জানি না।" যোগিবর গম্ভীরনাথজী বলিতেন "সাচ্ বোল্‌তা, হাম কুছ্ ভি নেহি জান্‌তা।" একই ভাষা, একই ভাব। কখনও বা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "আমি সকলের দাস।" সাধুভক্ত অথবা বিষয়ীলোক দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম করিতেন। ঠাকুরের এই বিনয়াবনত মস্তক লক্ষ্য করিয়া গিরিশ বলিয়াছেন রাম অবতারে ধনুর্ব্বাণ, শ্রীকৃষ্ণ অবতারেও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামের দ্বারাই বিশ্ববিজয় করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে যেমন জনমত শ্রদ্ধা করিতেন, মানিয়া চলিতেন সেইরূপ বৃথা ও মিথ্যা জনমতকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না। মানুষের মধ্যে দুইটা দিক্ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান,—একটা বিচারবুদ্ধি, অপরটা স্বার্থদুষ্ট অন্ধতা। জনতার ভিতর এই দুইটী দিকই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কখনও পাঁচজন মানুষ একত্র হইয়া ধীর স্থিরভাবে বিচারবুদ্ধি সম্ভূত কথা বলিতেছে, কখনও বা সেই মানুষ কোন কারণে অন্ধ হইয়া মাতালের মত প্রলাপ উদ্গীরণ করিতেছে। একদিন গিরিশের থিয়েটারে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্বোপবিষ্ট স্বামী প্রেমানন্দ ও মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন "দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয় তোমরা গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং মনে

করবে।” ঐহিকেরা কি মনে করিবে সে সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ উদাসীন ছিলেন তথাপি থিয়েটার কক্ষে পাছে সমবেত দর্শকগণ থিয়েটার-রস-বিরোধী ভাবসমাধি দর্শন করিয়া কলরবের সৃষ্টি করে এই আশঙ্কায় শ্রীরামকৃষ্ণ জনগণের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। আবার ক্ষেত্রবিশেষে ঠাকুর লোকমতের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। বিশেষতঃ নিজের প্রশংসার কথা শুনিলে তিনি অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেন, কখনও বা বিরক্ত হইতেন। কোন কোন স্বার্থপর লোক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসা করিয়া আপনাকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন, দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন সুতরাং লোকে তাঁহাকে ভক্ত অথবা জ্ঞানী ভাবিবে, এই প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার এই সকল লোকের মনের ভিতর চাপা থাকিত ;—শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তাই একদিন ঠাকুর ভক্ত বিশেষের উপর বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—“পান চিবুতে চিবুতে চাপকান পরে কেউ আপিষে গিয়ে, কেউ বা থিয়েটারের ম্যানেজারি ক’রে আমাকে অবতার বল্‌বে, তাহলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।” সাধারণ লোকের হীনবুদ্ধি সম্ভূত এইরূপ মতকে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এইরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকমতের প্রতি সমাদর অথবা অনাদর অবস্থাবিশেষে দেখা যাইত।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরনিন্দা করিতেন না,—ইহা তাঁহার চরিত্রের একটী বিশিষ্টতাছিল। পরনিন্দাকরা মানুষের একটী স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, অনেক ধার্ম্মিক ও নির্ম্মল চরিত্র লোককেও পরনিন্দার ভৈরবীচক্রে বসিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। *কিন্তু খাঁটি সাধু চিনিবার ইহাও একটী কষ্টিপাথর ;—যাঁহার ভগবৎদর্শন হইয়াছে তিনি কখনও

*মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একজন নিন্দুকের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন—“যার নিন্দে করে তার মন্দ হবে বলে নয়, যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে বোলে।”

পরনিন্দা করিতে পারিবেন না। হাজরা মহাশয় বলিয়া যে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটেই বাস করিতেন তাঁহার এই মানসিক দুর্ব্বলতা ছিল। একদিন হাজরা মহাশয় ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরা মহাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কারু নিন্দা কোরোনা—পোকাটীরও না। যেমন ভক্তি প্রার্থনা কর্‌বে তেমনি ওটাও বল্‌বে,—যেন কারু নিন্দা না করি।" এই পরনিন্দার প্রতি ঘৃণা মানব-চরিত্রের একটী অমূল্য অলঙ্কার। ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন,—"যো মুখ্‌মে পরচুক্‌লী ওগারত, সো মুখ্‌মে হরিনাম লিয়া ন লিয়া", অর্থাৎ যে মুখ পরনিন্দা করে সে মুখে হরিনাম করা ও না করা সমান। কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। যে হরিনাম সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করিতে সমর্থ, হেলায় শ্রদ্ধায় যেমন করিয়া হউক হরিনাম উচ্চারণ করিলেই হইল, সেই হরিনাম পরনিন্দাকলুষিত মুখ হইতে বাহির হইলে তাহার সমস্ত মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়া যায়;—এক পরনিন্দা হরিনামের সমস্ত গুণ অপহরণ করে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমৎবৃন্দাবন দাস ঠাকুর একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। একবার কৃষ্ণনাম বলিলেই মানুষ উদ্ধার হইবে কিন্তু তাহাকে একটীমাত্র নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে,—অনিন্দুক হওয়া চাই।

অনিন্দক হই যে সকৃৎ কৃষ্ণ বোলে,
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥

সাধু সজ্জনের নিন্দা করিয়া নিন্দুক রজকের কার্য্য করে তাই নিন্দুক মরিয়াছে শুনিয়া কবীর দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। নিন্দুক সাধকের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ এবং ইহজন্মের পাপপ্রবৃত্তি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয় কিন্তু সেই ময়লা নিন্দুককে অধিকার করে এবং ময়লা ধুইবার সময় যাহারা উপস্থিত থাকে তাহারাও স্পর্শ দোষাক্রান্ত হয়। তাই তপস্বিনী উমা শিবনিন্দায় প্রবৃত্ত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন

ন কেবলং যো মহদপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।

(যে মহতের নিন্দা করে সে তো নিশ্চয়ই পাপী, কিন্তু যে নিন্দা শ্রবণ করে তাহাকেও পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে।)

শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ সত্যনিষ্ঠা ছিল। তিনি সত্যকথা বলিতেন, সত্যভাব মনে পোষণ করিতেন, সত্যই মানবজীবনের একমাত্র সম্পদ বলিয়া সত্যের মর্য্যাদা সতত রক্ষা করিতেন। তিনি বলিতেন "সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধ'রে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।......মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা! এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমার শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; যখন এইসব বলেছিলাম তখন একথা বলতে পারিনি,—মা, এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম্ 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।" এই অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বহুক্ষেত্রে বহুরূপে প্রকাশিত হইত। সাধুগণ বলেন, "সাঁচ বরাবর তপ নহী" (সত্যনিষ্ঠার মত তপস্যা নাই) এবং "সাঁচে শাপ ন লাগই" (সত্যের উপর যে জীবন প্রতিষ্ঠিত তাহাকে কোন অভিশাপ স্পর্শ করিতে পারে না)। শ্রীভাগবতে রাজা অম্বরীষের আখ্যানে সত্যনিষ্ঠার অপূর্ব্ব শক্তি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নাস্পৃশং ব্রহ্মশাপোঽপি যং ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ

(ব্রহ্মশাপ অমোঘ, কিন্তু রাজা অম্বরীষকে সেই ব্রহ্মশাপও স্পর্শ করিল না।)

সত্যনিষ্ঠ, সত্যসঙ্কল্পী রাজা অম্বরীষের প্রতি বিরক্ত হইয়া সুলভকোপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন, তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য নিজ জটা ছিঁড়িয়া মারকদেবী নির্ম্মাণ করিয়া অম্বরীষের দিকে প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু সত্যে প্রতিষ্ঠিত অম্বরীষ ভীত হইলেন না, নিজস্থান হইতে একপদও বিচলিত হইলেন না। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন

তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং পদাভুবং
বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদাৎ নৃপঃ।

(অগ্নিময়ী মারকদেবী পৃথিবীকে পদভরে কম্পিত করিয়া অসিহস্তে রাজা অম্বরীষের দিকে আসিতেছেন দেখিয়াও অম্বরীষ ভয়ে একপদও বিচলিত হইলেন না।)

ব্রহ্মশাপে ত্রিজগৎ ভীত হয়, কম্পিত হয়, অথচ রাজার সাহস কোথা হইতে আসিল? সত্য নিষ্ঠা। সত্যস্বরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রক্ষক, অম্বরীষ তাহা জানিতেন। যেদিন কংসকারাগারে পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন সেদিন জগতের পাপভারহরণের আশায় আনন্দিত হইয়া দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিবার সময় তাঁহার এই সত্যস্বরূপের কথাই বারংবার উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের আর একটী বিশিষ্ট রূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দয়ালু ছিলেন, পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী জীবের দুঃখে তিনি কাতর হইতেন এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই দীনবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া গৃহীদিগকে নিজ পবিত্র সঙ্গ প্রদান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিতেন। দুঃখীও দরিদ্র দেখিলে অর্থদান করিতে ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন, কৃপণস্বভাব ভক্ত কম পয়সা দিলে ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। পাছে অশ্রদ্ধায় দান করিয়া দাতা তমোগুণে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় ভক্তগণকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিবার

উপদেশ দিতেন। আবার শিষ্টাচার শ্রীরামকৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস ছিল। অতিথি অভ্যাগতকে নমস্কার করা, মিষ্টকথা বলা, ভক্ত শিষ্যের পিতার সহিত সম্মানসূচক ব্যবহার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সর্ব্বদাই দেখা যাইত। এই শিষ্টাচার তাঁহার এতই অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছিল যে স্বীয় সহধর্ম্মিনীর সহিত নির্জ্জনে কথাবার্ত্তার সময়ও এই মিষ্টকথা, মিষ্টসম্ভাষণ তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ঠাকুরের দেহত্যাগের বহুবর্ষপরে পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণমহিষী বলিয়াছিলেন—"একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছুই বলেন নি। কখনও ফুলটী দিয়েও ঘা দেন নি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার রাখ্‌তে গেছি—সরু চাকৃলী আর সুজির পায়েস—লক্ষ্মী (ঠাকুরের মেজদাদা রামেশ্বরের কন্যা) রেখে যাচ্ছে মনে ক'রে তিনি ব'ললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্'। আমি বল্‌লুম্—আচ্ছা। আমার গলার স্বর শুনে তিনি চম্‌কে উঠে বললেন,—'কে? তুমি? তুমি এসেছ বুঝ্‌তে পারিনি। আমি মনে ক'রেছিলাম, লক্ষ্মী; কিছু মনে কোরোনি।'···কখনও আমাকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেননি।" নিজ সহধর্ম্মিনীকে ভুল করিয়া 'দিয়ে যাস্' বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এতই কুণ্ঠা, এত লজ্জা! এই শিষ্টাচার এবং শিষ্টাচারের অন্তরালে যে ভদ্র ও মার্জ্জিতরুচি মন রহিয়াছে, তাহা অনেক বৃদ্ধ গৃহস্থের মধ্যেও দুর্ল্লভ।

কোন সম্প্রদায় অথবা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হইতে হইলে মানুষের দুইটি গুণ বিশেষভাবে থাকা প্রয়োজন। শিক্ষাবিভাগ, রাজনীতিক্ষেত্র, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান, সৈন্যদল প্রভৃতি যে কোন একটি বহুমানব-সমাবেশ ক্ষেত্রে পরিচালকের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত মানুষকে প্রথমতঃ স্বীয় আচরণ আদর্শস্থানীয় করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ, অধীনস্থ জনগণকে সর্ব্বসময়ে বিশ্বাস করিয়া ও উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাদের মনকে সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে হয়। জনগণমন অধিনায়ক হইবার এই উভয়গুণই শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগত অধিকার-

রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া প্রণাম শিখাইতেন, ভজনসাধন করিয়া ভজনসাধন শিখাইতেন, নিজ আচারব্যবহারের দ্বারা অপরকে শিক্ষা দিতেন। তিনি যে সময়ে শিষ্যগণকে পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার সাধুজীবনের পরিপক্ক অবস্থা, বাহিরের আচারনিষ্ঠা তাঁহার জীবনে তখন নিরর্থক, সর্ব্বদাই স্মরণমননশীল জীবনে হাত তুলিয়া দেব-দেবীর ছবিকে অথবা শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ শিষ্যগণের সম্মুখে আদর্শ রাখিবার জন্য সব বিধিই পালন করিতেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন "এই জন্যই ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ আদর্শ সকলের চোখের সম্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া দেখান। ঠাকুর যদি স্বয়ং বিবাহ না করিতেন তাহা হইলে গৃহস্থ মানব বলিত,—বিবাহ তো করেন নাই, তাই অত ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা চলিতেছে।" তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শেখায়, কারণ তাহা না হইলে শিক্ষা অক্ষর সমষ্টি মাত্র, কর্ণে প্রবেশ করিলেও হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। আবার শিষ্যগণকে বিশ্বাস না করিলে তাহারা আদর্শ ধরিয়া মন ও চরিত্র গঠন করিতে পারিবে না। গুরুর বিশ্বাস শিষ্যের জীবনে মহাশক্তিরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। একদিন শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ নরেন্দ্রনাথের আচারব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং পরে বিরক্ত ও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন যে নরেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস, যদি কেহ তাহার বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করে তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সমালোচকের মুখদর্শন করিবেন না। গুরুর এত বড় বিশ্বাসই নরেন্দ্রনাথকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, বিশ্বাস মহাশক্তি এবং সেই শক্তি নরেন্দ্রনাথের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া ভবিষ্যতে তাঁহাকে বিশ্ববিজয়ী করিয়াছিল। আবার শিষ্যগণের কল্যাণের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বদাই মনোযোগ ছিল। পাছে

ভক্তগণের কোন ক্ষতি হয় এজন্য তিনি সতর্ক থাকিতেন, কখনও বা পূজা কখনও বা উপদেশের দ্বারা এই কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেন। শিষ্য হয়ত উদাসীন কিন্তু গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই জাগ্রত, সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাই ঠাকুর বলিতেন "গুরু পাওয়া গেল তো ঠ্যাসান দিয়ে বসবার তাকিয়া হ'ল।" একদিন তারক (স্বামী শিবানন্দ) একজন বন্ধু লইয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, "সঙ্গী ছোকরাটি একটু তমোগুণী, ধর্ম্মবিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একটু ব্যঙ্গভাব।" তারকের বয়স তখন প্রায় কুড়ি বৎসর। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তারককে নানাবিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন, তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারক চলিয়া যাইবার পর মহেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন ঠাকুর ছোট খাটটিতে শুইয়া তারকের জন্য ভাবিতেছেন। হঠাৎ মহেন্দ্রনাথকে বলিলেন "এদের জন্য আমি এতো ব্যাকুল কেন?" কিছুক্ষণ পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, "তারক কেন ওটাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লে?" তারক চলিয়া গিয়াছেন তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। বিষয়ী তমোগুণী বন্ধুর সংস্পর্শে পাছে তারকের মন কলুষিত হয়, ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হয়, এই দুশ্চিন্তা ঠাকুরের মনের ভিতর ঘুরিতে লাগিল, কতক্ষণ যে এইরূপ চিন্তা করিলেন তাহার নির্ণয় নাই। ইহাকেই বলে, "গুরু পাওয়া গেল তো ঠ্যাসান দিয়ে বসবার তাকিয়া হ'ল।" আবার কোন শিষ্য কোন কারণে নিরুৎসাহ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলে তাহাকে তিরস্কার করিতেন না, বরং নানা কথায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহার মনের উদ্যম ও সাহস ফিরাইয়া আনিতেন। ফরাসী জাতির পরিচালক নেপোলীয়ন একদিন দুঃখের দিনে ভুলত্রুটির জন্য মুহ্যমান ও অনুতপ্ত সেনাপতি Grouchyকে বিশ্বাস করিয়া ও সাহস দিয়া তাঁহার লুপ্তবীর্য্য পুনরুদ্দীপিত করিয়াছিলেন। ইহাই মানবজগতের ইতিহাসে কর্ণধারগণের স্বাভাবিক আচরণ। ইহাই

বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে একই শক্তিসঞ্চার। একদিনের একটি ঘটনা হইতে ঠাকুরের এই বিশিষ্টগুণ বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে। যোগীন্দ্র (স্বামী যোগানন্দ) মাতার করুণ ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্র বলিয়াছেন "বিবাহ করিয়াই মনে হইল ঈশ্বরলাভের আশা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র; যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ তাঁহার কাছে আর কিসের জন্য যাইব, হৃদয়ের কোমলতায় জীবনটা নষ্ট করিয়াছি, উহা আর ফিরিবার নহে, এখন যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। পূর্ব্বে ঠাকুরের নিকট প্রতিদিন যাইতাম, ঐ ঘটনার পরে এককালে যাওয়া বন্ধ করিলাম এবং দারুণ হতাশ ও মনস্তাপে দিন কাটাইতে লাগিলাম। ঠাকুর কিন্তু ছাড়িলেন না।" ইহাই ধর্ম্মগুরুর বিশিষ্টতা, চিহ্নিত সেবককে একবার ধরিলে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই,—ঢোঁড়া সাপের ব্যাঙ্ ধরা নহে, ইহা কেউটের প্রচণ্ড আক্রমণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ছেলে নিজে চল্‌তে গেলে হয়ত পা ফস্‌কে পড়ে যেতে পারে কিন্তু বাবা যার হাত ধ'রেছে সে ছেলের পা ফস্‌কালেও সে পড়ে না।" "বাবা" যোগীন্দ্রের হাত ধরিয়া ছিলেন, তাই পদস্খলন হইলেও যোগীন্দ্র মাটিতে পড়িয়া যাইলেন না,—"ঠাকুর কিন্তু ছাড়িলেন না।" পদস্খলিত শিষ্যের কি সৌভাগ্য, গুরুর কি দয়া ও শক্তি! একদিন কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক ঠাকুর একজন লোককে যোগীন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত করিলেন। যোগীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "হতাশ, অনুতাপ, অভিমান, অপমানাদি নানাভাবে মৃতকল্প হইয়া অপরাহ্নে কালীবাড়িতে যাইলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম ঠাকুর পরিধানের কাপড়খানি বগলে ধারণ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।" সেদিন বাহিরে আসিয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া কেন? সেদিন কলিকাতায় যান নাই কেন? সেদিন অন্য ভক্তসমাগম হয় নাই কেন? "আমাকে দেখিবামাত্র বেগে অগ্রসর হইয়া

বলিতে লাগিলেন 'বিবাহ করিয়াছিস্ তাহাতে ভয় কি ? এখানকার কৃপা থাকলে লাখ্‌টা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না,"—ইহাই মহামানবের মাভৈঃ বাণী, যুগে যুগে, দেশে দেশে ঘোষিত হইয়া এই বজ্রনিনাদ ত্রিতাপদগ্ধ মানবকে আহ্বান করিতেছে,—অগ্রসর হও, হতাশ হইও না, পাপের কথা চিন্তা করিয়া বিশ্বাস হারাইও না। যোগীন্দ্র বলিয়াছেন "অর্দ্ধবাহ্য দশায় অবস্থিত ঠাকুরের ঐ কথাগুলি একেবারে প্রাণের ভিতর স্পর্শ করিল এবং ইতিপূর্ব্বের হতাশ অন্ধকার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।" মানবজাতির কর্ণধাররূপে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের ব্যবহারে এই বিশ্বাস ও সাহস সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, নতুবা সহস্র সহস্র ত্রুটিশীল দুর্ব্বল মানব কখনও নেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে পারিত না।

এই সমস্ত নানাবিধ দুর্ল্লভ গুণে বিভূষিত শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ হিসাবেও অনেক উচ্চস্তরে বিরাজ করিতেন। কিন্তু রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিলেই তাহাতে আপনাআপনি কতকগুলি দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে,—শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলিতেন "খাদ না দিলে গড়ন হয় না।" জরা, ব্যাধি, মৃত্যু যেমন শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সেইরূপ আনুষঙ্গিক কতকগুলি দুর্ব্বলতাও শরীরের ভিতর আশ্রয় লয়, মানুষ মহামানব হইলেও এই সমস্ত দুর্ব্বলতা কমবেশী পরিমাণে অবশ্য বর্ত্তমান থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও এইরূপ কিছু কিছু দুর্ব্বলতা দেখা যাইত। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি গৃহীলোকের মত স্নেহ সময় সময় প্রকাশিত হইয়া পড়িত। শ্রীশ্রীমাতা বলিয়াছেন,—"তখন তাঁর অসুখ তবুও আমায় তিনশ টাকা দিয়ে তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন,—যিনি নিজে টাকাকড়ি ছুঁতেই পারতেন না।" এই বিষয় লইয়া কামারপুকুরের আত্মীয়স্ত্রীলোকগণ নিজেদের ভিতর আলোচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কাণেও সেই কথা গিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন "ওরে ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালবাসে।" কিন্তু

শ্রীশ্রীমাতা ছিলেন খাঁটি সন্ন্যাসিনী, তিনি সাজিতে ভালবাসিতেন না ;—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাজাইতে ভালবাসিতেন। কখনও বা বিছানায় ছারপোকা হইলে ঠাকুর নিজহস্তে ছারপোকা মারিতেন ; তাঁহার আহারের জন্য তাঁহার জ্ঞাতসারেই সিঙিমাছ জিয়াইয়া রাখা হইত। আবার কোন কাজ করিতে উদ্যত ঠাকুর টিক্‌টিকির ডাক শুনিয়া হাত গুটাইয়া লইতেন। "আজ সকালে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অনিষ্ট চিন্তায় শঙ্কিত ; আবার সংক্রান্তির দিন কোথাও যাত্রা করিতে তাঁহার মন সরিত না। এই সমস্ত কুসংস্কার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গ্রাম হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন, বহুদিনের সাধনভজনও দেহবিজড়িত এই কুসংস্কার সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। অখণ্ড কাল যাঁহার সম্মুখে মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইত, মহাকালের মনোমোহিনী যাঁহার সম্মুখে সর্ব্বদাই বিরাজমানা, সেই সত্যদ্রষ্টা সাধুপুরুষও সাধারণ বিষয়ীর মত কালাকাল বিচার করিতেন। আবার সময় সময় যাঁহার বজ্রাদপি কঠোর মন দেখিয়া মানুষ শঙ্কিত হইত, শোক তাপ মৃত্যুর সম্মুখে যিনি অবিকম্পিত হৃদয়ে বিরাজ করিতেন, সেই সাধুপুরুষকে আত্মীয় স্বজনের দুঃখের কথা শুনিয়া রোদন করিতেও কখনও কখনও দেখা গিয়াছে। ভাগীনেয় হৃদয় নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছে, "শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন। চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল। তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন,—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই।"* মায়ের মত কোমলহৃদয় এইরূপ

---

* একদিন রামদত্ত রাখালের সম্বন্ধে কোনও দোষের কথা উল্লেখ করিলে—"আমি জানতে পেরেছি, সে রাখালের দোষ, রাখালের উপর ভার ছিল"......শ্রীরামকৃষ্ণ রামদত্তকে তাঁহার কথা সম্পূর্ণ করিতে অবসর না দিয়া কতকটা অধৈর্য্যের সহিত বলিয়াছিলেন—"রাখালের দোষ ধর্ত্তে নাই। গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।" ঠাকুরের কথাগুলি স্নেহ ও কোমলতায় পরিপূর্ণ। যুবক রাখালের গলা টিপিলে দুধ বাহির হয় ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক, ঠিক তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহাধীন দুর্ব্বল মনের পরিচায়ক।

সময় সময় ধরা পড়িত। এই সমস্ত দুর্ব্বলতা ছিল বলিয়াই তিনি সেই যুগে সকলের আপনার লোক হইয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে কাছে পাইয়াছিল, নতুবা, শুধু তাঁহার সাধনোজ্জ্বল আত্মার দিকে তাকাইলে মানুষ ভীত হইয়া দূরে সরিয়া যাইত, গড়নে কিছু খাদ ছিল বলিয়াই কোমল হইয়াছিলেন, নতুবা পাথরের দেবতার মত নিশ্চল ও নির্ব্বিকার দেখাইত। তখন হয়ত পূজা করা চলিত কিন্তু দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ভালবাসিতে সাহস হইত না।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

মহাপ্রয়াণ

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, ১৫ই আগষ্ট, রবিবার রাত্রি ১-২ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অনন্ত যাত্রা আরম্ভ হইয়া পরদিন দ্বিপ্রহর প্রায় ১১৷৷০টার সময় শেষ হয় এবং অপরাহ্ণ প্রায় ৫৷৷০টার সময় তাঁহার দেহ লইয়া শিষ্যগণ কাশীপুর শ্মশানঘাটে যাত্রা করেন। রাত্রি ৯টার পূর্ব্বেই তাঁহার চিন্ময় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হয়। মানবজাতির ইতিহাসে ১৬ই আগষ্ট এক চিরস্মরণীয় দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় তাঁহার প্রায় সমস্ত বিখ্যাত ভক্তগণই উপস্থিত ছিলেন অথচ তিলে তিলে প্রতিমুহূর্ত্তে মহাকাল তাঁহার দেহ যেরূপে গ্রহণ করিতেছিলেন তাহার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনা যায় শিষ্যগণ এ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন না। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ইহজীবনের শেষ দিনগুলি এতই বিষাদপূর্ণ, এতই বেদনাদায়ক যে তাহা স্মরণ করিতেও ভক্তগণ শিহরিয়া উঠিতেন। গুরুভক্তি, গুরুপ্রেম তাঁহাদের এতই অধিক ছিল যে ঠাকুরের দেহের প্রতি অণুপরমাণুও তাঁহাদের নিকট প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়তর, সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের শেষ অবস্থার স্মৃতি তাঁহারা মনে আনিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। ঠাকুর একবার দক্ষিণেশ্বরে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে বিরহিণী রাধা শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অঙ্কন করিতেছিলেন। চিত্র সম্পূর্ণ হইলে দেখা যাইল যে শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয় অঙ্কিত করা হয় নাই, পাছে শ্রীচরণ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যান এই আশঙ্কায় রাধা শ্রীচরণ অঙ্কিত করেন নাই। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে,—শ্রীরামকৃষ্ণলীলার সবই পুনঃ পুনঃ বিস্তৃতভাবে শিষ্যগণ আলোচনা

করিয়াছেন, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু মৃত্যুর চিত্র অঙ্কিত করেন নাই; পাছে শ্রীরামকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ভক্তগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ অক্ষয়, অমর ও অনন্ত, তাঁহার লীলাও চিরন্তন। মৃত্যুর কল্পনা জীবনে সীমা টানিয়া দেয়, এই সীমারেখা ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে কখনও স্বীকার করিতেন না। তাই ঠাকুরের ইহজীবনের শেষ দিনগুলির বর্ণনা এত স্বল্প, এত বৈচিত্র্যবিহীন। তথাপি এই সম্বন্ধে ভক্তগণ যাহা স্থানে স্থানে বলিয়া গিয়াছেন অথবা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি একত্র কুড়াইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করা হইল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশে কঠিন ক্যান্সার ক্ষতের সূত্রপাত হয়। সেবার কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে দুরন্ত গরম। দক্ষিণেশ্বরে দ্বিপ্রহরে ভক্তগণ যাতায়াত করিবার সময় বরফ লইয়া যাইতেন, বরফ খাইয়া ঠাকুর বালকের মত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বরফ খাইতে ভালবাসেন, দারুণ গ্রীষ্মে তাঁহার দেহের তৃপ্তি হয়, এই দেখিয়া প্রায় রোজই কেহ না কেহ বরফ আনিতে লাগিলেন। বরফ জল অথবা বরফমিশ্রিত সরবৎ ২।১ মাস খাইতে খাইতে গলায় ব্যথার সূত্রপাত হইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল কলিকাতায় বলরামবাবুর বৈঠকখানায় ঠাকুরের সহিত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের দেখা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"কে জানে বাপু! আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে ভাল হয় বাপু?" মহেন্দ্রনাথ তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের দ্বিতীয়ভাগে লিখিতেছেন ইহাই "শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অসুখের সঞ্চার।" ইহার পর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে দক্ষিণেশ্বরে বলিলেন "মাকে বলেছি, মা, ভাল করে দাও, আর কুল্‌পী খাব না,—বরফও খাব না।" অতিরিক্ত বরফখাওয়াটাই এই ব্যাধির কারণ বলিয়া তখন অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন সুতরাং প্রথম প্রথম সাধারণ প্রলেপের ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল, কিন্তু একটা নিমিত্তমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকাল শরীরের ভিতর আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সেদিন কেহই আশঙ্কা করেন নাই।

গলার ব্যথা আরোগ্য হইল না, কোনদিন কম, কোনদিন বেশী। শিষ্যগণ উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। বৌবাজারে তখন রাখালচন্দ্র হালদার নামক কণ্ঠরোগে বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক বাস করিতেন। ভক্তগণ রাখালচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন, চিকিৎসা হইল কিন্তু উপকার পাওয়া যাইল না। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে পাণিহাটীতে চিঁড়ার মহোৎসব উপলক্ষ্যে সাধুবৈষ্ণব সমবেত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিপ্রহরে নৌকা করিয়া ভক্তসমভিব্যাহারে পাণিহাটীতে আসিলেন। কয়েক ঘণ্টা তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রমধ্যে নৃত্য, গান ও ভাবসমাধির পর ঠাকুর রাত্রি প্রায় ৮॥০ টার সময় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুনঃ পুনঃ ভাবসমাধি, উচ্চকণ্ঠে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও রাত্রিকালে গঙ্গাবক্ষে শীতলবায়ু সেবনের ফলে ঠাকুরের সমস্ত রাত্রি নিদ্রাকর্ষণ হইল না, গলার বিচি আরও কঠিন আকার ধারণ করিল। ঠাকুরের দৃকপাত নাই, কখনও বা গলার বেদনার জন্য ভক্তগণকে বলিতেছেন, আবার পরক্ষণেই হয়ত কালী-নামে তন্ময় হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কিন্তু শিষ্যগণ উত্তরোত্তর অধিকতর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

চিকিৎসা চলিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তমহিলার গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আসিবার কথা ছিল, তদুপলক্ষ্যে পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ সেই বাটীতে সমবেত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বর হইতে সংবাদ আসিল ঠাকুর আসিতে পারিবেন না, গলা হইতে হঠাৎ খানিকটা রক্তস্রাব হইয়াছে। উৎসবের আনন্দ-ধ্বনি কোথায় মিলাইয়া যাইল, দুশ্চিন্তায় ভক্তগণ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

অনেকেই তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন গলার বিচি সাধারণ নহে, ব্যাধি কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে।

আর দেরী করা চলে না, রীতিমত চিকিৎসা করাইবার জন্য শিষ্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা হইতে চিকিৎসক লইয়া যাওয়া ব্যয়-সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ সুতরাং স্থির হইল কলিকাতায় বাড়িভাড়া করিয়া চিকিৎসা করান হইবে। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে গঙ্গার নিকট একটী ছোট দ্বিতল বাড়ি ভাড়া করা হইল এবং তিনদিন পরে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দক্ষিণেশ্বর হইতে এই চিরনির্ব্বাসন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২০।২১ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ যৌবনের প্রথম উদ্দীপনা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীভবতারিণীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল্ অতিবাহিত হইয়াছে, যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ এখন বৃদ্ধ, শরীর জীর্ণ ও ব্যাধিকবলিত। যে মাতৃক্রোড়ে এতদিন ভূমানন্দে বাস করিয়াছিলেন সেই স্নেহের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভক্তগণ আজ তাঁহাকে বিলাসের রঙ্গক্ষেত্র কলিকাতা নগরীতে লইয়া চলিলেন। রজ ও তমোগুণের ধূলিসমাকীর্ণ কলিকাতার বায়ুতে শ্রীরামকৃষ্ণের যেন শ্বাসরোধ হইতেছিল,—শরীর তো অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতই, দক্ষিণেশ্বরের সে উন্মুক্ত বায়ু নাই, গঙ্গার সে অহরহঃ শীতল দর্শন নাই, উপরন্তু মাতৃক্রোড়বিচ্ছিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা মাতৃবিরহে যেন মৌন, শুষ্ক ও প্রভাহীন। কলিকাতায় গভীর রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রাবিহীন চক্ষে হয়ত শ্রীভবতারিণীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত, হয়ত অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় দেবীর পাঁইজরের নূপুরধ্বনি শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিতেন, কখনও বা শ্রীভবতারিণীর বালক মাতৃক্রোড়ের জন্য উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রুদ্ধ কক্ষের আবদ্ধ বায়ুকে আরও উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেন,

হয়ত সেই বিরহের অগ্নিতে তিলে তিলে শ্রীরামকৃষ্ণ শুকাইয়া যাইতেছিলেন,—ভক্তগণ কণ্ঠের রক্তনিস্রাব দেখিতে পাইতেন, চঞ্চল হইতেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ম্মনিস্রাব তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইত না। জীবনদেবতার নিকট হইতে দূরে থাকার যে জ্বালা তাহা অপরে কল্পনা করিতে পারে না—যে জ্বালায় দেহ এমন উত্তপ্ত হয় যে অঙ্গের যে কোন স্থানে শুষ্ক পত্র পড়িলেও তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। তাই আজ সুদূর অতীতের কথা স্মরণ করিয়া মানুষের মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীভবতারিণীর চরণআশ্রয়ে থাকিলেই ভাল হইত, কলিকাতায় ছুটিয়া আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু শিষ্যগণ তাঁহার দেহের ব্যাধি আরোগ্য করিবার জন্য উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশের একটী সামান্য স্ফোটক অনন্তলীলাময়ী শ্রীভবতারিণীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে, শ্রীভবতারিণীর বালক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন—গুরুরূপী বৃদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন করিয়াই হউক ধরিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই ভক্তগণের একনিষ্ঠ সঙ্কল্প। শিষ্যগণ ভুল করিয়াছিলেন কি না আজ তাহা আলোচনা করা বৃথা, কিন্তু এই যে বর্ষকাল শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ও কাশীপুরে চিকিৎসার জন্য বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেই দুর্ব্বিবহ এক বৎসর মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসনের মতই যে তাঁহার ইহজীবনে একটী করুণ ও নিষ্ঠুর অধ্যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়া দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু বাড়িটী তাঁহার পছন্দ হইল না। উন্মুক্ত আকাশে বিচরণশীল পক্ষী যেমন পিঞ্জর দেখিয়া শিহরিয়া উঠে শ্রীরামকৃষ্ণও সেই স্বল্পপরিসরকক্ষযুক্ত বাড়িটী দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও বিরক্ত হইলেন। এই ভাড়াটীয়া বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষণকালও বিশ্রাম না করিয়া তৎক্ষণাৎ ৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে ভক্ত বলরামের বাড়িতে হাঁটিয়া চলিয়া যাইলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং যতদিন ভাল

বাড়ি ভাড়া না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার বাড়িতে থাকিতে ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন। এই বাড়িতে পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার আসিয়াছিলেন সুতরাং এই পরিচিত বাড়িতে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ দিবারাত্র ঘুরিয়া নূতন বাড়ি খুঁজিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। প্রাচীন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ আসিলেন, সঙ্গে আরও ছোটখাট কয়েকজন কবিরাজ পরামর্শদাতারূপে উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের বহুদিনের পরিচয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত তখন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ইঁহার উপর ঠাকুরের আস্থা ছিল। বলরামের বাড়িতে ঠাকুর কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ রোগ সাধ্য, না অসাধ্য?" গঙ্গাপ্রসাদ উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। ভক্তগণ বৃদ্ধ কবিরাজের মৌন অবস্থা হইতে রোগের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন;—বড় ডাক্তার দেখাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

বলরামের বাড়িতে ঠাকুরকে মাত্র সাতদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে অক্লান্তকর্ম্মা ভক্তগণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্যামপুকুর অঞ্চলে শ্রীগোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাহির বাড়িটী ভাড়া করিলেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই বাড়িতে লইয়া আসিলেন। বাড়িটী ছোট হইলেও দ্বিতল। দ্বিতলে দুইটী অপেক্ষাকৃত বড় ঘর ও দুইটী ছোট ঘর ছিল। একটী বড় ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ শয়ন করিতেন, লোকজন আসিলে অপর ঘরটীতে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ছোট ঘর দুইটীর একটীতে শ্রীরামকৃষ্ণমহিষী রাত্রিযাপন করিতেন, অপরটীতে সেবাপরায়ণ ভক্তগণ শয়ন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী অতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন এবং বিশিষ্ট ২।১ জন ভক্ত ভিন্ন

অপর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। শ্রীশ্রীমাতার এই স্থানে আসিয়া ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত ও সেবার ব্যবস্থা করিবার কথা যখন উত্থাপিত হইয়াছিল তখন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন —"সে কি এখানে এসে থাক্‌তে পার্ব্বে ; একবার বলে ছাখ্ যদি আসতে রাজি হয়।" শ্রীশ্রীমাতার সেবাশক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তখন সম্যক্ অবগত ছিলেন না, তাই এই সন্দেহ প্রকাশ। বাড়িতে একটীমাত্র জলের কল ছিল, রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া শ্রীশ্রীমাতা স্নান করিয়া লইতেন। আরও অনেক অসুবিধা ছিল, সে কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ বা ছাত্র, কেহ বা কেরাণী। অর্থ সাচ্ছল্য কাহারও ছিল না, উপরন্তু দিবারাত্র সাধুসঙ্গ করাতে অভিভাবকগণ তাঁহাদের উপর বিরূপ। চিকিৎসার অজস্র ব্যয়ভার বহন করা ইঁহাদের পক্ষে কঠিন হইলেও শিষ্যগণ সাহস হারাইলেন না, ভক্তি ও প্রেমের বলে তাঁহারা পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তিও সরাইয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইলেন। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল—যাঁহার ব্যাধি তিনিই নিজের সমস্ত ব্যবস্থা করাইয়া লইবেন, প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহার ইচ্ছামাত্র আপনি আসিয়া পড়িবে, নির্ব্বিকার নিমিত্তরূপে শিষ্যগণ শ্রীগুরুদেবের সেবাশুশ্রূষা করিয়া যাইবেন।

শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসার পর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি মতে তাঁহার চিকিৎসাভার গ্রহণ করিলেন। সহকারী চিকিৎসকরূপে শ্রীরাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি আরও কেহ কেহ ছিলেন। কিন্তু ব্যাধি বাড়িয়া চলিল, ঠাকুর একদিন ডাক্তারকে বলিলেন —"কাসি হয়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধছে।" প্রত্যেকটী কথা ব্যাধির দুরারোগ্যতা নির্দ্দেশ করিতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ জীবনের সহিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের স্মৃতি নিবিড়ভাবে বিজড়িত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভ হইতে যে চিকিৎসার দায়িত্ব মহেন্দ্রলাল লইয়াছিলেন প্রায় একবৎসর পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। ইহার মধ্যে মহেন্দ্রলালের কতবার যাতায়াত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধুসঙ্গ, কত রকমের ধর্ম্মকথা, সেবা ও পথ্যের জন্য উপদেশ, রোগীর জন্য গভীর রাত্রিতে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া কতই উদ্বেগ!

মহেন্দ্রলাল তখনকার যুগে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। এ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া তিনি অবশেষে হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন, এবং তদানীন্তন বাংলা সমাজে দ্রুতগতিতে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার বাহিরের ঘর রোগীতে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত, তাহাদের ভিতর সাহেব-মেমও ছিলেন। মহেন্দ্রলাল কর্ম্মবীর—তাঁহার বিরাট্ কীর্ত্তি Indian Association of Science। এই বিজ্ঞানমন্দির বাঙ্গালী জাতিকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালীদিগকে বিজ্ঞান চর্চ্চায় অগ্রণী করিয়া দেয়। মহেন্দ্রলাল ঠাকুরের অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড় ছিলেন, ধর্ম্ম বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে কোন মিল ছিল না, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যে নির্ম্মল স্বার্থবিহীন প্রীতি ক্রমশঃ মহেন্দ্রলালের মন অধিকার করিতেছিল তাহার তুলনা শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রথমদিন মহেন্দ্রলাল ভিজিট্ লইয়াছিলেন পরে যখন শুনিলেন যে দরিদ্র শিষ্যগণ ঋণ করিয়া, নিজেদের ব্যবহারের জিনিষ বাঁধা দিয়া গুরুদেবের চিকিৎসার অর্থসংগ্রহ করিতেছেন, ইহলোকের সমস্ত ভোগসুখ, স্নেহের বন্ধন উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্র শ্যামপুকুরে পড়িয়া আছেন, জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ গ্রীষ্মে ছাতা নাই, জুতা নাই, ঔষধ ও পথ্যের যোগাড় করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছেন, তাঁহাদের পিতা নাই, মাতা নাই,

ভাই নাই, বন্ধু নাই,—শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের একমাত্র পরমাত্মীয়,—তখন মহেন্দ্রলালের লজ্জা হইল, তিনি ভিজিট্ লওয়া বন্ধ করিলেন। ভক্তগণের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের ছোঁয়াচ লাগিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মহেন্দ্রলাল শ্যামপুকুরের বাড়িতে আসিয়া স্বার্থত্যাগী, উদারহৃদয় সন্ন্যাসীর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। স্বার্থত্যাগের ছোঁয়াচ হয়ত অনেকেরই লাগে কিন্তু সেই দিব্যস্পর্শ নিজ জীবনে সফল করিবার মত মনের শক্তি সকলের থাকে না। মহেন্দ্রলালের সোণা মাটিচাপা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃশ্য হস্তস্পর্শে মাটি সরিয়া সোণা দেখা দিল। প্রত্যহ মহেন্দ্রলাল আসিতে লাগিলেন, এক একদিন ৩।৪ বার করিয়া আসেন, কখনও কখনও ৬।৭ ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বসিয়া থাকেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল রোগীকে আদেশ দিলেন—"কারুর সঙ্গে কথা কোওনা, গলার ব্যথা বাড়বে, কেবল আমার সঙ্গে কথা কোও।" এই "আমার সঙ্গে কথা" কিন্তু সময় সময় ৬।৭ ঘণ্টা ধরিয়া চলিত এবং তাহাতে গলার ব্যথা বাড়ে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবস্থা ডাক্তারের ছিল না। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন "শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। তাই এতক্ষণ করিয়া বসিয়া থাকেন।" মহেন্দ্রলালের আয়ের ক্ষতি হইতে লাগিল, শ্যামপুকুরে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের মূল্যবান সময় "নষ্ট" হইয়া যায়, রোগীরা অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার দেখা পায় না। ডাক্তার তাহা বুঝিতেন—"তোমরা জান না, আমার actual loss হচ্ছে, রোজ রোজ দুই তিনটে callএ যাওয়াই হচ্ছে না।" কেবল অর্থক্ষতি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের সময় অধিকার করিয়াছেন, শরীর অধিকার করিয়াছেন, আবার মনও অধিকার করিয়া বসিলেন। দিবাভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা, রাত্রিতে তাঁহার জন্য ডাক্তারের দুশ্চিন্তা—দুশ্চিন্তার ছদ্মবেশে পরম সুচিন্তা। একদিন প্রাতঃকালে মহেন্দ্রলালের

এক বৃদ্ধ শিক্ষক ডাক্তারের বাড়িতে দেখা করিতে আসিয়াছেন, ডাক্তার কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন—"মহাশয়, রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে—ঘুম নাই। এখনও পরমহংস চল্‌ছে।'* গভীর রাত্রিতে বিনিদ্র চক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য চিন্তা করিতেছেন—ইহা কি চিকিৎসকের অবস্থা?—ইহা কঠিন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর অবস্থা! ডাক্তার এখন ৫।৬ ঘণ্টা শ্যামপুকুরে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করেন, তখন গলার ক্যান্সারের কথা ডাক্তার ও রোগী কাহারও মনে থাকে না, কি করিতে ডাক্তার সেখানে গিয়াছেন তাহা ভুল হইয়া যায়, আবার রাত্রিতে ৩টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন—রোগের কথা ভাবেন অথবা রোগীর কথা চিন্তা করেন তাহা আজ নির্ণয় করা কঠিন। এইরূপে চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল রোগী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিতে আসিতে কিছুদিনের মধ্যেই উভয়ের সম্বন্ধ মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল—চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল রোগী শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, চিকিৎসক শ্রীরামকৃষ্ণ রোগী মহেন্দ্রলালের মনের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সমস্ত দিনে মহেন্দ্রলাল হয়ত পনর মিনিট শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের চিকিৎসা করেন, দিবসের বাকী ৫।৬ ঘণ্টা এবং গভীর রাত্রিতে কোমল বিলাসশয্যা হইতে মহেন্দ্রলালের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বৈদ্যরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রলালের "বিষয় বিষম তৃষ্ণার" চিরশান্তির জন্য চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কখনও বা চিকিৎসক রোগী, আবার পরক্ষণে রোগীই চিকিৎসক! এইরূপে সুদীর্ঘ এক বৎসর চলিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের এই দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ মহাভাগ্যবান ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনে এক অপূর্ব্ব মাহেন্দ্রযোগ।

* আর একদিন ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন.—"কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার জন্য বড় ভেবেছিলাম। বৃষ্টি হ'ল, ভাব্‌লাম, দোর-টোর খুলে রেখেছে, না কি ক'রেছে, কে জানে!"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণের সময় "কাশীপুর বাগানবাড়ি" নামক একটী বিস্তৃত ভাড়াবাড়িতে ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া আসিলেন। এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ রোগদীর্ঘ আটমাস অতিবাহিত করিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল কিছুদিন যাবৎ ভক্তগণকে বলিতেছিলেন যে উন্মুক্ত স্থান ও বায়ু ঠাকুরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শ্যামপুকুরের বাড়িতে সকলেরই অসুবিধা হইত, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসুবিধা হইত স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের। বাড়ির সামনে অপ্রশস্ত রাস্তা, বাড়ির ভিতরটা যেন 'ঘুপ্‌চী'।* তাই মহেন্দ্রলালের উপদেশ মত বাড়ি খুঁজিতে খুঁজিতে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়ণীর জামাতা শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষের এই বাগানবাড়ি মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যাইল। বাগানের সীমানা প্রায় ১৫।১৬ বিঘা, ফুল ও ফলের গাছে সমগ্র স্থানটী শান্ত ও সুন্দর, ভিতরে দুইটী পুকুরও ছিল। এখানে আসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন, আবদ্ধ ও সঙ্কুচিত দেহ যেন মুক্তবাতাসে প্রসারিত হইয়া গেল, শ্যামপুকুরে অনেক সময় যে বিমর্ষভাব পরিলক্ষিত হইত তাহা দূরীভূত হইল। মানুষের মনের উপর প্রকৃতির এতই প্রভাব! দ্বিতলের একটী কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যা রচিত হইল, সংলগ্ন একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রগৃহে সেবাপরায়ণ শিষ্যগণ বাস করিতে লাগিলেন। সবই ভাল হইল কিন্তু ভাড়া মাসে ৮০৲ টাকা,—দরিদ্র ভক্তগণ কোথা হইতে এতটাকা সংগ্রহ করিবেন! পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর বস্তুও লক্ষ্য করিতেন, বিশেষতঃ শিষ্যদের জীবনসংশ্লিষ্ট অতি তুচ্ছবিষয়ও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতনা। এক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ সুবিধা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ভাড়ার কথাটী ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের মনে বারংবার উদিত হইতে লাগিল। ২।৩

* উপরন্তু বাড়িটী ছাড়িয়া দিবার জন্য বাড়িঅলা কিছুদিনযাবৎ বিরক্ত করিতেছিলেন।

দিন পরেই ঠাকুর একদিন গৃহীভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এই সুরেন্দ্রনাথের অবস্থা সচ্ছল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন যুবকগণ দরিদ্র, "বাড়ির মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ার সম্পূর্ণ ভার তুমি গ্রহণ কর।" সুরেন্দ্রনাথ হৃষ্টচিত্তে অবনতমস্তকে এই সেবার অধিকার গ্রহণ করিলেন। এমন সৌভাগ্য বহুজন্ম ভ্রমণ করিতে করিতে হয়ত একবার আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ইহজীবনের শেষ নিশ্বাসবায়ু বক্ষে ধারণ করিয়া কাশীপুরের এই বাগান আজ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

এই কাশীপুরের বাগানে আসিবার অব্যবহিত কাল পরেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী অপরাহ্ণ বেলা প্রায় ৩টার সময় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইল। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর অনেকটা ভাল, দ্বিতল হইতে নামিয়া নীচের বাগানে বেড়াইতেছেন। এখানে আসার পর হইতে আর কোনদিন ঠাকুর নীচেয় নামেন নাই, সুতরাং আজ তাঁহাকে বাগানে বেড়াইতে দেখিয়া, তাঁহার অপেক্ষাকৃত সুস্থতা অনুমান করিয়া, ভক্তগণের আনন্দের সীমা ছিল না—যেন একটা দমকা বাতাসে জমাটবাঁধা মনের গুমোট কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার ১লা জানুয়ারী ছুটি বলিয়া প্রায় ত্রিশজন গৃহীভক্তও কাশীপুরে সমবেত হইয়াছেন,—কেহ বা দ্বিতলের ঘরে, কেহ বা গাছতলায় বসিয়া আছেন।

"অপরাহ্ণ বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটী পিরাণ, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কাণঢাকা টুপি ও চটী জুতাটি পরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের সহিত উপর হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন এবং নীচেকার হলঘরটী দেখিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুর ঐরূপে বেড়াইতে যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।...শ্রীযুক্ত লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁহাদিগকে ঐরূপে

কাশীপুর বাগানবাড়ী
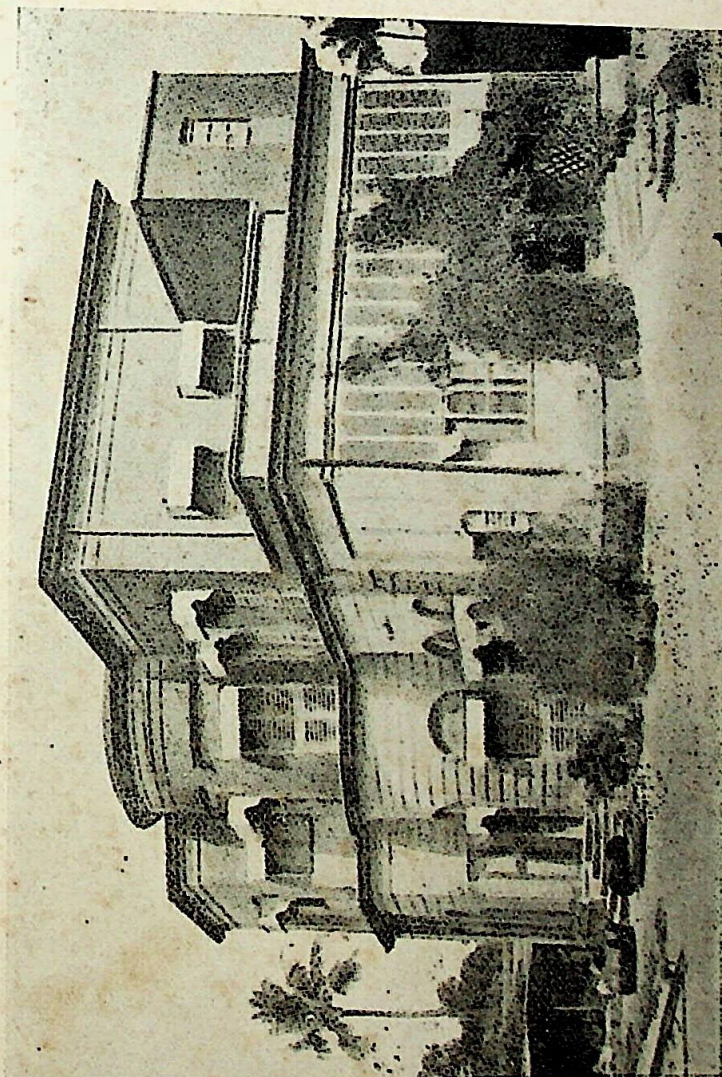
যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের সহিত স্বয়ং আর অধিকদূর যাওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া হলঘরের সম্মুখের ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটির দক্ষিণ পাড় পর্য্যন্ত আসিয়াই ফিরিলেন এবং একজন যুবক ভক্তকে (শরৎ মহারাজ) ডাকিয়া লইয়া ঠাকুর উপরে যে ঘরটীতে থাকেন সেটী ঝাঁট-পাট দিয়া পরিষ্কার করিতে ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে ব্যাপৃত হইলেন।......

"ঠাকুর ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত পথটী দিয়া বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পথের ধারে আমগাছের ছায়ায় শ্রীযুত রাম ও শ্রীযুত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন এবং গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অত কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) যাকে তাকে বলে বেড়াও?"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবিলেন ঐরূপ প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ভাষায় মুখোমুখি জিজ্ঞাসিত হইয়া গিরিশ ভয় পাইবেন এবং তাঁহার মুখরতা চিরদিনের জন্য নীরব হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিলেন ভক্তকে এড়াইবার জন্য, স্ব-স্বরূপকে আচ্ছাদন করিবার জন্য, কিন্তু ভক্তের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল, ভক্তের নিকট ভক্তের ইষ্টদেবের পরাজয় ঘটিল। ঠাকুরের কথা শুনিয়া গিরিশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুরের পথরোধ করিয়া তাঁহার পদতলে জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবিষ্ট হইলেন, অশ্রুতে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, ভক্তিপ্রবাহে কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতে লাগিল। গিরিশ বলিলেন—"ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি!" যুক্তি নাই, তর্ক নাই, শুধু অচল অটল সুমেরুবৎ বিশ্বাস! শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভক্তির পর্ব্বতকে ঠেলিয়া দিয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল,

মন উচ্চভূমিতে উঠিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। গিরিশ তখন ঠাকুরের সেই সমাধিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" "জয় রামকৃষ্ণ' শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া বারংবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশ কাটাইয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা বিফল হইল, তিনি ভক্তের নিকট ধরা পড়িলেন। ইহার পরক্ষণেই যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে এইরূপে ভক্তের নিকট তাঁহার ইষ্টদেবের পরাজয় এই বঙ্গদেশে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আর একবার যেরূপে হইয়াছিল তাহা পাঠকগণকে স্মরণ করাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে।

সে দিন শ্রীচৈতন্যের পরমভক্ত শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যদেবকে ধরিয়া বসিয়াছেন, মন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা,—কোনদিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে রামানন্দ সন্ন্যাসীরূপেই দেখিতেছেন; আবার কখনও কখনও দেখিতেছেন সম্মুখে শ্যামবর্ণ গোপবালক, গোপবালকের সম্মুখে কাঞ্চন পঞ্চালিকা, আর সেই কাঞ্চনবর্ণা সুন্দরীর গৌরকান্তিতে শ্যামঅঙ্গ যেন উজ্জ্বল হইয়া 'উঠিতেছে। এই সন্দেহের নিরাকরণের জন্য রায় রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ধরিয়া বসিলেন।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুই শ্যাম গোপরূপ।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যামঅঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে দেখিয়ে মাত্র সবংশীবদন
নানাভাবে চঞ্চল সদা কমলনয়ন।

এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার,
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ধরা দিবেন না, ভক্তের নিকট আত্মগোপন করিতে উৎসুক। এইরূপে ভক্তচক্ষু হইতে আত্মগোপন করিবার প্রয়াস যুগে যুগে হইতেছে, ভক্ত কিন্তু ইষ্টদেবকে ধরিয়া ফেলিতেছে,—এই আত্মগোপনের চেষ্টা ও এই ধরাপড়া, ইহা লইয়াই যুগযুগান্তরের অনন্তলীলা! শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেমা হয়
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়।

রামানন্দ অত সহজে শ্রীগৌরাঙ্গকে ছাড়িলেন না।

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভূরি
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।
আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার
এবে যে কপট কর কোন ব্যবহার।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন,—রামানন্দের সমস্ত সাধনভজন ইষ্টদেবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল।

তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাল স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।
দেখি রামানন্দ হইলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥

ঠিক্ এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ভাষায় নির্ব্বাক করিয়া নিঃশব্দে চুপে চুপে ইহজীবনের অন্তরালে চিরপ্রয়াণ করিবার চেষ্টা করিয়া গিরিশের ভক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। গিরিশের বারংবার জয়ধ্বনি শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অর্দ্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইল, তিনি হাসিতে হাসিতে চতুর্দ্দিকে সমাগত

ভক্তবৃন্দের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"তোমাদের কি আর বলিব, সকলের চৈতন্য হোক্।" আর কি দিবেন! ধনৈশ্বর্য্য তো তাঁহারা মৃৎপিণ্ডের মত তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা মহারাণীর নিকট লাউ কুমড়া ভিক্ষা করিতে আসেন নাই; তাঁহাদের লোভের সীমা ছিল না— তাঁহারা অমৃত ফলের ভিখারী। আর যাহাই দিতেন, দুই দিন পরে ফুরাইয়া যাইত কিন্তু আজ যাহা পাইলেন তাহা জন্মজন্মান্তরের সম্বল। তাই অভয়বাণীর পুষ্পবৃষ্টিতে ভক্তগণ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, আনন্দে 'জয়' 'জয়' রব করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। "প্রথমব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপ অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া নীচের দিক্ হইতে উপর দিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন—"চৈতন্য হোক্।" দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও ঐরূপ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ। চতুর্থকেও ঐরূপ। এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে চীৎকার ও জয় রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া, কেহ বা নিদ্রাত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন উদ্যানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।......উপস্থিত ভক্তমণ্ডলের মধ্যে দুইজনকে কেবল ঠাকুর "এখন নয়" বলিয়া ঐরূপে স্পর্শ করেন নাই এবং তাঁহারাই কেবল ঐ আনন্দের দিনে আপনাদিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।"

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু। সমস্ত দিন ধরিয়া ভক্তগণের আনন্দ-প্রবাহ হইতে নিরন্তর এই অশরীরী বাণী উত্থিত হইতে লাগিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু মূলে রই
যখন যে ফল বাঞ্ছা সে ফল প্রাপ্ত হই।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বসন্তের আনন্দের মত আপনাকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া ভক্তগণ এখনও প্রতিবৎসর ১লা জানুয়ারী উৎসব করিয়া থাকেন।

এইবার শিষ্যগণের অপূর্ব্ব সেবা ও ভক্তির কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। আমাদিগকে প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধি সাধারণ নহে—দুরারোগ্য প্রবল বেদনাদায়ক ক্যান্সার; দ্বিতীয়তঃ মাত্র কয়েকদিনের জন্য সেবা অথবা রাত্রিজাগরণ নহে; দীর্ঘ একবৎসর ব্যাধি চলিয়াছিল, দিনের পর দিন কঠিন হইতেও কঠিনতর আকার ধারণ করিতেছিল; তৃতীয়তঃ অর্থের অনটন। রোগীর জন্য, সেবকদের জন্য অজস্র অনিয়ন্ত্রিত ব্যয়, অথচ অন্তরঙ্গ সেবকগণের মধ্যে কেহই বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম নহেন, কেহই সংসারে স্বাধীন নহেন। গৃহীগণ এই প্রতিকূল অবস্থাগুলি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বাড়িতে একটা টাইফয়েড্ রোগী মাসাধিক কাল ভুগিলেই অর্থাভাবে গৃহস্থের বিরক্তির উদয় হয়, দীর্ঘকাল সেবা করিতে হইলে হয়ত পরমাত্মীয়েরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, অকারণে রোগীর প্রতি এবং অপর লোকের প্রতিও মানুষ রূঢ় হইয়া পড়ে, শ্রীভগবানের প্রতি বিশ্বাস একেবারে না হারাইলেও অনেক সময় যেন শিথিল হইয়া আসে। কাশীপুরে সব প্রতিকূল অবস্থাই ছিল—বর্ষকাল ধরিয়া রোগীর সেবা, পূ্ঁজরক্তের ছড়াছড়ি, অর্থের অনটন—কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গ, ঘৃণা অথবা বিরক্তি, মুহূর্ত্তের জন্যও আনয়ন করিতে পারে নাই। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মহিমা, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণের অপূর্ব্ব গৌরব। একটীমাত্র সম্বল ভক্তগণের অপরিমিত পরিমাণে ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁহারা ভাবিতেন ব্যাধি শ্রীরামকৃষ্ণের ছলনামাত্র, ভক্তগণকে পরীক্ষা করিবার,—ভক্তগণকে

শিবজ্ঞানে জীবসেবার অধিকারী করিবার একটা কৌশল মাত্র। যদি চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, সেবকের প্রয়োজন হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগমাত্রেই তাহা সংগৃহীত হইবে—ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। ইহা গীতার সেই অমৃতময়ী বাণীর জীবন্ত উদাহরণ—"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যেন শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের মনের এই নীরব অবস্থাকে ভাষার রূপ প্রদান করিয়াছেন।

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি॥

পতাকা শ্রীরামকৃষ্ণের, পতাকা বহন করিবার শক্তিও শ্রীরামকৃষ্ণের, সুতরাং ভক্তগণের ভয়েরও কারণ নাই, সেবার অহঙ্কারেরও কারণ নাই।

ভক্তগণের এইরূপ মাতার মত সেবা ও পর্ব্বতটলান বিশ্বাসের অসংখ্য উদাহরণের ভিতর হইতে কয়েকটী মাত্র উল্লিখিত হইতেছে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "এ সময় কি কোথাও আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়েছে, আমলকী চিবুলে বোধ হয় পরিষ্কার হ'ত।" বাজারে হাটে আমলকী খোঁজ করা হইল, পাওয়া যাইল না। ভক্তপ্রবর দুর্গাচরণ নাগ কথাটা শুনিলেন। তিনি ভাবিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প, তাঁহার যখন আমলকী খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে তখন সে ইচ্ছাপূরণের উপায়ও পূর্ব্ব হইতে হইয়া আছে, কেবল চেষ্টা করিলেই হইল। নাগ মহাশয় বাড়ির বাহির হইয়া যাইলেন, দুই দিন তাঁহার দেখা নাই, কেহ বা তাঁহার জন্য ভাবিতেছেন, কেহ বা মনে করিতেছেন তিনি অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এদিকে সাধু নাগ মহাশয় কলিকাতার উপকণ্ঠে চতুর্দ্দিকের বাগানগুলিতে দুই দিন ধরিয়া আমলকী খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, স্নান নাই,

আহার নাই, নিদ্রা নাই—রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া চিন্তা পরদিন আবার কোথায় আমলকী খুঁজিতে যাইবেন। তৃতীয় দিবসে কোন এক বাগানের গাছ হইতে আমলকী সংগ্রহ করিয়া নাগ মহাশয় কাশীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর একটী ঘটনা। রোগ কঠিন আকার ধারণ করিলে ক্ষতস্থান হইতে অনবরত পুঁজরক্ত মিশ্রিত লালা নিঃসৃত হইত এবং মুখ মুছিবার জন্য একটী গামছা সর্ব্বদাই ঠাকুরের কাছে থাকিত। কিছুক্ষণ অন্তর সেই গামছাখানি ভক্তগণের মধ্যে কেহ না কেহ ধুইয়া আনিতেন। একদিন গামছা ধুইবার সময় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কি একটু ত্রুটি হইল, ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে একটি চড় বসাইয়া দিলেন। শিক্ষিত, বয়স্ক, সম্মানী হেডমাষ্টার অসংখ্য লোকের সম্মুখে চড় খাইলেন, কিন্তু অভিমান হইল না, অবনত মস্তকে সেই শাস্তি গ্রহণ করিলেন। প্রায় ঊনচল্লিশ বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই চড়ের কথা স্মরণ করিয়া মহেন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন "গুরু বাপের মত চড় দেন আবার মায়ের মত স্নেহ করেন। আমি সত্যিকার চড় খেয়েছিলাম। ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানে ছিলেন তখন এক চড় বসিয়েছিলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের "চড়" স্মরণ করিয়া সুদীর্ঘকাল পরে বালকের মত বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ রোদন করিলেন, কাপড় দিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"তাঁকে কি ভোলা যায়? কোন্ গুণে যে আমাদের ওপর তাঁর এত কৃপা তা কে ব'লতে পারে!" ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের সেই একটী 'চড়', ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাহার জীবন্ত স্মৃতি; সেদিনকার 'চড়' —আজিকার অশ্রুজল—একবার ভাবিয়া দেখিলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শিষ্যগণের মধুর সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আর এক দিনের ঘটনা। সেদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল আসিয়া শিষ্যগণকে একান্তে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে ক্যান্সার রোগ বড়ই সংক্রামক শিষ্যগণ যেন জলপান অথবা আহারাদির সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত কোন পাত্রাদি গ্রহণ না করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ইহা "শিষ্যগণকে বহুবার

বুঝাইয়া দেন।” সিষ্টার নিবেদিতা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের মুখে এই ঘটনা শুনিয়া লিখিয়াছেন—“অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নরেন্দ্র আসিলেন এবং দেখিলেন উঁহারা একত্র হইয়া রোগের বিপজ্জনকত্বের আলোচনা করিতেছেন। তিনি, ডাক্তার কি বলিয়া গিয়াছেন নিবিষ্টচিত্তে শুনিলেন এবং তৎপরে মেজের দিকে তাকাইয়া পায়ের গোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট পায়েসের বাটীটি দেখিতে পাইলেন। গলদেশের খাদ্যবহা নলীটীর সঙ্কোচবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিতে অনেকবার ব্যর্থচেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা তাঁহার মুখ হইতে বারবার বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ দুঃসাধ্য রোগের বীজাণুপূর্ণ শ্লেষ্মা ও পূঁজ নিশ্চয়ই তাহার সহিত ছিল। নরেন্দ্র বাটীটি উঠাইয়া লইয়া সর্ব্বসমক্ষে উহা নিঃশব্দে পান করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথা আর কখনও শিষ্যগণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই।” অসংখ্য এরূপ ঘটনার ভিতর হইতে মাত্র কয়েকটী উল্লিখিত হইল। ইহা হইতে শিষ্যগণের অপূর্ব্ব সেবা, বিশ্বাস ও ভক্তি কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা যাইবে।

এদিকে দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিল, বর্ণ মলিন হইয়া আসিল, মুখ কৃশ ও লম্বা দেখাইতে লাগিল। অস্থিপঞ্জর যেন গোণা যায়! আহার নাই বলিলেই চলে, তরল পদার্থও গলাধঃকরণ হয় না, কিছু বা যায়, কিছু বা বাহির হইয়া আসে। অশেষ যন্ত্রণার সময় ঠাকুর কাঁদেন, 'মা' 'মা' বলিয়া বালকের মত শ্রীভবতারিণীকে স্মরণ করেন। একদিকে ইহাই ব্যাধিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের চিত্র, কিন্তু ইহারই আর একটা বিচিত্র দিক্ ছিল। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদা আনন্দময়, ব্যাধিনিরপেক্ষ, দেহনিরপেক্ষ। “The haemorrage terrified them (devotees). But the Master looked as cheerful as ever.” (গলদেশ হইতে রক্তস্রাব দেখিয়া ভক্তগণ ভয় পাইলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময়।) এই উচ্চ অবস্থায়

ঠাকুর প্রায় সমস্ত দিবারাত্রই থাকিতেন, কেবল সময় সময় দেহ নিজের অস্তিত্বের কথা জোর করিয়া মনে পড়াইয়া দিত তখন রোগযন্ত্রণায় ঠাকুর কাতর হইয়া পড়িতেন। কিন্তু দেহ ধারণের এই অবশ্যম্ভাবী ফল বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না।* আবার ইহারই ভিতর ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের কল্যাণের জন্য চিন্তা করিতেন—"দেখ, পূর্ণ দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন ক'চ্ছে।" সর্ব্বভূতে অহরহঃ ব্রহ্মদর্শন করিতেন—"ঐ নোটো মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, আমি দেখ্‌ছি তিনিই বসে রয়েছেন।"

কিন্তু তখনকার দিনে এই ব্যাধি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণকে ব্যথিত করিত, তাঁহাদের মনে সন্দেহের উদয় হইত—এমন পবিত্র চিন্ময় দেহে এই কুৎসিত ব্যাধির আশ্রয় কি করিয়া সম্ভবপর হইল! প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে আজিও অনেকের মনে সেই প্রশ্নই উদিত হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের মনেও একদিন এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল—"এই দেহ কখনও কোন অন্যায় করে নাই, তবু এতো যন্ত্রণা কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন লোকে বিভিন্নরূপে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তপ্রবর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়াছেন—"ইহাই Crucifixion," অর্থাৎ মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মোৎসর্গ, দুঃখভোগ নিজের জন্য নহে, ইহা সমগ্র মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত।** শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে মনে করিতেন যে বিষয়ী জীবগণ কামনাকলুষিত মন লইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে, ব্যাধির যন্ত্রণা তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল;

---

*তখন কেহ যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিলে ঠাকুর হাসিয়া বলিতেন—"দেহ জানে দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।"

**মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তও লিখিয়াছেন—"সমুদ্রমন্থনের হলাহল শিব পান করিয়া আপনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও আমাদের পাপ-বিষ ধারণ করিয়া সেই বিষের অসহ্যজ্বালা আপনি সহ্য করিলেন।"

আবার কেহ কেহ মনে করেন প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যে দেহধারণ করিতে হয় ব্যাধি তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গ মাত্র—ব্যাধি দেহের ধর্ম্ম, কোনও সাধনভজনই দেহের এই ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র দেহে এই ব্যাধি সঞ্চারের কারণ যাহাই হউক না কেন এই দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাধির ফলস্বরূপে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসমাজে যে মহান পরিবর্ত্তনের উদয় হইয়াছিল তাহা সহজেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন তখন গৃহী অথবা সন্ন্যাসী বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা,—সকলেই যাতায়াত করেন, কেহ কেহ ইচ্ছামত ২।৩ দিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেন মাত্র। কিন্তু কঠিন ব্যাধির সময় শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন তখন সেবা ও চিকিৎসার অনুরোধে ভক্তগণের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ হইয়া গেল। কয়েকজন ভক্ত বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন, অর্থোপার্জ্জন বিসর্জ্জন দিয়া অহরহঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বাস করিতে লাগিলেন, অপর ভক্তগণ প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য করিলেন, উপদেশ দিলেন, মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধির সময় সেবা ও ত্যাগের উত্তাপে কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-আধারে একাকার হইয়া গেল, কাহারও পৃথক্ সত্তা রহিল না। এইরূপে একদিকে সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সৃষ্টি হইল, অন্যদিকে গৃহী ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ ছিলেন এখানেও সেইরূপ গৃহীভক্তই রহিয়া গেলেন। একদল মৌমাছিতে পরিণত হইলেন,—মধু ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাঁহাদের রতি নাই; অন্যদল মক্ষিকাই থাকিয়া গেলেন,—মধুও ভাল লাগে, দুষ্টক্ষতেও অনাসক্তি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘরোগভোগের ফলে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে এইরূপে শ্রেণিবিভাগ হইয়া গেল।

এইরূপ জাতিভেদেই সমস্ত শেষ হইল না। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের

আত্মা, অহরহঃ সংস্পর্শের ফলে, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে তিলে তিলে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাই যখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের অনুরোধে গলার ক্ষত দেখাইয়া শ্রীভবতারিণীকে বলিয়াছিলেন—"এইটের দরুণ খেতে পারিনা, যাতে দুটি খেতে পারি ক'রেদে", তখন শ্রীভবতারিণী অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে দেখাইয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্।" শ্রীভবতারিণী যাঁহাদিগকে দেখাইয়া ঠাকুরকে এই কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই উত্তরকালে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, সে দেখানর মধ্যে একজনও গৃহীভক্ত ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধির রহস্য যাহাই হউক না কেন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে গৃহী ও সন্ন্যাসীভক্তের মধ্যে এই যে শ্রেণিবিভাগ দাঁড়াইয়া গেল, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাসীসঙ্ঘ গঠিত হইতে লাগিল।

এইরূপে দিন চলিতেছিল,—মহাপ্রয়াণের আর আটদিন মাত্র বাকী। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীন মহারাজকে ডাকিয়া পাঁজি দেখিতে বলিলেন। কেন পাঁজি দেখিতে বলিলেন তাহা যোগীন মহারাজ বুঝিতে পারিলেন না, কোন প্রশ্নও করিলেন না। আদেশমত যোগীন মহারাজ ২৫ শে শ্রাবণ অর্থাৎ ৯ই আগষ্ট হইতে দিনগুলি দেখিতেছেন এবং তিথি, বার, নক্ষত্র সমস্ত পড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইতেছেন। যোগীন পড়িতে পড়িতে যখন ৩১শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট তারিখে আসিলেন তখন হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ হাত নাড়িয়া যোগীন মহারাজকে পড়া বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। দিনের মধ্যে ঠাকুর কি দেখিতেছিলেন তাহা যোগীন মহারাজ সেদিন বুঝিতে পারেন নাই, অপরের পক্ষে আজ তাহা অনুমান সাপেক্ষ মাত্র।

মহাপ্রয়াণের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘরে তখন আর কেহই ছিলেন না। ঠাকুর কোন কথা

না বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং স্থিরদৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল,—নরেন্দ্রনাথ নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন, যেন কিসের প্রতীক্ষা। ক্রমে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, যেন কি একটা বৈদ্যুতিক শক্তি দেহের ভিতরে অনুভব করিতেছেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথেরও বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ, নরেন্দ্রনাথ বাহ্যজ্ঞানরহিত। কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল তাহার হিসাব আজ কেহই জানেনা। যখন নরেন্দ্রনাথ সংজ্ঞালাভ করিলেন তখন দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ এই অশ্রুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন "আজ তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হলাম। এই শক্তিতে তুই অনেক কাজ ক'র্ব্বি, তারপর ফিরে যাবি।" এইরূপে দেহত্যাগের মাত্র ৩।৪ দিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণসাধনশক্তি নরেন্দ্রনাথের ভিতর পূর্ণরূপে সঞ্চারিত হইয়া নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম্মের প্রধান পুরোহিতরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। সেদিন কণ্ঠনালীতে ভীষণ যন্ত্রণা, তখন মহাকাল শ্রীরামকৃষ্ণের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্পষ্ট শব্দ করিতেছেন, কথা বলিবারও শক্তি নাই। এমন সময়ে পাশে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতেছেন—"যদি দেহের এই যন্ত্রণার সময় ঠাকুর নিজেকে অবতার বলিতে পারেন তাহা হইলে ইঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস হয়।" সেই মুহূর্ত্তে ক্রোড়ের দিকে অবনমিত মস্তক ধীরে ধীরে উচ্চ হইল, সমস্ত কাতরধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেল, কণ্ঠনালীর ক্লেদ ও জড়তা অপসারিত হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাভাবিক স্বচ্ছ কণ্ঠে বলিলেন—"যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং এই

দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ।" একদিকে মনের নিভৃত প্রদেশে সযত্নে লুক্কায়িত সন্দেহ, অন্যদিকে দৃঢ়কণ্ঠে সহজ ভাবায় সেই সন্দেহের নিরাকরণ। একদিকে শ্রীগুরুদেবের উপর মনের অনন্ত বিশ্বাস, অন্যদিকে দেহের জড়তাসম্ভূত সন্দেহ,—শিষ্যগণের এই দ্বিধাবিভক্ত মনের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণকে বহুবার পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। কোন শিষ্য গভীর রাত্রিতে উঠিয়া শ্রীগুরুদেবকে সন্দেহ করিতেছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ত গোপনে সহধর্ম্মিণীর নিকট গমন করিয়া থাকেন; কোন শিষ্য নিদ্রিত শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে নিঃশব্দে রৌপ্যমুদ্রা স্থাপন করিয়া তাঁহার কাঞ্চনত্যাগের পরিমাণ গ্রহণ করিতেছেন; কোন শিষ্য মুমূর্ষু মহাপুরুষের ঐশী প্রকাশ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পরীক্ষার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে মনে মনে গুরুদেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সকল ক্ষেত্রেই ভক্তবৎসল ইষ্টদেব অক্রোধ পরমানন্দ, বিরক্তি নাই, তিরস্কার নাই, শিক্ষকের সম্মুখে সুশীল ছাত্রের মত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছেন। সে যুগে শিষ্যগণ শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন, আজ অর্দ্ধশতাব্দী পরে সেই কথা স্মরণ করিলেও মানুষের মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১৫ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার। আজ সকাল হইতেই ঠাকুরের কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণা, কিছুই খাইতে পারিতেছেন না, শরীর অস্থির, নাড়ি ক্ষীণ অথচ দ্রুতগামী, মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ কখন চঞ্চল, কখনও কাতরধ্বনি করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই অস্ফুটস্বরে শ্রীভগবানের লীলারহস্য আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু শিষ্যগণ বুঝিয়াছেন আজ রোগীর সঙ্কটাবস্থা, আজিকার সমস্ত লক্ষণই মৃত্যুর ইঙ্গিত করিতেছে। এদিকে নির্জ্জনকক্ষে বসিয়া শ্রীশ্রীমাতার ভীরু হৃদয় মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে—সবই খারাপ লক্ষণ দেখিতেছেন। শ্রীশ্রীমাতা বলিয়াছেন—"সকাল থেকেই ওলট্ পালট্

হ'তে থাক্‌ল। ছেলেদের জন্যে খিচুড়ি রাঁধছিলুম, ধ'রে গেল—ওপর ওপর তাদের দিয়ে তলারটা আমরা খেলুম। আমার একখানা লালপেড়ে কোঁচান দিশী সাড়ি ছেল—কি জানি কোথায় গেল।—···জলের কুঁজোটা ছেল—তুল্‌তে গিয়ে হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল।" সময় যেন কাটেনা, সূর্য্যের গতি মন্থর হইয়া গিয়াছে, ব্যাধির যন্ত্রণা ও অনাগতের আশঙ্কার প্রতিমুহূর্ত্ত পাথরের মত ভারি ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে। অপরাহ্ণকালে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় দুইঘণ্টাকাল থামিয়া থামিয়া যোগসম্বন্ধে সমবেত ভক্তগণকে উপদেশ দিলেন। কণ্ঠস্বর অতিক্ষীণ তথাপি সুস্পষ্ট, ভাষা স্বচ্ছ ও সহজ বোধ্য। এই যোগসম্বন্ধে উপদেশ নিগূঢ় অর্থপূর্ণ। আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই এই মহাপুরুষ যোগারূঢ় হইয়া দেহত্যাগ করিবেন, যোগাবস্থায় প্রায় ১০।১১ ঘণ্টা অবস্থান করিবেন, তাই যোগের কথাটাই আজ তাঁহার মনে হঠাৎ উদিত হইতেছে, যোগের আলোচনাই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী এই সন্ন্যাসীর শরীর ও মনের যে দ্বন্দ্ব তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। চিরদিনের সাধনে অভ্যস্ত মন শরীরের নিকট কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিতেছে না, অথচ কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন, দেহ কৃশ ও দুর্ব্বল, মৃত্যু শিয়রে দণ্ডায়মান। দেহকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই; অথচ মন চিরজয়ী,—দেহের সঙ্গে থাকিলেও দেহের বশীভূত নহে। তাই এই শেষ দিনে আমরা দেখিতে পাই ভগবৎ চিন্তায় পরিশুদ্ধ মন কিরূপে বারংবার দেহের আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে স্বকার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নাভিশ্বাস দেখা দিল, শিষ্যগণ কাঁদিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ কাঁদিতেছেন, সর্ব্বত্যাগী সাধুরা কাঁদিতেছেন,—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাতার ক্রন্দন, পিতার দীর্ঘশ্বাস, আবার কেহ কেহ সহধর্ম্মিণীর করুণ মিনতি, সবই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে নাই, ইঁহারা সেই

সন্ন্যাসী। আজ দক্ষিণেশ্বরের দরিদ্র ব্রাহ্মণের শেষ মুহূর্ত্ত দেখিয়া ইঁহারা কাঁদিতেছেন,—শ্রীভবতারিণীর এমনই অপূর্ব্ব লীলা!

সন্ধ্যা প্রায় ৭টা। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন ক্ষুধা পাইয়াছে। দুইজন ভক্ত ঠাকুরকে ধরিয়া বালিশের ঠেসান দিয়া বসাইয়া দিলেন ও ধরিয়া রহিলেন। বার্লি দেওয়া হইল, অতি সামান্য গলাধঃকরণ হইল, অধিকাংশ বাহির হইয়া পড়িয়া গেল। ভক্তগণ ঠাকুরের মুখ ধোয়াইয়া, পরিষ্কার করিয়া, তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন, উঁচু করিয়া বালিশ দিয়া চরণদ্বয় ছড়াইয়া তাহার উপর রক্ষা করিলেন। দুইজন শিষ্য দুই পাশে বসিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমশীতল পদদ্বয় হাত দিয়া ঘসিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুইয়া আছেন, চক্ষের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবৎচিন্তন করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুরের সমাধি হইল—শরীর মুহূর্ত্তমধ্যে কঠিন হইয়া উঠিল। পাখাহস্তে পার্শ্বে অবস্থিত শশী মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ) এই সমাধির মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিলেন যাহাতে তাঁহার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, শশী মহারাজ কাঁদিতে লাগিলেন। শশী মহারাজের ক্রন্দন দেখিয়া অন্য ভক্তগণেরও অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল

নিস্তব্ধ রাত্রি, নিস্তব্ধ কক্ষ! শ্রীরামকৃষ্ণের স্পন্দরহিত চিন্ময় দেহ লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছে, বাহিরে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ভক্তমণ্ডলী বসিয়া আছেন, মুখে কথা নাই, চক্ষে অবিরল ধারা। শশী মহারাজ সমাধিস্থ দেহকে তখনও বাতাস করিতেছেন। দেবতারা কাঁদে না, মায়াবিষ্ট মানুষ কাঁদে। এই সাধুরা মায়াধীন নহেন, অমৃতভোগী দেবতাও নহেন, তথাপি ইঁহারা কাঁদিতেছেন। সাধুরা কাঁদিতেছেন—জীবনের কি অপূর্ব্ব রহস্য!

রাত্রি প্রায় ১২টা। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিলেন ক্ষুধা পাইয়াছে। ধ্বংস হইবার পুর্ব্বে চিন্ময় অথচ পঞ্চভৌতিক-

দেহ এইরূপে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়া বারংবার আপনার অস্তিত্ব জানাইয়া দিতেছিল। দেহত্যাগের আর দেরী নাই, তাই শরীর হয়ত অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, কণ্ঠনালী শুকাইয়া যাইতেছিল, দেহের এই আভ্যন্তরিক অস্থিরতা ও কণ্ঠনালীর শুষ্কতাই ঠাকুরের নিকট ক্ষুধা বলিয়া মনে হইতেছিল। ভক্তগণ সাবধানে শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলিয়া বসাইয়া দিলেন, পৃষ্ঠদেশে ৪।৫টী বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দেওয়া হইল, শশী মহারাজ ঠাকুরকে ধরিয়া রাখিলেন। এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে ছোট এক বাটী দুধবার্লি প্রায় নিঃশেষে পান করিলেন। বহুদিন এত অধিক পরিমাণে তরল পদার্থ একসঙ্গে এত সহজে ঠাকুর খাইতে পারেন নাই। খাওয়া শেষ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, শিষ্যগণের মুখের দিকে তাকাইয়া সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন শরীর তৃপ্ত হইয়াছে। তখন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"এইবার শুয়ে পড়ুন, একটু ঘুমোন।" শ্রীরামকৃষ্ণ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শিষ্যগণ ধীরে ধীরে বালিশগুলি গুছাইয়া দিতেছেন, চাদর টানিয়া সোজা করা হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বচ্ছ পরিষ্কার কণ্ঠে তিনবার "মা কালী" "মা কালী" "মা কালী" শব্দ উচ্চারণ করিলেন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কণ্ঠনালী হইতে এরূপ মধুর, সুস্পষ্ট, ক্লেদ ও শ্লেষ্মাবর্জ্জিত ধ্বনি বহুদিন বাহির হয় নাই। ইহা রুগ্নকণ্ঠের ক্ষীণ কাতরশব্দ নহে, ইহা যেন বজ্রমন্দ্রিত গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি। ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠোত্থিত এই শেষ শ্রীকালীধ্বনি প্রশস্ত কক্ষে ভাসিতে ভাসিতে ভক্তগণের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে বাহিরের নিস্তব্ধ বায়ুতে দূর হইতে দূরান্তরে শ্রাবণের জ্যোৎস্না-পুলকিত আকাশে বিলীন হইয়া গেল। আজ শ্রীরামকৃষ্ণবক্ষে অর্দ্ধশতাব্দীর উর্দ্ধকাল অবরুদ্ধ শ্রীকালীধ্বনি ছুটি পাইয়াছে, কোথায় সে ধ্বনি ছুটিয়াছে ক্ষ্যাপা গেরুয়া-পরা বাউলের মত, দিগদিগন্তে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য, যে শুনিতে চাহে সে শুনিতেছে, যে শুনিতে চাহে না তাহারও কর্ণে এই

ধ্বনি জোর করিয়া প্রবেশ করিতেছে। বায়ুসমুদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্ত-কাল ধরিয়া চলিবে সেই অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী, সেই মহাশক্তিশালী সাধুকণ্ঠোত্থিত শেষ মহামন্ত্র, যাহা আজিও বেলুড়ে সন্ন্যাসীগণের এবং বাংলাদেশে গৃহীগণের বক্ষে, আধারের পার্থক্য অনুসারে, ছোট ও বড় প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বহুযত্নসঞ্চিত সাধনার ধন এই শ্রীকালীমন্ত্র শুনিয়া সেই গভীর রাত্রে ভক্তহৃদয় নির্ভয় হইল, তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া দিলেন।

রাত্রি ১—২ মিনিট। পার্শ্বোপবিষ্ট শশী মহারাজের জাগ্রত ও সতর্ক চক্ষু দেখিল শ্রীরামকৃষ্ণের মস্তক হঠাৎ একদিকে কাৎ হইয়া গড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠ হইতে একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। সাধুগণ ঠাকুরের শ্লথমস্তক ধরিয়া বালিশের উপর রাখিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সমগ্র দেহটি কাঁপিয়া উঠিল, মস্তকের কেশরাশি কণ্টকিত হইল, উভয় চক্ষুর দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থাপিত হইল। এতদিন রোগযন্ত্রণায় যে মুখ ক্ষণে ক্ষণে বিষণ্ন ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত সে মুখে একটা তরুণ স্নিগ্ধ শান্তি। সমস্তই যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ। তৎক্ষণাৎ জনৈক ডাক্তার নাড়ি দেখিলেন, নাড়ি পাওয়া যাইল না। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিলেন ঠাকুরের সমাধি অবস্থা, আবার কেহ কেহ মনে করিলেন দেহত্যাগ করিয়াছেন—কিছুই নিশ্চিতরূপে মীমাংসা হইল না। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন প্রায় বাহান্ন বৎসর।

বর্ষাকাল। বাহিরে মেঘের লেশমাত্র নাই, পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় সমস্ত বাগান বাড়িটী উদ্ভাসিত। কর্ম্মবীর নেপোলীয়নের মৃত্যুর রাত্রিতে ঘোরঘন-ঘটায় আকাশ সমাচ্ছন্ন, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ ও অশনির গম্ভীর নির্ঘোষ। যেরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া নেপোলীয়নের জীবনের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, মৃত্যুর দিনে প্রকৃতির সেইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া পরমশান্তির স্নিগ্ধ জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল, আজ তাই

তাঁহার মহাপ্রয়াণের দিবসে প্রকৃতির মহিমময়ী মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ চন্দ্রকান্তিতে চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানের চাঞ্চল্য ও চিরকালের স্তব্ধতা মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত বিরাজ করিতেছে। বাহিরে এত আলো, এত শান্তি কিন্তু কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মৃতবৎ দেহের সম্মুখে ভক্তগণের হৃদয়ে অসীম অন্ধকার, মুখে নিবিড় কালিমার প্রলেপ,—কর্ণধারবিহীন মন প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখে প্রবলভাবে আন্দোলিত।

কিন্তু তখনও মৃত্যু হয় নাই। ১৬ই আগষ্ট সোমবার মুখে মুখে সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, সকাল হইতেই জনসমাগম হইতে লাগিল। বেলা প্রায় ৮ টার সময় ক্যাপ্টেন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) আসিলেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন দেহ কঠিন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তখনও স্বাভাবিক উত্তাপ বর্ত্তমান। কিছুই মীমাংসা হইল না। ডাক্তার মহেন্দ্রলালের নিকট লোক পাঠান হইল, তিনি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কথাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইল, শ্মশানযাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল।

এই যে রাত্রি ১—২ মিনিটের পর হইতে পরদিন বেলা প্রায় ১১॥০ টা পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিরূঢ় হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। এই মহাসমাধির অবস্থায় মুখে কালীনাম ছিল না, জীবনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। যে মুখ অহরহঃ কালীনাম করিত সে মুখ এখন মৌন ও মূক। কারণ সহজেই অনুমেয়। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীভবতারিণীর সম্মুখে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কণ্ঠহারা হইয়া দেবীর মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। অনুভূতি কম হইলে ভাষায় তাহার প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি গভীর ও নিবিড় অনুভূতির কোন ভাষা নাই। সম্মুখেই দেবী দণ্ডায়মান, আর নাম করিবার প্রয়োজন নাই, শক্তিও নাই। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন তখন
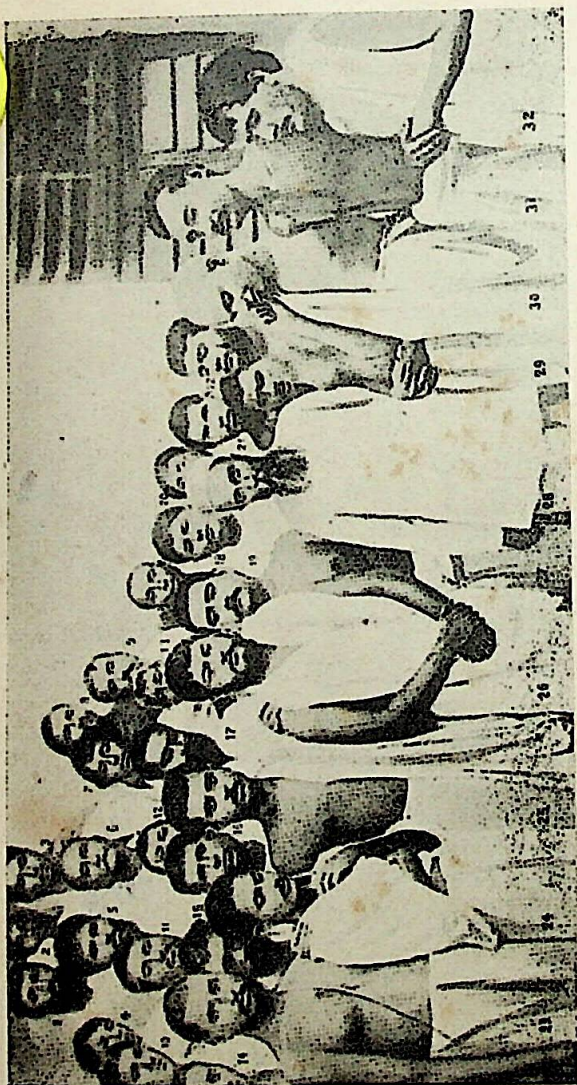
১। মহেন্দ্র or M. (৩) কালী, (৫) শরত, (৬) মণিমল্লিক, (৭) গঙ্গাধর, (৮) নবগোপাল, (১১) তারক, (১৩) গোপাল (বড়), (১৫) বৈকুণ্ঠ, (১৭) মনমোহন, (১৮) হরিশ, (১৯) নারায়ণ, (২১) শশী, (২২) লাটু, (২৩) ভবনাথ, (২৪) বাবুরাম, (২৫) নীরঞ্জন, (২৬) নরেন্দ্র, (২৭) রাম, (২৮) বলরাম, (২৯) রাখাল, (৩০) নিত্যগোপাল, (৩১) যোগীন, (৩২) দেবেন্দ্র,

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে—১৬ই আগষ্ট অপরাহ্নকালে কাশীপুর বাগানবাড়ীতে মহাসমাধি প্রাপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময়দেহের সম্মুখে দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দ।

নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত এক অপলক দৃষ্টিতে পরিণত। জীবনে সমাধি অবস্থায় যে অনুভূতি হইত এখন তাহারই পুনরাবৃত্তি হইলেও অনন্ত যাত্রার শুভমুহূর্ত্তে এই অনুভূতি আরও গভীর, আরও অনেক নিবিড়। এখন ভিতরে বাহিরে অন্য কিছুই নাই, কেবল অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে, চিরশান্তি পরিমল অবিরল ভাসিয়া যাইতেছে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতেছেন মহাকাল রূপ ধরিয়া, আঁধার বসন পরিধান করিয়া সমাধিমন্দিরে বিশ্বজননী একা বিরাজ করিতেছেন। দেবীর চিন্ময় মুখমণ্ডলে অট্ট অট্ট হাসি শোভা পাইতেছে। ইহা দেখিয়াই শেষ করা যায় না, ভাবিয়া কূল পাওয়া যায় না, ভাষায় ব্যক্ত করিবার অবসর কোথায়, শক্তিই বা কোথায়! ইংরাজ সাধক ইহাকে বলিয়াছেন—"The Flight of the Alone to the Alone" (নিঃসঙ্গ আত্মার এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার দিকে অনন্ত যাত্রা)। এইরূপে বহুক্ষণ মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইবার অধিকার একমাত্র সাধকের আছে, বিষয়ভোগী গৃহীর এই অবস্থা কখনও হয় না, এই অবস্থা বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রি ১—২ মিনিট হইতে পরদিন বেলা প্রায় ১১৷৷৹টা পর্য্যন্ত এইরূপ মহাসমাধিতে আরূঢ় হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন।

১৬ই আগষ্ট, বেলা প্রায় ৫টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণহীন দেহ দ্বিতল হইতে নীচেয় আনা হইল। পীতবসন, চন্দন ও ফুলে সে পবিত্র দেহ সজ্জিত। শ্মশান যাত্রার পূর্ব্বে ডাক্তার মহেন্দ্রলালের পরামর্শমত কাশীপুর বাগান বাড়ির প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ দাঁড়াইলেন, সকলের একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইল।

সেই আলোকচিত্র এখনও আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক জীবনীতে সেই আলোকচিত্রখানি দেওয়া হইয়া থাকে। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত "Life of Sri Ramkrishna"র ৫৯৪ পৃষ্ঠার একদিকে কাশীপুর বাগানবাটীর আলোকচিত্র এবং অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর

সেদিনকার আলোকচিত্র দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যগণ দাঁড়াইয়া আছেন, এক একজন ভবিষ্যতের দিগ্‌বিজয়ী পুরুষসিংহ, কিন্তু আজ যেন শোকাচ্ছন্ন পিতৃহারা বালকবৃন্দ। সম্মুখেই নরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান, পিতৃহারা সন্তানের মত গলায় চাদর, অযত্নবর্দ্ধিত একমুখ দাড়ি, চক্ষে অশ্রুবিন্দু। তাঁহার দক্ষিণ দিকে নিরঞ্জন, বাম দিকে নরেন্দ্রের স্কন্ধে হাত দিয়া রাম দত্ত দাঁড়াইয়া আছেন। বাবুরাম, রাখাল, নিত্যগোপাল, যোগীন ও দেবেন্দ্রর চক্ষু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণহীন দেহের প্রতি নিবদ্ধ। আরও অনেকে আছেন —মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম, তারক, শশী, লাটু, শরৎ, মণি মল্লিক প্রভৃতি অনেকেই এই আলোকচিত্রে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক ভক্তের মুখখানি পৃথক্‌-ভাবে ও সমষ্টিগতভাবে দেখিবার ও চিন্তা করিবার বস্তু। কিন্তু ইঁহাদের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের যে পীতাম্বর পরিশোভিত চন্দনচর্চ্চিত দেহ ছিল, আলোকচিত্র হইতে সেই অংশটী বাদ দেওয়া হইয়াছে। তখন দীর্ঘকাল রোগভোগে সেই দেহ এতই শুষ্ক ও শীর্ণ যে তাহার চিত্র ভক্তগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই সমীচীন বিবেচনা করিয়াছেন। শুনা যায় এই গুরু ও শিষ্যবৃন্দযুক্ত সম্পূর্ণ আলোকচিত্রখানি এখন মান্দ্রাজ মিসন গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে।

কাশীপুর শ্মশান। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধীরে ধীরে এই শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতেছে, পথে অসংখ্য নরনারী উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান, কেহ কেহ পূর্ব্ব হইতেই অপরিসর শ্মশান ভূমিতে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন। সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি শান্ত পল্লীকে মুখরিত করিতেছে, মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী কণ্ঠোত্থিত বজ্রনির্ঘোষ—"জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জয়," "জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জয়"। ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল আজ শ্মশানে আসিয়াছেন,—ঠাকুর তাঁহার গান শুনিতে ভালবাসিতেন। শ্মশানে চিতাশয্যা রচিত হইতেছে, ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনাইতেছেন। ঠাকুরের প্রিয় গানটী ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমেই গাহিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের ভাব। শ্মশানের গঙ্গাতীরকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

নাথ, তুমি সর্ব্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার॥
তুমি সুখশান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানবুদ্ধিবল,
তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় স্বজন পরিবার॥
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার॥
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য,
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার॥

আরও গান হইল। অবশেষে ত্রৈলোক্যনাথ শেষের গান আরম্ভ করিলেন। এ গানটী ত্রৈলোক্যনাথের স্বরচিত। একদিন এই গান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল তাই ঠাকুর এই গানটী শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু সেদিন শ্মশানে এই গানটী সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অন্তরের ঐকতানরূপে রজনীর উদাস বাতাসে বাজিয়া উঠিয়াছিল।

নাথ, কি ভয় ভাবনা তার, তুমি যার যে তোমার!
অভয়পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে, তুমি রক্ষা কর যারে নিরন্তর।
মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন, তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ,
নাহি ডরে কালে, ব্রহ্মনামের বলে করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন,
ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়, বধে তারে সাধ্য কার?
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান, তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ,
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়, লয়েছ তুমি যার সকল ভার॥

গান শেষ হইল, চিতার লেলিহান শিখা ঊর্দ্ধদিকে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

ভক্তগণ ফিরিতেছেন—একমুষ্টি ভস্ম লইয়া। তখন কোথায় দৈন্য, কোথায় শোক, কোথায় বিহ্বলতা! যেমন শ্মশানেশ্বর মহাদেবের অঙ্গ-স্খলিত একটী ভস্মকণার জন্য দেবতাগণ যুগে যুগে লালায়িত, সেইরূপ এই অসীমশক্তিশালী ভস্মরাশির প্রতিকণা ভক্তগণের নিকট শোকতাপহারী পরম মহৌষধি। এই ভস্মকণার বলেই একদিন শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভক্তগণ বিশ্ববিজয় করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। তাই সেদিন ফিরিবার পথে বলিষ্ঠ জরামৃত্যুরহিত সন্ন্যাসীকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হইতেছিল—"জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জয়", "জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জয়", "জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।"

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কি না

শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন ও সাধনা ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিবার পর সাধারণ পাঠকের মনে একটী প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে,—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কি শ্রীরামকৃষ্ণদেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? শ্রীভগবান যে বলিয়াছেন "সম্ভবামি যুগে যুগে",—ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপের শ্রীরামকৃষ্ণ কি পূর্ণ অভিব্যক্তি? শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?

শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া তাঁহার অনেক ভক্ত, নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেও অবতার বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত। একদিকে ভক্তগণের উচ্চকণ্ঠনিনাদিত শ্রীরামকৃষ্ণঅবতারধ্বনি, অন্যদিকে কুটিল ব্যঙ্গ-

কৌতুক—"অবতার শিঙিমাছের ঝোল খাচ্ছেন, অবতার বালিশের ছার পোকা বাচ্ছেন" ; মধ্যস্থলে সাধারণ জনবিশ্বাস,—শ্রীরামকৃষ্ণ অসাধারণ মহাপুরুষ। বিষয়টী সত্যসত্যই এত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য যে ইহার সর্ব্ববাদী-সম্মত মীমাংসা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অবতার জন্মগ্রহণ করিলেও, চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেও তাহা উপলব্ধি করিবার, দেখিয়া চিনিবার মন ও চক্ষু সকলের থাকে না। অবতার না হইলেও মহাপুরুষকে অবতার জ্ঞানে পূজা ও শ্রদ্ধা করা অসীম ভক্তি ও বিশ্বাস সাপেক্ষ। যিনি সত্যই অবতার তাঁহাকে চিনিয়া লইবার শুদ্ধাবুদ্ধি জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ও সংস্কার ব্যতীত হয় না। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন কি না তাহা জানিবার শক্তি আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস ও ভক্তির উপর নির্ভর করে, অপরের কথামত মানিয়া লইলে ধর্ম্মজীবনে তাহার কোনই উপকার বা সার্থকতা হইতে পারে না। অবতারকে নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি না করিয়া শুধু পাঁচ-জনের কথায় অবতার বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক।* কিন্তু সেই বিশ্বাস থাকুক্ বা নাই থাকুক্ এই বিষয়ের আলোচনা সকলকেই পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত করিতে হইবে। মনকে মতুয়ার বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখিয়া কতক-গুলি ঘটনা পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য উপস্থাপিত করা হইতেছে।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে কোন কোন সময় অবতার বলিয়া ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কথনও বা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত

---

*প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অবতারবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক্ আমাদেরই মত খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন তিনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ইহা মনে করা, বিশ্বাস করা কি তামাসার কথা! তিনি যাঁকে দয়া করেন, সেই মহাভাগ্যবানই মাত্র তাঁকে বুঝতে পারেন, না হ'লে কারোই সাধ্য নাই।...... ভগবানের নরলীলা, তাঁর কৃপা না হলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও বুঝবার যো নাই ; মানুষের আর কথা কি?"

করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার নিজের সুস্পষ্ট অভিমত বিশেষ ভাবে একজনের নিকটই প্রকাশিত হইয়াছিল,—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। মৃত্যুশয্যায় একদিন স্বামীজির মনের অব্যক্ত সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ তিনিই ইদানীং এই দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ।" আবার অন্যক্ষেত্রে তাঁহাকে অবতার বলা অথবা প্রচার করার বিরুদ্ধে তিনি বিরক্তিপ্রকাশ করিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন :—

"ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তেরা যখন তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে এবং ভক্তির উত্তেজনায় তাহাদের ভিতর কেহ কেহ ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রকাশ্যে নির্দ্দেশ করিতেছে, তখন ঐ সকল ভক্তের ঐরূপ ব্যবহার জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান; এবং ভক্তির আতিশয্যে তাহারা ঐ কার্য্যে বিরত হয় নাই; কয়েকদিন পরে এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হইয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—'কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বল্লেন। ওরা মনে করে অবতার বলে আমাকে খুব বাড়ালে, বড় ক'ল্লে। কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি ?'

স্বামী সারদানন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলির ভিতর দুইটী জিনিষ বিশেষ করিয়া পরিলক্ষণীয় :—প্রথমতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণকে বাড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই; তিনি সকলের চক্ষুর সম্মুখে যেরূপে প্রকাশিত,—ব্রহ্মচারী, অমোঘবাক্, জ্ঞানভক্তিময় মহাপুরুষ,—ইহাই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট, ইহার অধিক বাড়াইয়া দেখিবার কাহারও প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, 'ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি ?' সাধনভজন নাই, কেবলমাত্র ভক্তির সাময়িক উচ্ছ্বাসে 'অবতার' বলিলেই মহাপুরুষ কৃতার্থ হইবেন না, নিজেরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না। অবতারকে

চিনিবার ভক্তি ও বিশ্বাস নাই, কেবলমাত্র ভাববিলাসিতা, কেবল মুখের কথায় আত্মপ্রসাদ!

এইরূপ বিভিন্নক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন আচরণের কারণ আমাদের বুঝিয়া দেখা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণশক্তির প্রধান উত্তরাধিকারী, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সহস্রদলপদ্ম,—স্বামীজির উপর ঠাকুরের অসীম প্রীতি, অসীম বিশ্বাস। সুতরাং এই বৃহৎ আধারের নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্দেশ্যপূর্ণ, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে স্বামীজির পক্ষে দেশ বিদেশে তাঁহার পতাকা বহন করিবার শক্তি সংগ্রহ করা সুকঠিন। অন্যদিকে বিষয়ীগণের সাময়িক উদ্দীপনাপ্রসূত ফাঁকা অবতারধ্বনি,—সম্পূর্ণ নিরর্থক, সাধারণ মানবসমাজে হাস্যোদ্দীপক। অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন-ক্ষেত্রে বিভিন্ন আচরণের ইহাই মর্ম্মকথা। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তরের অন্তরে শ্রীভগবানের অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, অথবা 'the Divine Power working behind the man" (স্বামীজির 'Sages of India') অর্থাৎ ঐশীশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছিল,—ইহাই মাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

আর একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে "তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ" বলিলেও, তিনি যে 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষ মহান্' তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মহাযোগী। যোগারূঢ় ব্যক্তি যখন সমাধি অবস্থায় থাকেন অথবা যখন আত্মজ্ঞান তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া প্রকাশিত হয় তখন তাঁহার পক্ষে "সোঽহং" —আমিই সেই পরমাত্মা—এই উপলব্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই পরমাত্মাস্বরূপ,—ঋষি পিতাকর্ত্তৃক বারংবার কথিত উপনিষদের এই

কথাগুলি সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে, শ্বেতকেতু অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অবতার, সে অর্থে নহে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে "যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ তিনিই ইদানীং এই দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ" বলিলেও অবতার বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায় তাহা নাও হইতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যসন্ধ ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহার নিজের অবতারত্ব সম্বন্ধীয় কথাগুলির যে অর্থ তদীয় ভক্তগণ করিয়া থাকেন তাহা হয়ত সত্য হইতে পারে কিন্তু অন্য অর্থও সম্ভবপর তাহা অস্বীকার করা সমীচীন হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় অপরের মধ্যে নারায়ণ দেখিতেন। তাঁহার কঠিন ব্যাধির সময় একদিন লাটু মহারাজ মাথার হাত দিয়া বসিয়া আছেন, অন্যান্য ভক্তগণও উপস্থিত, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "ঐ লোটো মাথার হাত দিয়ে বসে রয়েছে, তিনিই (ঈশ্বরই) মাথার হাত দিয়ে যেন রয়েছেন।" স্বয়ং ঈশ্বর অপর একজনকে ঈশ্বর দেখিতেছেন, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব স্থাপনের পরিপন্থী। তিনি সকলকেই সেই অনন্ত বিভুর তটস্থ প্রকাশরূপে সময় সময় দেখিতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার এই অনুভূতি হইতে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মস্থ মহাপুরুষ, ভূতে ভূতে ব্রহ্মদর্শন করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি কথা। তিনি একদিন ভক্তগণের নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি সরকারী লোক। আমাকে জগদম্বার জমিদারীর যেখানে যখনই গোলমাল হইবে সেখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।" স্বামী সারদানন্দ লিখিতেছেন জগদম্বা কৃপা করিয়া দেখাইলেন "ঠাকুরকে লইয়া তাঁহার ঐরূপ লীলা বহুযুগে বহুবার হইয়াছে, পরেও আবার বহুবার হইবে। সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি নাই।" কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নহেন, তিনি ভগবানের নায়েব, লীলাসহচর। বহুবার নায়েবরূপে তিনি

জগদম্বার জমিদারীতে কার্য্য করিয়াছেন, আরও বহুজন্মে করিবেন। তিনি স্বয়ং অবতার নহেন, সাধারণ জীবও নহেন, তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ, জগদম্বার অসাধারণ স্নেহ, প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন।

এই সম্বন্ধে আরও ভাবিবার কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষরূপেই এত অনন্য সাধারণ, এত জ্ঞানভক্তিময়, যে তাঁহার মহাপুরুষচরিত্রের অনুশীলন মানবজাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণকর। অন্যদিকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলে, কতকটা সন্দেহ ও কতকটা যথেষ্টগ্রহণের অশক্তির জন্য, সাধারণ মানুষের সমস্ত ধারণা ঘোলাটে হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপেও ধরিতে পারিবে না, মহাপুরুষ বলিয়া যতটুকু গ্রহণ করিতেছিল তাহাও হারাইয়া যাইবে। ঠাকুর বলিতেন শুঁড়ির দোকানে কতপিপা মদ আছে তাহার হিসাব খতাইয়া 'পেঁচি মাতালের' কি হইবে, যাহার এক গেলাসেই নেশা হইয়া যায়, জালা ও পিপার সন্ধান লওয়া তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। মহাপুরুষরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র এত বিশাল, এত বিচিত্র যে সে চরিত্র আঁকড়াইয়া ধরা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নহে, তাহার উপর আবার তাঁহাকে অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরূপে ধারণা করিতে যাইলে ঠাকুরের ভাষায় "মাথা টন্ টন্ করাই" স্বাভাবিক। বিশেষতঃ মহাপুরুষ ও অবতারের মধ্যে ব্যবধান এত বেশী যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই বিশাল ব্যবধান লাফাইয়া পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ঠিক এইরূপ অবস্থা এই বঙ্গদেশে হইয়াছে। এই বঙ্গভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম,—ইহা বাঙ্গালী জাতির পরম সৌভাগ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ এই মহাপুরুষের যেরূপ বহুলপ্রচার অন্ততঃ এই দেশে হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই;— অসংখ্য বাঙ্গালীগণের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত অন্তঃপুরে অথবা প্রকাশ্য রাজপথে চা ও কাপড়ের দোকানে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকালীর ছবি টাঙ্গান থাকে

তেমনই স্থানবিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। অবতার আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে, তাঁহাকে দূর হইতে পূজা করা চলে, বড়জোর সকালে বিকালে একবার ছবির দিকে তাকাইয়া প্রণাম করিলেই জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সাধিত হইয়া যায়,—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু মহাপুরুষ আমাদেরই মত একজন রক্তমাংসের মানুষ, আমাদেরই মত মানবজন্ম পাইয়া আমাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, নিজ সাধনবলে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। এরূপ মহাপুরুষ আমাদের আপনার লোক, ইঁহাদের সহিত আমাদের প্রতিদিনের সম্বন্ধ, ইঁহাদের দেখিয়া আমরা ভাল হইবার চেষ্টা করিতে পারি, উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষাও মনে জাগ্রত হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রচার করিবার অথবা গ্রহণ করিবার প্রয়াস এই কারণে বাঙ্গালাদেশে, বাঙ্গালীর জীবনে, বহুলপরিমাণে ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। এক পোয়া ঘটীতে এক সের দুধ কিছুতেই ধরিতেছে না।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী উপদেশপূর্ণ ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কংসনিধন করিবার জন্য মল্লবেশে সভায় প্রবেশ করিতেছেন, সভামঞ্চে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকগণ উপবিষ্ট। তথায় একই সভায় উপস্থিত বিভিন্ন লোক একই পুরুষকে বিভিন্নরূপে গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

> মল্লানামশনি নৃর্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্,
> গোপানাং স্বজনঃ অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ,
> মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাট্ অবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
> বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।

[শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মল্লগণের মনে হইল তিনি বজ্রের ন্যায় ভীষণ, সাধারণ মানুষের নিকট তিনি নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীলোকগণের নিকট মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণের নিকট পরমাত্মীয়, দুষ্ট রাজগণের নিকট দণ্ডধর বলিয়া

প্রতিভাত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা তাঁহাকে কোমল শিশুরূপে দেখিলেন, কংসের মনে হইল স্বয়ং যমরাজ উপস্থিত, মূর্খেরা তাঁহাকে বিকল জড়পিণ্ডরূপে দর্শন করিল, যোগিগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে দেখিলেন, বৃষ্ণিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইলেন। এইরূপে বিভিন্ন মানুষের নিকট বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।]

অধিকারীভেদে দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক।

বিভিন্নদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জনসাধারণের ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তির জন্য প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় একখানি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর প্রয়োজন। এই বিষয়ে সবিনয়ে সসম্ভ্রমে বেলুড়সন্ন্যাসীসঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। বহুবর্ষপূর্ব্বে 'Life of Sri Ramkrishna' নামে ইংরাজিতে মঠকর্ত্তৃক একটী আদর্শ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। সে গ্রন্থের কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার প্রয়াস নাই,—ঘটনাবলী সহজ ভাষায়, সংযতভাবে লিপিবদ্ধ। যাঁহার যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস তিনি সেইরূপেই শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বেশীরভাগ বাঙ্গালী ইংরাজি জানেন না, অথচ বাংলা ভাষায় কোনও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী বেলুড় হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। স্বামী সারদানন্দ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ, শ্রীরামচন্দ্র দত্ত রচিত বাংলাভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অসাধারণ গ্রন্থগুলি আদর্শ জীবনীশ্রেণি-বাচ্য নহে। উপরন্তু এই তিনখানি অমর গ্রন্থেই শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সমস্ত বিষয়, তর্ক ও যুক্তি সেই দিকেই নিয়োজিত হইয়াছে। সুতরাং আদর্শ জীবনীরূপে 'Life of Sri Ramkrishna'র সহিত ইঁহাদের কোনটীই তুলনীয় নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমিতে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেশবাসীর জন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাষায় রচিত একখানি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর একান্ত প্রয়োজন।

হয়ত ঠাকুরের নিরক্ষর দেশবাসী তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, কিন্তু অন্ধের হস্তীদর্শনের মত শ্রীরামকৃষ্ণকে কতকটা স্পর্শ করিলেও তাহাতে কলিকাতার উপকণ্ঠে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীসঙ্ঘস্থাপনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সফল হইবে, বাঙ্গালীজাতির মলিন জীবন পরিশুদ্ধ হইবে, বাঙ্গালী তাহার হারাণ ও বিস্মৃত নিধি ফিরিয়া পাইবে।

শ্রীভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে যদি সর্ব্বদা অবতার-রূপে মনেরাখা যায় তাহা হইলে মানবলীলার সমস্ত রস হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অবতারকে অবতার বলিয়া ভুলিতে পারিলেই অবতারের লীলারস সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। মানব বলিয়া গ্রহণ করিলে মানবদেহপ্রসূত অনেক দুর্ব্বলতা হয়ত বিস্ময় বা কৌতূহলের উদ্রেক করেনা অথচ সেই সমস্ত সাধারণ ব্যাপারগুলিকে অবতারের আলোকে দেখিতে যাইলে অনেক সময় দুর্ব্বোধ্য অথবা অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দগৃহে শিশুরূপে বিরাজিত তখনকার দামবন্ধনলীলা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বেত্রদণ্ড লইয়া তাড়না করিতেছেন, পট্ট ডোরিকা দ্বারা বন্ধন করিতেছেন, বালক শ্রীকৃষ্ণ মাতার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া পলায়ন করিতে তৎপর, চক্ষুদ্বয় ভীতিবিহ্বল ও অশ্রুপরিব্যাপ্ত। তখন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যস্মৃতি, বৈকুণ্ঠস্মৃতি বিলুপ্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়নশীলা জননীর নিকট অসহায় ও পরাধীন শিশুব্যতীত আর কিছুই নহেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ তখন জানিতেন যে তিনি অখিলব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি স্বয়ং নারায়ণ, এবং তাহা জানিয়াও মাতার নিকট ভীতির অভিনয়মাত্র করিতেন তাহা হইলে দামোদরলীলা সম্পূর্ণ নীরস হইয়া যাইত। অথবা মাতা যশোদা যদি তখন জানিতেন যে এই বালক পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাহা হইলেও বাৎসল্যরসসৃষ্টি সম্ভবপর হইত না।*

*এইরূপ অবতারত্ব বিস্মৃতির জন্যই বৃন্দাবনে গোপীগণ বালক শ্রীকৃষ্ণকে পাদুকা বহন করিয়া আনিতে, ধান্য মাপিবার পাত্র লইয়া আসিতে আদেশ করিতে পারিতেন।

অন্যদিকে মাতা দেবকীর শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুর্জ নারায়ণরূপে জ্ঞান থাকার শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করিয়াও তিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবতারকে অবতার বলিয়া জানাও সর্ব্বসময়ে সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে আধ্যাত্মিক কল্যাণকর নহে, বরং মনুষ্যলীলা দেখিয়া মহাপুরুষরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ বহুবিধরূপে চরিতার্থ ও আনন্দিত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন কিনা তাহা কেবলমাত্র মুখের দ্বারা ঘোষণা করা অথবা দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করা উভয়ই মতুয়ার বুদ্ধিপ্রসূত। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বীয় ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ অবতাররূপে প্রতিভাত, তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু গতানুগতিকভাবে চাপকান পরিয়া আপিষ যাইতে যাইতে অথবা পান চিবাইতে চিবাইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রচার করা শ্রীরামকৃষ্ণস্মৃতির অবমাননা,—ভক্তিবিশ্বাসবিহীন মানবের বৃহৎ পরিহাস মাত্র। এমন কি সন্ন্যাসীব্রত গ্রহণ করিয়াও যদি নিজের অনুভূতি না হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র ধর্ম্মসঙ্ঘের ঘোষণা পাখীর মত উচ্চারণ করিলে তাহাও অপক্ক সন্ন্যাসীর পক্ষে সত্যের অপলাপ মাত্র, এবং সেই পরিমাণে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২১ শে এপ্রিল অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের মাত্র চার মাস পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন

"আমি Truth চাই। সেদিন পরমহংসমশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।……উনি আমায় বলছিলেন—'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম—হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বল্‌বো না।"

তখন স্বামীজির প্রায় ৪।৫ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অথচ তখনও ঠাকুরকে অবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। স্বামীজির কথাগুলি সত্যসন্ধ মানুষের খাঁটি মনের অবস্থার পরিচয় দিতেছে। এখানে অনুরোধ উপরোধ কার্য্য করেনা, এখানে গোঁজামিল নাই, ভাবের ঘরে চুরি নাই। আধ্যাত্মিক ক্ষুদ্রতা অথবা দীনতার জন্য যাঁহাকে এখনও বেগুণগাছেই আঁক্‌সি দিতে হইতেছে তাঁহার পক্ষে তালগাছের দিকে হস্তপ্রসারণকরা ব্যর্থ কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

একদিন শ্রীমদ্‌ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তদীয় ভক্ত শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মচারি, প্রত্যক্ষ সত্যও যাকে তাকে বল্‌তে নাই। যদি বলতে হয়, চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমাণ সহিত দেখাতে হবে।" কথাগুলি বর্ত্তমান যুগোপযোগী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। বর্ত্তমান যুগ বস্তুসর্ব্বস্ব যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, সন্দিগ্ধমনের যুগ; সহজে ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের হয় না, অবতার আসিলেও তাঁহাকে চিনিবার চক্ষু অধিকাংশ লোকেরই নাই। যাঁহার ধর্ম্মচক্ষুই নাই তাঁহার চোখের জায়গায় আঙ্গুল দিলেও কিছুই ফললাভ হইবে না। বরং স্বয়ং অবতার যদি ছোট সাজিয়া কেবলমাত্র মহাপুরুষরূপে ধীরে ধীরে মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন তবেই হয়ত পৃথিবী ক্রমশঃ নিজ অভীপ্সিত লক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। এখনও কিন্তু মানবজাতি জীবনের লক্ষ্য হইতে দূরে, বহুদূরে পড়িয়া আছে। মোট কথা এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কি না তাহা প্রত্যেক মানুষকে নিজের অনুভূতি, ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে, অপরের কথার উপর নির্ভর করিয়া একটা কিছু গ্রহণ করিলে ভুল এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতি উভয়ই হইবার সম্ভাবনা।